উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ
২০১১

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিজীবন ও কৃষিসংস্কৃতি

TH0184

গবেষক
সুধাংশু কুমার সরকার

তত্ত্বাবধায়ক
ড. নিখিল চন্দ্র রায়
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Th 63.01
ধূপা / তিস্তা

17 DEC 2012

241097

সূ চি প ত্র

পৃষ্ঠা

নিবেদন i

ভূমিকা ১- ৫

প্রথম অধ্যায় ৬ - ৫৩

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ঐতিহাসিক, সামাজিক ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস ঃ

ক. তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

খ. তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট

গ. সমাজ জীবন এবং জনবিন্যাস

ঘ. তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকার লোকায়ত জীবন ও লোকসংস্কৃতি

দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৪ - ১২৬

কৃষিজীবন ও কৃষি সংস্কৃতি ঃ

ক. সভ্যতার অগ্রগতিতে কৃষি ও উর্বরতাতন্ত্র

খ. কৃষিজীবন ও সংস্কৃতি

গ. কৃষিজীবন ও লোকায়ত সংস্কৃতি নৈকট্য

তৃতীয় অধ্যায় ১২৭ - ২৪৭

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে কৃষি ঃ

ক. দৈহিক ক্রিয়াধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি

খ. শিল্পধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি

গ. বাগ্‌ধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি

ঘ. প্রয়োগধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি

ঙ. বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি

উপসংহার ২৪৮ - ২৪৯

পরিশিষ্ট ২৫০ - ৩২৩

ক্ষেত্র সমীক্ষার তথ্যাবলী ৩২৪ - ৩৩২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৩৩৩ - ৩৪২

আলোক চিত্রমালা ৩৪৩ - ৩৫২

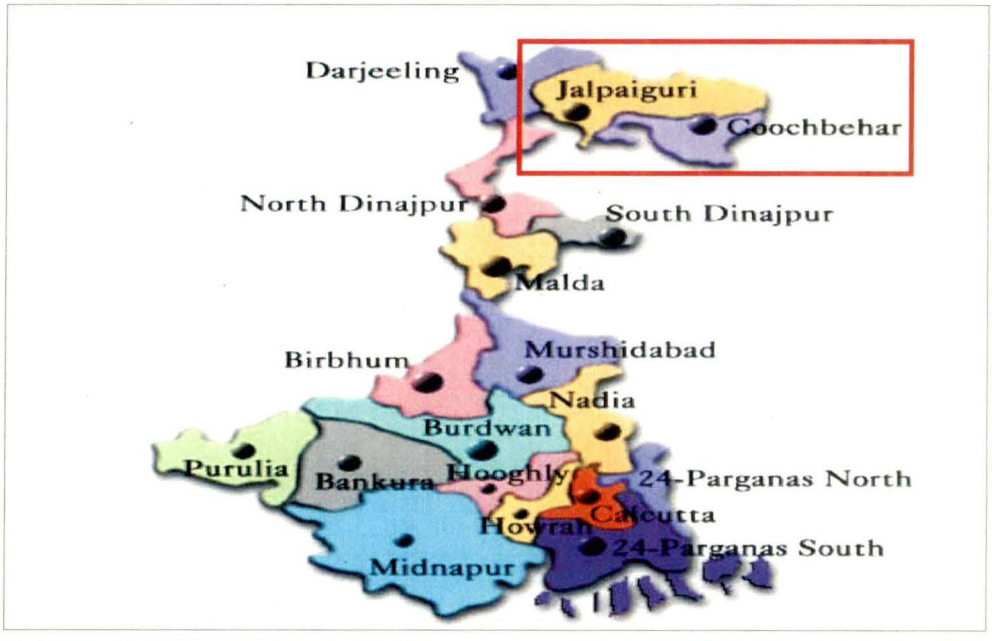
Darjeeling
Jalpaiguri
Coochbehar
North Dinajpur
South Dinajpur
Malda
Birbhum
Murshidabad
Nadia
Burdwan
Purulia
Bankura
Hooghly
24-Parganas North
Howrah
Calcutta
Midnapur
24-Parganas South

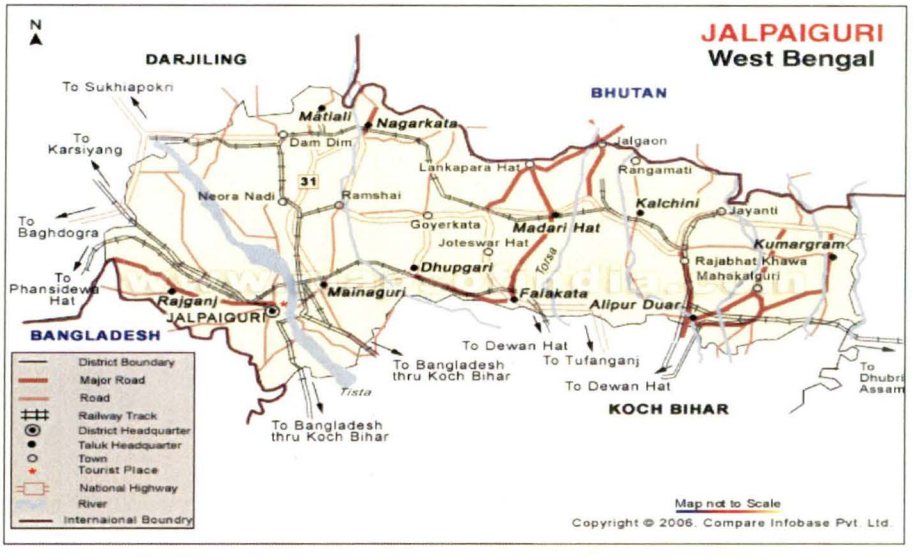
JALPAIGURI
West Bengal
N
DARJILING
To Sukhiapokri
To Karsiyang
To Baghdogra
To Phansidewa Hat
BHUTAN
Matiali
Nagarkata
Dam Dim
Lankapara Hat
Jalgaon
Rangamati
Neora Nadi
31
Ramshai
Goyerkata
Madari Hat
Joteswar Hat
Kalchini
Jayanti
Kumargram
Rajabhat Khawa
Mahakalguri
Dhupgari
Torsa
Rajganj
JALPAIGURI
Mainaguri
Falakata
Alipur Duars
BANGLADESH
To Bangladesh thru Koch Bihar
To Dewan Hat
To Tufanganj
To Dewan Hat
KOCH BIHAR
To Dhubri Assam
Tista
To Bangladesh thru Koch Bihar
District Boundary
Major Road
Road
Railway Track
District Headquarter
Taluk Headquarter
Town
Tourist Place
National Highway
River
Internaional Boundry
Map not to Scale
Copyright © 2006. Compare Infobase Pvt. Ltd.

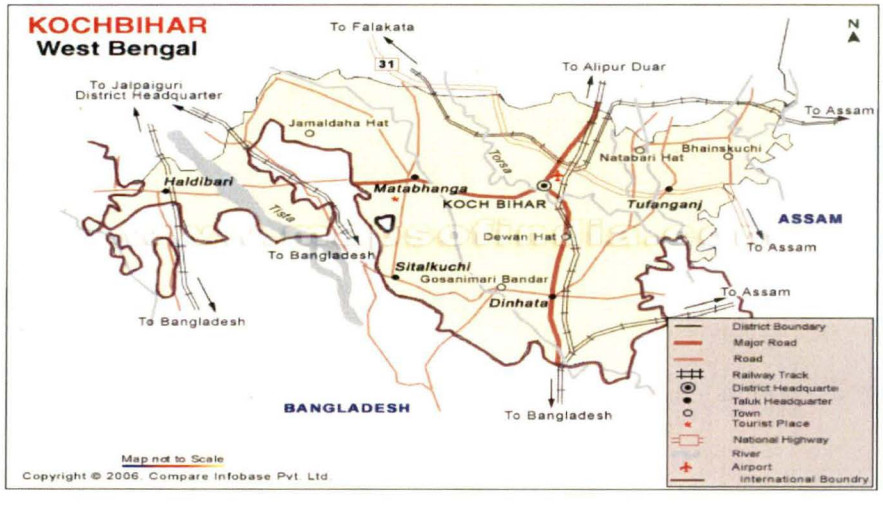
KOCHBIHAR
West Bengal
To Falakata
31
N
To Alipur Duar
To Jalpaiguri District Headquarter
To Assam
Jamaldaha Hat
Bhainskuchi
Natabari Hat
Torsa
Haldibari
Matabhanga
KOCH BIHAR
Tufanganj
ASSAM
Tista
Dewan Hat
To Bangladesh
To Assam
Sitalkuchi
Gosanimari Bandar
To Assam
Dinhata
To Bangladesh
BANGLADESH
To Bangladesh
District Boundary
Major Road
Road
Railway Track
District Headquarter
Taluk Headquarter
Town
Tourist Place
National Highway
River
Airport
International Boundry
Map not to Scale
Copyright © 2006. Compare Infobase Pvt. Ltd.

নিবেদন

স্বর্গীয় পিতা পেশাগত ভাবে শিক্ষকতা করলেও কৃষির সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে যোগ ছিল নিবিড় এবং সেই সুবাদে কৃষি সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতির যোগ খোঁজার তাগিদ অনেকদিনের। তখনও লোকসংস্কৃতির তত্ত্ব ও তথ্য আমার কাছে সহজবোধ্য ছিল না। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এবং তাত্ত্বিক বিষয়গুলি পড়তে গিয়ে ক্রমশঃ আগ্রহ বেড়ে যায়। সেই সূত্র ধরেই এরূপ গবেষণা প্রকল্পের প্রেরণা। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের পরামর্শে এবং সদুপদেশে 'কৃষিজীবন ও কৃষিসংস্কৃতি' বিষয়টি নিয়ে গবেষণা কর্মে উৎসাহ পাই। অর্থাৎ ড. ভৌমিকই এবিষয়ে আমার প্রথম অনুপ্রেরণা দাতা।

গবেষণায় এবং পরিকল্পনায় প্রতিটি পদক্ষেপে বিষয়নিষ্ঠ পরামর্শ দিয়ে আমাকে দিক নির্দেশ করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও আমার পিএইচ. ডি. সন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়। আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। গবেষণাপর্বে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধানী অধ্যাপক ড. দীপককুমার রায়। যিনি উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির প্রাসঙ্গিক নানা সমস্যা সমাধানে এবং উৎসাহ ও সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতির পথ পরিক্রমায় সহায়তা করেছেন। ড. রায়ের কাছে আমি চিরঋণী।

এছাড়াও নানাভাবে সাহায্য করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুবোধকুমার যশ ও অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয়, যাঁরা গবেষণাকর্ম সম্পূর্ণ করার জন্য সর্বদা সস্নেহ তাগাদা দিয়েছেন তাঁদের প্রেরণা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রসঙ্গতঃ ঋণ স্বীকার করছি তিস্তা ও তোর্ষা পারের সেই সমস্ত সাধারণ মানুষ ও লোকশিল্পীদের, যাঁদের কাছে উপেক্ষিত তো হই-নি, বরং তথ্যানুসন্ধানে ও সংগ্রহে পেয়েছি আন্তরিক আতিথেয়তা ও সহযোগিতা। সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানা অজপাড়া গাঁয়েও কেউ বিমুখ করেননি সংগ্রহকর্মে।

আমার এই গবেষণা কর্মে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সাহায্য পেয়েছি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি শক্তিগড় পাঠাগার, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, ধূপগুড়ি মিলনি পাঠাগার, রামগঞ্জ গ্রামীণ পাঠাগার, ইসলামপুর, ধূপগুড়ি ব্লক কৃষি দপ্তর, জলপাইগুড়ি জেলা কৃষি দপ্তর, মাথাভাঙ্গা -১ নং ব্লক কৃষি দপ্তর, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

তারিখ ঃ ১১/০৪/২০১১
রাজারামমোহনপুর
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সুধাংশু কুমার সরকার

(সুধাংশু কুমার সরকার)

ভূমিকা

তিস্তা ও তোর্ষা বিধৌত জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার সংস্কৃতি বিভিন্ন জাতি জনজাতির সম্মিলিত জীবনদর্শন। বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ যেমন - রাভা, বোড়ো, টোটো, গারো ইত্যাদি ছাড়াও বসবাস করছেন রাজবংশী, নাথ, গেন্নাই, তেলি, নমঃশুদ্র, খ্যান ইত্যাদি এবং তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতি একটি ভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করেছে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ভারতবর্ষের প্রধান চারটি ভাষাগোষ্ঠী অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীনা ও আর্য ভাষার সম্মিলিত সহাবস্থান এ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। তাই তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিজীবন ও কৃষি সংস্কৃতির বিভিন্ন জাতি জনজাতির তথা নৃ-গোষ্ঠীর প্রাণপ্রবাহে পুষ্ট। এই ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করবার, বিশ্লেষণ করবার অন্যতম প্রয়াস এই প্রকল্পটি।

এই গবেষণা প্রকল্পের ভৌগোলিক সীমানা ২৫°৫৭´ ৪০´´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৭°০´ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত। দ্রাঘিমাংশ ৮৮°০৪´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৮৯°৫৪´ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত। জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৬৮,৮০,৩২৮ জন (২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী)। পুরুষ ৩০,২৩,২৩৯ জন, মহিলা ৩৮,৫৭,০৮৯ জন। আয়তন ৯৬১৪ বর্গকিলোমিটার। এই অঞ্চলের উত্তরাংশে নদীবাহিত পলিমাটি অত্যন্ত উর্বর। মাটিতে বালুর ভাগ বেশি থাকায় চা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কোথাও কোথাও নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থের ভাগ লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণাংশে মাটির গঠন অপেক্ষাকৃত হালকা স্বাভাবিক, জলধারণ ক্ষমতা কম। ভূমিরূপের ঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এতদঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন স্বতন্ত্র। হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীবাহিত পলিমাটি যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এর নিচে আছে আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা। অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা দ্বারা পরিপুষ্ট জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা মূলতঃ নদীমাতৃক। তিস্তা ও তোর্ষা ব্যতীত অন্যান্য অপ্রধান নদীগুলি হল - জলঢাকা, মানসাই, কালজানি, ডুডুয়া, গিলান্ডি, ধরলা, সংকোশ, রায়ডাক, ডায়না, গদাধর ইত্যাদি।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে তণ্ডুল জাতীয় শস্যের মধ্যে ধান ও গমের উৎপাদন অন্যতম। এছাড়াও তন্তু জাতীয় ফসল পাট এই অববাহিকা অঞ্চলের অন্যতম অর্থকরী ফসল। তিস্তা ও তোর্ষা নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একদা প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপাদন হত বলে জানা যায়। একদা এই তামাক রপ্তানি হত ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার)। অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা

অঞ্চল কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্যদিকে এতদঞ্চলের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির সঙ্গে এই কৃষিসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য বন্ধন পরিলক্ষিত হয়। কৃষিব্যবস্থার মূল কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতি। কৃষিজীবনের সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতির মেলবন্ধনের সূত্রটির সন্ধান এবং কৃষি সংস্কৃতির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা এযাবৎ কোথাও লক্ষ্য করা যায় নি। তাই আমার গবেষণা কর্মে এতদঞ্চলের কৃষিজীবনের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মূল্যায়ণ করার জন্য উক্ত বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করেছি।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে মিশনারীদের চেষ্টায় তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের সংস্কৃতির চর্চা এবং সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ নানাভাবে দেখতে পাই; উল্লেখ্য, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ক্ষমতাকে দৃঢ় করার জন্য এই কাজ করেছিলেন D.H.E. Sunder, W.W. Hunter, J.F. Grunning D. Maloi, H. Baverly প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তাঁরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে নানাভাবে সাংস্কৃতিক উপাদানকে তুলে ধরেছেন। গ্রীয়ার্সন সাহেব ১৯০১ -এ ভাষা সমীক্ষা (L.S.I.) করতে গিয়ে তিস্তা তোর্ষা অববাহিকার ভাওয়াইয়া গানকেও সংগ্রহ করেছেন, যা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, অরুণকুমার রায়, চন্দ্রকুমার দেব, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রায় তিনদশক ধরে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চা তেমনভাবে গড়ে উঠেনি। তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বিষয়ে গবেষণা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত', 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকভাষা'। ড. শিশির মজুমদারের 'উত্তরবাংলার লোকনাট্য', 'উত্তরবাংলার লোকসমাজ', 'লোকনাট্য-নাটককথা', সুশীলকুমার ভট্টাচার্যের 'উত্তরবাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি', ড. দিগ্বিজয় দে সরকারের 'লোকয়ত দর্পণে উত্তরবঙ্গ', ড. ফণীগোপাল পালের 'উত্তরবাংলার লোকসাহিত্য' (অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ), ড. শিবতপন বসুর 'পশ্চিমবাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতি', (অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ), ড. 'রমেন্দ্রনাথ অধিকারী'র 'কামরুপী উপভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা' (অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ), ড. শচীন্দ্রনাথ রায়ের 'রাজন্য শাসিত কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য', ড. সুখবিলাস বর্মার 'ভাওয়াইয়া' এবং 'জাগগান', ড. সুবোধ সেনের 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ও জনজীবন', ড. দিলীপকুমার দের 'কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত গবেষণাগুলির মধ্যে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের সংস্কৃতির নানা উপাদানকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সন্নিবেশিত হলেও কৃষিজীবন তথা কৃষিসংস্কৃতির

উপর তেমন ভাবে আলোকপাত করা হয় নি। বলাবাহুল্য, কৃষিজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। এরূপ সূত্র সন্ধান থেকে উপরোক্ত গবেষকেরা বিরত থেকেছেন। সেইজন্য আমি আমার গবেষণা পত্রে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিজীবন এবং লোকসংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং রূপান্তরের তত্ত্ব এবং তথ্য লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছি।

আমার গবেষণা প্রকল্পে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, যেমন, দৈহিক ক্রিয়াধর্মী উপাদান (নৃত্য, অভিনয়, খেলাখূলা ইত্যাদি), শিল্পধর্মী উপাদান (কারুকর্ম, চারুশিল্প, পোশাক, যানবাহন ইত্যাদি), বাগ্‌ধর্মী উপাদান (লোকভাষা, লোককথা, প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি), প্রয়োগধর্মী উপাদনা (মন্ত্রগুপ্তি, চিকিৎসা, তাবিজ-কবচ ইত্যাদি) প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তথ্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। এই গবেষণাকর্মে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতির উপাদানগুলির মধ্যে বিশেষতঃ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজের কৃষিসংস্কৃতি তথা কৃষিজীবনকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

এই গবেষণা প্রকল্পের প্রথম অধ্যায়ে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক দিক থেকে এতদঞ্চলের একটি এলাকা (ডুয়ার্স) দীর্ঘকাল ছিল ভূটানের দখলীকৃত। অন্যদিকে কুচবিহার জেলা তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট নির্দেশ করা হয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে এই অঞ্চলকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন - একেবারে দক্ষিণ অংশে তরুণ পলিমাটি দিয়ে গড়া সমতলভূমি। মাঝে পাহাড়তলি বা উপত্যকা এবং একেবারে উত্তরে হিমালয়ের অনুচ্চ প্রস্তরময় পাহাড়ী বন্ধুরতা। অতঃপর সমাজজীবন, জনবিন্যাস এবং লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপট লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বিষয় কৃষিজীবন ও কৃষিসংস্কৃতি। বলা যায়, এই অধ্যায় থেকেই আমাদের গবেষণা প্রকল্পের শুভসূচনা। এই অধ্যায়ে সভ্যতার অগ্রগতিতে কৃষি ও উর্বরতাতন্ত্রের পটভূমিকা আলোচিত হয়েছে। সভ্যতার উষালগ্নে উর্বরতাতন্ত্রের ধারণা নানাভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। প্রসঙ্গক্রমে, উর্বরতাতন্ত্র কি এ বিষয়ে বলতে গেলে বলা যায় যে সন্তান সন্ততির মাধ্যমে নিজের সম্প্রসারিত রূপটিকে দেখতে চাওয়া। আবার অন্যদিকে, ফসল সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। সুতরাং উর্বরতাতন্ত্রের মূলে আছে কামনা, তা ফসলই হোক বা সন্তান সন্ততি। তাই ধরিত্রীর শস্য সম্ভব ক্ষেত এবং সন্তান সম্ভব নারীদেহ সমার্থক হয়ে ধরা পড়েছে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই। অর্থাৎ কৃষির সঙ্গে উর্বরতাতন্ত্রের সম্পর্ক অনস্বীকার্য। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা

তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। তৎসঙ্গে কৃষিজীবনের সংস্কৃতি ও লোকায়ত সংস্কৃতির নৈকট্য কোথায় তা আলোচিত হয়েছে। আলোচনাকে সুস্পষ্ট করবার জন্য কৃষি-যন্ত্রপাতি লাঙ্গল, জোয়াল, মই, বেধা, হাসকিনি, কাস্তে ইত্যাদি যেমন তুলে ধরা হয়েছে তেমনি মাছ শিকারের বিভিন্ন উপকরণ (খরা জাল, নাগা জাল, ছাপি জাল, টুঙ্গি জাল, টেপাই, পলো, জান ইত্যাদি), গৃহ আসবাব পত্র, দৈনন্দিন জীবনের উপকরণাদি, খাদ্যাভাস, অলংকার, বসন-ব্যসন, পূজা-আরাধনায় ব্যবহৃত উপকরণাদি, বাস্তুচারণা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। লোকায়ত সংস্কৃতি তথা ব্রত, গান, পূজা-পার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ইত্যাদির সঙ্গে উক্ত কৃষি-সংস্কৃতির সম্পর্ক তথা নৈকট্যকে তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে কৃষি। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলিকে কৃষি সংস্কৃতির নিরিখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমতঃ লোকসংস্কৃতিকে কতগুলি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন, দৈহিক ক্রীড়াধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি, শিল্পধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি, বাগ্‌ধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি, প্রয়োগধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি এবং বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি। প্রতিটি উপঅধ্যায়ে কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক তথা সাংস্কৃতিক সহাবস্থান কিভাবে গড়ে উঠেছে তা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দৈহিক ক্রীড়াধর্মী লোকসংস্কৃতির উপাদান অর্থাৎ ক্রীড়া, নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যাদিকে কৃষিসংস্কৃতির নিরিখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন, তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে যে সমস্ত নৃত্যগীত প্রচলন আছে তার মধ্যে অন্যতম কার্তি পূজা। এই নৃত্যানুষ্ঠানে কৃষিসংস্কৃতি তথা ফার্টিলিটি কাল্ট কিভাবে প্রতীয়মান তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। দ্বিতীয় পর্বটি শিল্পধর্মী লোকায়ত উপাদান; যেমন, লোকায়ত শিল্পকলা, আসবাবপত্র, যানবাহন, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারিক উপকরণগুলির সঙ্গে কৃষি কিভাবে জড়িয়ে আছে তার একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন কৃষিকাজের যন্ত্রপাতিগুলি কৃষিকাজের ক্ষেত্রে যেমন অপরিহার্য ঠিক তেমনি এই যন্ত্রপাতিগুলি লোকায়ত জীবনের শিল্পকলার নান্দনিক বোধের পরিচয়। তৃতীয় পর্বে বাগ্‌ধর্মী লোকসংস্কৃতি যথা প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, লোকগান ইত্যাদি উপাদানে কিভাবে কৃষিজীবন সম্পৃক্ত হয়ে আছে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, কৃষি সম্বন্ধীয় নানা প্রবাদ-ধাঁধা আছে। এই উপাদানগুলিতে কিভাবে কৃষি সম্বন্ধীয় বিশ্বাস সংস্কার নিহিত আছে তা তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ পর্বে প্রয়োগধর্মী শিল্পকলাগুলি কৃষিজীবনের সঙ্গে অর্থাৎ কৃষির সঙ্গে কিভাবে জড়িয়ে আছে তার একটি পর্যালোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ মন্ত্র, তুকতাক, তাবিজ-কবচ, লোকঔষধ, লোকচিকিৎসা কিভাবে কৃষি তথা কৃষিজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত

তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, কৃষিজাত অনেক ফসলই লোকায়ত সমাজ লোকঔষধ হিসেবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ এই সকল ভেষজ কৃষিজাত ফসল কিভাবে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পঞ্চম পর্বে বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানধর্মী লোকায়ত উপাদানগুলি কিভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা তুলে ধরা হয়েছে। লোকায়ত সমাজের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, উৎসব, মেলা ইত্যাদির মধ্যে কৃষির যোগ অচ্ছেদ্য। সেই অচ্ছেদ্য বন্ধনকে বিশ্লেষণের দ্বারা তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে মূল্যায়ণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় উপসংহার। এই অধ্যায়ে সংগৃহীত উপাদানগুলি বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মধ্যদিয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিকেন্দ্রিক ভাবনা লোকসংস্কৃতিকে যে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে তা তথ্যপূর্ণভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

পঞ্চম অধ্যায় পরিশিষ্ট। এখানে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির সংগৃহীত উপাদানগুলি সংকলিত করা হয়েছে। যে উপাদানগুলি উক্ত অধ্যায়গুলিতে নানাক্ষেত্রে বিশ্লেষণের সূত্রে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ সংকলিত উপাদানগুলির বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের নিরিখে কৃষিজীবন ও কৃষিসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে।

——— **** ———

প্রথম অধ্যায়

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ঐতিহাসিক, সামাজিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস

ক) তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের একটি স্বতন্ত্র ধারা বর্তমান। কেননা, এ অঞ্চলে রয়েছে সমভূমি, অরণ্য এবং পর্বত। অন্যদিকে ভারতের মানব প্রজাতির সবকয়টি ধারা এই ভূ-খণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাই এতদঞ্চলকে আমরা ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে অভিহিত করতে পারি । এখানে আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত, তা হল, এই ভূ-খণ্ডের দুই দিকে রয়েছে দুই প্রাচীন নদী (তিস্তা ও তোর্ষা) আর অন্য দিকে রয়েছে সুপ্রাচীন হিমালয় পর্বতমালা।

ভারত উপমহাদেশের এই অঞ্চলে আর্যদের আগে দ্রাবিড়গণ, তারও আগে অষ্ট্রিকেরা কৃষির বিকাশ ঘটিয়েছে। এমনকি মধ্য প্রস্তর যুগে ভারতে প্রথম অভ্যাগত মানবগোষ্ঠী নেগ্রিটোরাও এখানে পদচারণা করেছে। আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদি প্রস্তর যুগে পিলেকান ফ্রোপাসগণ বিবর্তিত হয়ে হোমো ইরেকটাস বা পূর্ণ মানব বর্মা ও ভারতের মধ্য দিয়ে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাপ্ত নির্দশন থেকে অনুমান করা যায়, আদি প্রস্তরযুগের প্রায়-মানবেরা উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে যাতায়াত করেছিল। কেননা, আদি প্রস্তরযুগের নির্দশন ভারতের যে চারটি অঞ্চলে আমরা পাই তা হল পাঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি থেকে ছোটনাগপুর অঞ্চল পর্যন্ত এবং উত্তরবঙ্গ ও অসমের পার্বত্যময় অরণ্য অঞ্চল। সারা উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে আদি, মধ্য ও নব্যপ্রস্তর যুগের নানা উপাদান ও নিদর্শন পাওয়া যায়।[১]

ঐতিহাসিক যুগের প্রথমেই অর্থাৎ ১০০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ৭৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়ে নেগ্রিটো জাতি প্রবেশ করে। এরা আসে আফ্রিকা থেকে। এদের জীবিকা পশু শিকার ও অরণ্যের ফলমূল সংগ্রহ। জনসংখ্যার চাপে শিকারযোগ্য প্রাণীদের পশ্চাদ্‌ধাবন করতে করতে ভারতে প্রবেশ করে। নেগ্রিটোগণ ভারতের পার্বত্যময় অঞ্চল ও মালভূমি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এদের একটি শাখা আরাবল্লী পর্বতমালা ঘুরে ছোটনাগপুর, রাজমহল হয়ে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। আরেকটি শাখা হিমালয়ের পার্বত্য পথে উত্তরবঙ্গে উপনীত হয়।[২]

নেগ্রিটোদের পর ৭৫০০ খ্রীঃ পূঃ কাছাকাছি সময়ে ভারতে প্রবেশ করে অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠী। এরা প্রথমে উত্তরবঙ্গে এসে পরে বাকি ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এরা ছিল যাযাবর শ্রেণি। পরবর্তী

সময়ে অর্থাৎ আনুমানিক ৫০০০ থেকে ৪৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে এরা চাষবাস শেখে তার পরেই গড়ে তোলে স্থায়ী আবাস ও গ্রামীণ সংস্কৃতি।[৩]

খ্রীষ্ট পূর্ব ২০০০ বছর আগে বর্মা সীমান্ত ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ধরে অসম ও প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে মঙ্গোলীয় জাতি প্রবাহ। এদের আরেকটি শাখা তিব্বত হয়ে নেপাল, সিকিম ও ভূটানের পথে উত্তর ভারত ও উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এরাই কিরাত নামে পরিচিত হয়। প্রান্তিক উত্তরবঙ্গ ও অসমের রাজনীতি, সমাজ গঠন, ভাষাভঙ্গি ও সংস্কৃতি মঙ্গোলিয় গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ দান।[৪]

এদের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে আলপানীয় নরগোষ্ঠীর আলপানীয়, দিনারিক ও আর্মেনীয় এই তিনটি শাখা ভারত তথা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এরা এসেছিল মধ্য এশিয়ার পাবর্ত্য ভূমি থেকে। এদের মধ্যে দিনারিক নরগোষ্ঠীর প্রভাব বাঙালীদের মধ্যে সর্বাধিক ছিল।[৫] তবে পরবর্তী কালে এদের প্রভাব ততটা লক্ষ্য করা যায় না। এর কারণ বোধ হয় মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় এবং তৎপরবর্তী কালে আর্যদের সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কিত গভীর প্রভাব।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪৫০০ বছর বা তার কাছাকাছি সময়ে ভারতে প্রবেশ দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর, এদের তিনটি ধারা, প্রথম ধারাটি ছিল মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন, কৃষ্ণকায় ও লঘু শরীর, এদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল মূলতঃ দক্ষিণ ভারত। ৩৭০০ খ্রিষ্ট পূর্বে পশ্চিম ও মধ্য ভারতে যে দ্রাবিড় গোষ্ঠী প্রবেশ করে তারা ছিল দীর্ঘ, উজ্জ্বল বর্ণ ও দৃঢ় গঠন। আরও পরে পূর্ব ভারতে ও রাজপুতানা, পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করে আরেকটি ধারা, যাদের উন্নত নাক, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি গঠন ছিল। পূর্ববর্তী অষ্ট্রিকগোষ্ঠী যেমন ছিল কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার বাহক তেমনি তার ঠিক উল্টো ছিল দ্রাবিড়গোষ্ঠী। দ্রাবিড়রা নাগরিক সভ্যতা ও রাষ্ট্রশক্তির বিকাশ ঘটিয়েছিল দক্ষিণ ভারত তথা সিংহলে, মধ্য ভারতে, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পায়।[৬]

খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করে এখানে তাদের প্রথম উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। প্রবেশ করেই আর্যগণ যে যে রাজশক্তির পরিচয় পেয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুণ্ড্রবর্ধন। বাংলার প্রাচীনতম রাজতন্ত্র পুণ্ড্রবর্ধন এই উত্তরবঙ্গের মাটিতেই গড়ে উঠেছিল। শক্তিশালী রাষ্ট্র ও নগর সভ্যতা পুণ্ড্রবর্ধন রাজতন্ত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী আর্য সাম্রাজ্যবাদকে পূর্ব ভারতে প্রতিহত করে রেখেছিল। এরা 'দস্যু' জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। যার আদি অর্থ দেশীয় জাতি। আর্যগণ সমগ্র ভারতে রাজ্যবিস্তার করতে পারলেও পুণ্ড্রবর্ধনদের কাছে তথা উত্তরবঙ্গে প্রতিহত হয়, স্বাধীন পুণ্ড্রবর্ধন খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৩২০ অব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পত্তন পর্যন্ত স্থির ছিল। পরবর্তী

সময়ে কণিষ্ক থেকে কিরাত বংশোদ্ভূত অহমরাজ পর্যন্ত অনেক অনার্য শাসন ব্যবস্থাই আর্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম করে গেলেও আর্যদের ভাষা, ধর্ম, সামাজিকতা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল। এর অন্যতম কারণ অনার্যগণের ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃতি পাওয়ায় সচেষ্ট হওয়া।[৭]

ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে[৮] আমাদের জীবনের প্রাচীন অধিবাসীদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পরবর্তী ঐতিহাসিক কালের ফলশ্রুতি। কিন্তু ভারতবর্ষের জনপ্রবাহে গভীরভাবে এর স্পর্শ কোথাও না লাগলেও কোনো কোনো অংশের লোকজীবনে তার প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। মঙ্গোলীয় রক্ত ধারায় একদিকে তিনি দেখেছেন আসাম, উত্তরে নেপাল-ভূটান এবং পূর্ব প্রান্তে ব্রহ্মদেশশায়ী প্রত্যন্ত জনপদ ও অরণ্যবাসী লোকেদের মধ্যে। উত্তরে হিমালয় সানুদেশবাসী লিম্বু-লেপচা-রংপা প্রভৃতি রকমের লোকদের তিব্বতি রক্তধারা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। এঁরা উত্তরবাংলার অধিবাসীদেরই অংশভুক্ত। আবার আসামের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তশায়ী যে পৃথক মঙ্গোলীয় রক্তধারা তার পরিচয় তিনি দেখেছেন অন্যান্য অনেক দেশের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপূর্ব আসাম এবং রংপুর, কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি অঞ্চলে। তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চল অর্থাৎ কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষেত্রে সমাজগঠন চিত্র একটু আলাদা। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে এই অঞ্চল কামরূপ-কামতাপুর ও কুচবিহার নামে শাসিত হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চল কুচবিহার -এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুচবিহার শাসনের দুর্বলতার সুযোগে এই পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চল আবার ভূটানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একসময় ভূটানীরা কোচ রাজা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণকে বন্দী করে ভূটান নিয়ে যায়। এই অবস্থায় নাজীরদেও কোন উপায় না পেয়ে ইংরেজদের শরণাপন্ন হয় এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সময় থেকেই কুচবিহার তাঁর সার্বভৌমত্ব হারায় অর্থাৎ কুচবিহার ইংরেজদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ইংরেজ ও ভূটানীদের মধ্যে প্রথম ঈঙ্গ-ভূটান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্যাপ্টেন জোনস্ একদল সৈন্যসহ এসে ভুটিয়াদের যুদ্ধে পরাজিত করে হটিয়ে দেন। অবস্থা দেখে ভূটানরাজ ভীত হন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করে মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ও তার সঙ্গীদের মুক্তি দেন।[৯] যে স্থানে ভূটানরাজের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি হয় সেই স্থানের নাম 'রাজাভাতখাওয়া' যা আলিপুরদুয়ারের নিকটবর্তী অঞ্চলে অতীত স্মৃতি নিয়ে আজও বেঁচে আছে।

এই ঘটনার পরেও পশ্চিম ডুয়ার্সের উপর ভূটানের আধিপত্য থেকেই যায়। ভূটানীরা যখন তখন কোচরাজ্যের অভ্যন্তরে এসে লুটপাট চালাত, আক্রমণ করত। কোচরাজারা ভূটানীদের এই দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পারেননি। ইংরেজরাও এব্যাপারে নীরব ছিল; কারণ তারা ভূটানীদের

চটাতে চাইছিল না, যেহেতু তাদের তিব্বতের সাথে ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল এবং তা হ'ত ভূটানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ভূটানীদের বাড়বাড়ন্ত বেড়েই যাচ্ছিল এবং ইংরেজদের ধৈর্য্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় ১৮৬৩ সালে ইডেন সাহেবকে আলোচনার জন্য ১৮৬৩ সালে ভূটানের রাজদরবারে পাঠানো হয়। কিন্তু ভূটানের রাজদরবারে ইডেনকে ভীষণভাবে অপমান করা হয় এবং জোর করে তাকে এক সন্ধিতে স্বাক্ষর করাতে বাধ্য করে, যা ছিল ইংরেজদের পক্ষে খুবই অপমানকর। এই অবস্থায় ইংরেজরা ভূটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং শুরু হয় দ্বিতীয় ঈঙ্গ -ভূটান যুদ্ধ।[১০] ১৮৬৫ সালে 'সিঞ্চুলা চুক্তির' মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। ১৮৬৫ সালে পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চল দখল করার পর কয়েক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হয়। এ সম্পর্কে জলপাইগুড়ি District Gazzeteer এ উল্লেখ আছে - 'The district so formed in 1869 is bounded in the north by Darjeeling district and Bhutan, in the east by Assam in the south by Rangpur district in Bangladesh and Koch Bihar district and in the west by Darjeeling district and part of Bangaladesh. The respective areas of the two subdivisions of the district, sadar and Alipur Duars, have varied from decade to decade.[১১]

বাংলার উত্তরাংশের সমাজগঠনের ইতিহাস একটু আলাদা এই অর্থে যে, এখানে বাংলার অন্যান্য অংশের মত প্রাগ্ আর্য ও প্রাগ্ দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষই শুধু সভ্যতার বিকাশ ঘটায়নি। প্রাগ্ দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ ছাড়াও এই অঞ্চলের বৃহৎ অংশ জুড়ে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর মানুষ সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল এবং ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী মানুষের আধিপত্য ছিল প্রখর। অবশ্য পরবর্তীকালে অষ্ট্রোলয়েড, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর মানুষের মিশ্রণের ফলে নতুন নতুন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিভিন্ন উপাদান থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই তিব্বত হতে বোদ প্রজাতির মানুষ এসে বর্তমান ডুয়ার্স অঞ্চলে এবং নেপাল পর্যন্ত বসবাস শুরু করে। এরাই পরবর্তীকালে কোচ, মেচ, গারো, রাভা, টোটো, ধীমাল, থারু, লেপচা প্রভৃতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। খ্রীষ্টের জন্মের হাজার বছর আগে থেকেই পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে আর্য সংস্কৃতির মিশ্রণ অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছিল এতদ্অঞ্চলে এবং এই সময় থেকেই তিব্বত থেকে একটি জনজাতি এসে হিমালয়ের পাদদেশে স্থায়িভাবে বাস করতে শুরু করে। যজু এবং অথর্ববেদে এদেরকে কিরাত বলা হয়েছে।[১২] একথা ঐতিহাসিক সত্য যে তিব্বতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে সেখান থেকে লোকেরা নাথুলা গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এরা 'বদ' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। 'বদ্' থেকেই 'বদো'

বা 'বড়ো' শব্দটি এসেছে বলে অনুমান। বদোদের মেচে, কোচে, লাপচে, লিম্বু এবং বরাই নামে পাঁচ ভাই।[১৩] মেচের সঙ্গে যারা ভারতীয় ভূখণ্ডে এসেছিল তারা মেচ নামে পরিচিত হল। এই মেচরা যে নদীর ধারে বাস করত সেই নদীর নামই হল মেচী নদী। কোচের সাথে যারা এলো তারা কোচ নামে পরিচিত হল। অন্যদিকে বদো বা বড়োদের একটি শাখা পূর্বদিক দিয়ে পাটকই পর্বত পার করে ভারতে প্রবেশ করে এবং অসম হয়ে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এ প্রসঙ্গে ড. চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছেন — Such was the history of a Tibeto-Barman speaking Indo-Mongoloid tribe, the Bodos, who migrated into India through patkoi Hills between India and Burma and gradually spread themselves into the whole of modern Assam, North Bengal and parts of East Bengal. The ruled over these tracts of land for many years. It is probable that they marched towards three directions. One part went south upto kachar and were called Kacharis, The second part went along the river Brahmaputra and established themselves in the whole of modern Assam upto Goalpara and parts of Jalpaiguri and Cooch-Behar under the name boro or bara.[১৪]

উত্তরবঙ্গে কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা বহু প্রাচীন কাল থেকেই নানান ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা সমৃদ্ধ। অবিভক্ত বাংলার যে ভূ-ভাগ গঙ্গা নদীর উত্তর প্রান্তে এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পারে অবস্থিত সাধারণভাবে এই ভূ-ভাগকে উত্তরবঙ্গ বলা হয়। এখানে মিলন ঘটেছে সমতলের মানুষের সঙ্গে পাহাড়ি মানুষের। মিলন ঘটেছে বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে, মেচ, রাভা, গারো, কোচ, ওরাওঁ, মুণ্ডা, নাগোশিয়া, ভুটিয়া, লেপচা, দ্রুকপা, চাক্‌মা, শেরপা, হাজং, টোটো, সাঁওতাল, বর্ণহিন্দু, মুসলিম, রাজবংশী আরো বিচিত্র জনজাতি, জাতি, উপজাতি নিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষের সামগ্রিক পরিচয় গড়ে উঠেছে। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে মহাভারতের বর্ণিত ভগদত্তের রাজ্যের কিছু অংশ বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। In the Mahabharata (the historical basis of which goes back to the 10th century B.C., according to F.E. pargiter, H.C. Ray Chaudhury and L.D. Barnett), there is the mention of a king named Bhagadatta. he was the king of Pragjyotisha or Western Assam. He joined the battle of Kurukshetra on the side of the Kouravas with his army of Chinese and Kirata Soldiers. In the Mahabharata, Bhagadatta has been described as a king of the mlechchhas

or non-Hindu barbarians.[১৫] যাইহোক, তিস্তা বিধৌত জলপাইগুড়ি জেলা ১৮৫৪ সালে তৎকালীন রংপুর জেলার একটি মহকুমা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং অবশেষে ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারি পূর্ণ জেলার মর্যাদা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে জেলার সীমানার আবার রদবদল হলে এর গুরুত্ব বা মর্যাদা এতটুকু কমেনি। ১৯৬৩ সালের ৪ মার্চ উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা নিয়ে গঠিত হয় জলপাইগুড়ি বিভাগ এবং জেলা সদরই এই বিভাগের শাসন কেন্দ্র। অন্যদিকে তোর্ষা বিধৌত কুচবিহার ভূখণ্ডটি ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত ইংরেজদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হলেও এই করদ মিত্র রাজ্যের চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তারপর ১৯৪৭ সালের ২৮ শে আগষ্ট কুচবিহারের মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এবং ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণার মাধ্যমে কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রান্তিক জেলা রূপে স্বীকৃতি পায়। এ ভাবেই কুচবিহারে ৪৫০ বছরের একটি রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে।

খ) তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের অক্ষাংশ ২৫°৫৭´৪০´´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৭°০´ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত। দ্রাঘিমাংশ ৮৮°০৪´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৮৯°৫৪´ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত। জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৬৮৮০৩২৮ জন (২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী)। পুরুষ ৩০২৩২৩৯ জন, মহিলা ৩৮৫৭০৮৯ জন। আয়তন ৯৬১৪ বর্গকিলোমিটার। এতদঞ্চলের সীমানা উত্তরে দার্জিলিং ও ভূটান, পূর্বে অসম, দক্ষিণে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে দার্জিলিং জেলা ও বাংলাদেশ।

ভূ-প্রকৃতি ঃ

ভূ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন — এতদঞ্চলের দক্ষিণ অংশে তরুণ পলিমাটি দিয়ে গড়া সমতল ভূমি। এর ঠিক উত্তরে রয়েছে পাহাড়তলি বা উপত্যকা যা রুক্ষ বালি ও নুড়ি পাথরের সমন্বয়ে গঠিত। আর একেবারে উত্তরে ও উত্তর পূর্বে রয়েছে দার্জিলিং ও ভারত-ভূটান সীমানা বরাবর দক্ষিণ হিমালয়ের অনুচ্চ প্রস্তরময় পাহাড়ী বন্ধুরতা যা এখানকার বিস্তীর্ণ সমভূমির পাশে এক দর্শনীয় ব্যতিক্রম। এতদঞ্চলের সমগ্র ভূ-খণ্ডের এই অংশই সবচেয়ে প্রাচীন এবং হিমালয়ের উত্থানের বহু আগেই স্তরীভূত ও রূপান্তরিত হয়েছিল।

বর্তমান ভূমিরূপ প্রাচীন শিলাস্তরের পরে নদী, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের প্রভাবে ক্ষয় সাধনের ফলে উদ্ভূত। ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে এই অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব সীমানা প্রাচীন কঠিন শিলাস্তরের একটি সরু ফালি আছে। দক্ষিণের নদী গঠিত সমভূমি থেকে উচ্চতা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে বক্সা জয়ন্তী অঞ্চলে প্রায় ২০০০ মিটার এবং এর উত্তরে উচ্চতা আরো বেড়েছে।[১৬] পাহাড়ের ঢাল এখানে অত্যন্ত খাড়া ও ভূমিভাগ এবড়ো খেবড়ো এবং বন্ধুর। দক্ষিণের সমভূমি এলাকায় উচ্চতা সামান্য এবং সবটাই নদীবাহিত পলি দিয়ে গঠিত। অসংখ্য নদ-নদী সমতল এই ক্ষেত্রকে খণ্ডে খণ্ডে পৃথক করেছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এতদঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন স্বতন্ত্র। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় ৭০০ কিমি উত্তরে অবস্থিত এতদঞ্চল সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ৫৭ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। হিমালয় থেকে নেমে আসা নদী বাহিত পলিবালি সঞ্চয়ে গঠিত মাটি গভীর প্রায় ১০০০-১৫০০ মিটার।[১৭] এর নিচে রয়েছে প্রাচীন আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা। মাটি হালকা প্রকৃতির, মাটিতে বালির ভাগ বেশি তাই

জলধারণ ক্ষমতা কম। তাছাড়া মাটি কিছুটা অম্লধর্মী। এখানকার ভূমিরূপের ঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। বক্সা অঞ্চল ও ভূটান সীমান্ত ছাড়া এই অঞ্চলের সম্পূর্ণটাই পলিমাটি দিয়ে ঢাকা, কেবলমাত্র উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি সংকীর্ণ অংশে শক্ত পাথর পাওয়া যায়। ভূ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যে সব পাথর ও অবক্ষেপিত স্তর এই অঞ্চলে রয়েছে তার বিবরণ নিচের সারণীতে[১৮] সাজিয়ে দেওয়া হল ক্রমবর্ধমান প্রাচীনত্বের ভিত্তিতে —

ভূ-তাত্ত্বিক কাল	ঃ	ভূ-তাত্ত্বিক স্তর।
আধুনিক এবং প্রাগ্ আধুনিককাল	ঃ	বালু ও পলিমাটির স্তর, নুড়ি ও গণ্ডশিলার স্তর।
মায়োসিন কাল	ঃ	বেলেপাথর, কাদাপাথর ও লিগনাইট।
পারমিয়ান কাল	ঃ	বেলেপাথর, কাদাপাথর ও কয়লা।
প্রি-কেমব্রিয়ান কাল	ঃ	শ্লেট, শিষ্ট, ফিলাইট, কোয়ার্টজাইট, ডলোমাইট, এবং স্তরীভূত লৌহ আকর।

ভূ-তাত্ত্বিক বিবর্তন, অত্যাধিক চাপ ও তাপের প্রবাহে এই সব শিলায় রূপান্তর ঘটেছে। যার মধ্যে শ্লেট, শিষ্ট, কোয়ার্টজাইট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার উল্লেখযোগ্য পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে বেলেপাথর ও কাদামাটি প্রধান। পাহাড়তলি অঞ্চলে নদীবাহিত বড় বড় পাথরের চাঁই ও নুড়ি সঞ্চিত আছে। ভূ-তাত্ত্বিক সময়ানুযায়ী এগুলি খুবই নবীন। পাহাড়ী অঞ্চল থেকে যত দক্ষিণ সমভূমির দিকে অগ্রসর হয়েছে ততই বড় নুড়ি ছোট হতে হতে বালি কণা ও শেষে সূক্ষ্ম পলিমাটিতে পরিণত হয়েছে। এই পলিমাটি সবটাই নদীবাহিত ও অত্যন্ত উর্বর। পাহাড়ী অঞ্চলে মাটিতে বালুকণা বেশি থাকায় চা-গাছের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কোথাও কোথাও মাটিতে নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থের ভাগ কম লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণের পলিসমৃদ্ধ উর্ব্বর সমভূমি কৃষির পক্ষে সহায়ক। তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা ও মানসাই নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মাটি তামাক, পাট ও ধান চাষে খুবই উপযোগী। সম্প্রতি কৃষি কাজের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনের দিকেও উৎসাহিত হতে দেখা যায়। তার মধ্যে গবাদি পশু, শূকর, হাঁস ও মুরগি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

খনিজ পদার্থ ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের প্রধান খনিজ পদার্থ হল ডলোমাইট। যে সব খনিজ পদার্থ এই অঞ্চলে পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তামার আকর ও চুনা পাথর। জয়ন্তী

বক্সা অঞ্চলে রয়েছে ডলোমাইটের বিশাল ভাণ্ডার, আনুমানিক ৩০০ লক্ষ টন ডলোমাইট রয়েছে এখানে।[১৯] জয়ন্তী ডলোমাইট হালকা ছাই রং-এর দানাদার পাথর। এছাড়াও কৃষ্ণবর্ণের এবং সাদা ডলোমাইটও সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। ডলোমাইট প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় চুন তৈরির কাজে এবং জমিতে দেওয়ার জন্য। ডলোমাইট থেকে উত্তরবঙ্গে বিশেষতঃ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে শিল্প সম্ভাবনা আছে। সিমেন্ট ও ঔষধ শিল্প এর মধ্যে প্রধান। জেলায় খনিজের মধ্যে কয়লার কথাও বলতে হয়। জেলায় উত্তরপ্রান্তে বাগরাকোট ও মালের কাছে পাহাড়ের সানুদেশে কয়েকটি পাতলা ভঙ্গুর স্তরের আকারে যে কয়লা পাওয়া যায় তা প্রায় পঁচিশ থেকে কুড়ি কোটি বছর আগের।[২০] এই কয়লা চা-কারখানা ও কাঠের ফলে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বক্সাবাজারের কাছে নিম্নমানের আকরিক লোহার ভাণ্ডার আছে। যদিও তাতে লোহার পরিমাণ খুবই কম মাত্র তিরিশ শতাংশ। তবে ভবিষ্যতে এখানে লোহার ভাণ্ডার গড়ে উঠার সম্ভাবনা আছে বলা যায়।

জলবায়ু ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের জলবায়ু সাধারণতঃ আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি এবং তাপমাত্রা নাতিশীতোষ্ণ হয়। তবে এতদঞ্চলে পশ্চিমাংশের তুলনায় পূর্বাংশে তাপমাত্রা একটু বেশি থাকে। জুন মাস থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাব থাকে। অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তর মরসুম চলে। নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চলে শীতকাল এবং মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। জানুয়ারি হল এতদঞ্চলের শীতলতম মাস। এইসময় তাপমাত্রা ১০.৫° থেকে ২৪° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। মার্চ মাস থেকে ক্রমশঃ তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এপ্রিল ও মে মাসে বেড়ে হয় ৩২.০৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এ পর্যন্ত রেকর্ড করা হিসেব অনুযায়ী সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হল ৪০.০ ডিগ্রি সেন্টেগ্রেড। ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে জেলাটি কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তরে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অধীন হলেও জলবায়ু আর্দ্র প্রকৃতির। বাতাসের আর্দ্রতা শতকরা ৭০ ভাগ। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৪০ সেন্টিমিটার। বছরের প্রায় ১১০ - ১২০ দিন বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিনটি প্রধান ঋতু। January is the coldest month with the mean daily minimum temperature at 10.7° c (51.3° F) and the mean daily maximum temperature at 23.6° C (74.5° F). April and May are the hottest months. The mean daily maximum temperature in these months is 31.6° C (82.9° F) and the mean daily minimum temperature is

21.3° C (70.3° F)... The highest maximum temperature recorded at Jalpaiguri was 40.0° C (104.0° F) in 1932, April 11.[২১]

এখানকার প্রাকৃতিক উদ্ভিদ জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত। প্রচুর বৃষ্টিপাত ও তাপ আধিক্যের ফলে আবহাওয়া উষ্ণ ও স্যাঁতস্যাতে যা কিনা চিরহরিৎ অরণ্যের উপযোগী। শাল, খয়ের, শিশু গাছ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আছে। মাটিতে বালুকণার ভাগ বেশি থাকায় জল দাঁড়ায় না। তবে দক্ষিণাংশে কিছু জলাভূমি আছে, যা কৃষিকাজের অনুকূল। মোট কৃষিযোগ্য জমি প্রায় ১৭৪৬৩৯৬ একর। এর বেশির ভাগ জমিতেই বছরে একাধিকবার চাষ হয়। এতদঞ্চলের দক্ষিণাংশে ফসল উৎপাদন ও চাষের হার খুব বেশি। বর্ষাকাল ছাড়া বছরের বাকি সময় বৃষ্টি কম হওয়ায় জমিতে জলসেচ করার প্রয়োজন হয়। এতদঞ্চলের অধিকাংশ জনগণই কৃষিকাজে নিয়োজিত। যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৯.৫ শতাংশ (২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী)। প্রায় ৪৫২৫২৯ একর এলাকা জুড়ে বনভূমি লক্ষ্য করা যায়। যা মোট ভৌগোলিক আয়তনের ২৮.৫৪ শতাংশ। এখানে যে সমস্ত জঙ্গ ল দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে, শাল, সেগুন, শিশু, গামার, বাঁশ, বেত প্রভৃতি গাছের আধিক্য। বেশির ভাগ বনভূমিই সংরক্ষিত। জলদাপাড়া, গরুমারা, বৈকুণ্ঠপুর ও চাপরামারির অভয়ারণ্যে গণ্ডার, হাতি, বাঘ, চিতা ও অন্যান্য প্রাণী দেখা যায়। এছাড়া পাতলাখাওয়া, গোসানীমারী ইত্যাদি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের বনও দেখা যায়। এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে বনজসম্পদের দান অপরিসীম।

নদ-নদী ঃ

জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা মূলতঃ নদীমাতৃক। জেলাদ্বয়ের অবস্থান যেহেতু হিমালয়ের পাদদেশে তাই স্বাভাবিকভাবেই ভূমির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে। ফলে জেলার নদীগুলিও প্রধানতঃ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। পলিবাহিত এই নদীর অববাহিকাই দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চলকে শস্যশ্যামলা করে তুলেছে। এতদঞ্চলের প্রধান নদীগুলির মধ্যে বেশির ভাগই হিমবাহ পুষ্ট। তাই সারা বছরই জল থাকে। আর যেগুলি কেবলমাত্র বৃষ্টির জলে পুষ্ট সেগুলিতে শীতকালে প্রায়ই জল থাকে না। ছোট ছোট ঝোরা ও নালা ব্যতীত এতদ্অঞ্চলে ৮০ টির বেশি নদী আছে।[২২] এখানকার মূল নদীগুলি হল তিস্তা, ধরলা, জলঢাকা, তোর্ষা, কালজানি, রায়ডাক বা সংকোশ, গদাধর এবং আরো কয়েকটি ছোট নদী।

তিস্তা ঃ

সিকিমের লাচেন ও লাচাঙ নামে দুটি হিমবাহ থেকে তিস্তার উৎপত্তি হয়ে কালিম্পংয়ে প্রবেশ করে। এরপর শিলিগুড়ির পাশে সেবক হয়ে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় প্রবেশ করে এবং হলদিবাড়ি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের রংপুর জেলায় চিলমারি বন্দরের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদে মিশেছে। এর মোট দৈর্ঘ্য ১৭২ মাইল। তিস্তার প্রায় ১২৫ কিমি পড়েছে উত্তরবঙ্গে। এর ডান তীরে ধরলা ব্যতীত অন্য কোন উপনদী নেই। লীস, গীস, ধরলা, খোনাই প্রভৃতি উপনদী বামতীরে মিলিত হয়ে একে আরও স্রোতস্বিনী করেছে। এই নদীর তীরে জলপাইগুড়ি, মেখলিগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ শহর গড়ে উঠেছে। এক সময় মেখলিগঞ্জ থেকে এই নদীর মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য বিশেষ করে তামাক বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হত। ওই সময় বাণিজ্য নৌকা চলাচলের জন্য কুচবিহার রাজ সরকার বাণিজ্যকর নিতেন। এতদ্‌অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে এই নদীর নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে।

জলঢাকা ঃ

১৬০ মাইল দৈর্ঘ্যের জলঢাকা নদী থেকে সিকিমের বিদংহ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মূর্তি, ডায়না, ডুডুয়া, কুমলাই, জিতি, শিপচু, ইনডং, মুজনাই প্রভৃতি উপনদী দ্বারা পুষ্ট হয়ে পশ্চিম ডুয়ার্স দিয়ে শৌলমারি হয়ে কুচবিহার জেলায় প্রবেশ করে। এই জেলায় কোথাও মানসাই, কোথাও সিঙ্গিমারি আবার কোথাও ধরলা নদী হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। চোখকাটা ঘাটের পর থেকে মুজনাই এর মোহনা থেকে জলঢাকা নাম পরিবর্তন করে মানসাই নামে পরিচিত হয়। মানসাই নামটি আবার বেশিদূর বিস্তৃত নয়। মাথাভাঙ্গা শহরকে চিরে সুটুঙ্গা নদী শহর মাথাভাঙ্গার পাশ দিয়ে মানসাই -এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এর কিছু দক্ষিণ পূর্বে মাঘফালার দক্ষিণে এবং শিবপুরের বড়ুয়া হাটের কাছে ধরলা নদী মানসাই -এর ডান তীরে এসে মিশেছে। এর তিন মাইল পর থেকে মানসাই -এর নাম হয় সিঙ্গিমারি এরপর গোসানীমারি মন্দিরের দক্ষিণ ভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিতাই -এ প্রবেশ করার পর তোর্ষা নদীতে মিলিত হয় অবশেষে রংপুরে (বাংলাদেশ) প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে।

এই নদীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব কম নয়। শত শত জেলের জীবন জীবিকা এই নদীর সুস্বাদু বোরলি মাছ। সারা বছর বালি পাথর বিক্রি করে রয়ালটি বাবদ লাখ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে। এর পলিসমৃদ্ধ অববাহিকা দুই জেলার খাদ্যশস্য জোগানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

তোর্ষা ঃ

তোর্ষা শব্দটি এসেছে ভূটানি শব্দ তয়োরোষা বা ক্ষুব্ধ জলরাশি শব্দ থেকে। তিব্বতের মীনচাপ পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূটান অতিক্রম করে সাধুরাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করে। রূপসাপাড়া, তোপাবাসা, হান্টুপাড়া, মাদারিহাট, সোনাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাতলাখাওয়া অঞ্চল দিয়ে কুচবিহার জেলায় প্রবেশ করে, পরে গীতালদহ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়েছে। এর মোট দৈর্ঘ্য ১৪৮ মাইল। হাসিমারার কাছে চরতোর্ষা ও শিলতোর্ষা নামে যে দুটি শাখায় বিভক্ত হয় তা তোর্ষারই শাখা নদী এবং ঘোকসাডাঙ্গার কাছে এদুটি শাখা পুনরায় মিলিত হয়। তোর্ষার উপনদী হল — হলং, হোটোনা, বাংগুড়ি, মুলুঙ্গি, কুলটি, গোলুন্দি প্রভৃতি। তোর্ষা নদী প্রচণ্ড খরস্রোতা, তাই বারবার গতি পরিবর্তন করেছে। বর্তমানে মাথাভাঙ্গার লাফাবাড়ি ও কুচবিহার সদরের বক্সীবস পুঁটিমারীর মধ্য দিয়ে দক্ষিণে বড়ভিট, কুচবিহার শহর, পানিশালার পাশ দিয়ে তুফানগঞ্জে প্রবেশ করেছে। এরপর তুফানগঞ্জে ঘড়ঘড়িয়া ও কালজানি নদী তোর্ষা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

এই নদীর দুই তীরে বহু সমৃদ্ধ শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র একসময় গড়ে উঠেছিল। তুফানগঞ্জ মহকুমার কালজানি ও তোর্ষা নদীর মিলনস্থলের বাম তীরে তুফানগঞ্জ বন্দর ও ডান তীরে কুচবিহার রাজ্যের নাজিরের বাসস্থান বলরামপুর অবস্থিত। ফি বছর বন্যায় নদীর দু'কূল ছাপিয়ে যায়। ফলে দু'তীরে জমি পলিতে ভরে যায়। যা কৃষি কাজের পক্ষে খুবই অনুকূল। একসময় এই নদী দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে নৌকায় ব্যবসা বাণিজ্য চলত।

কালজানি ঃ

17 DEC 2012

ভূটানের ডুঙ্গিনা পাহাড় থেকে এর উৎপত্তি। কালজানি নদীতে মূলতঃ দুটি জল ধারা মিলিত হয়। একটি ডিমা নদী ও অন্যটি আলাইকুড়ি। আলিপুরদুয়ারের নিকট পরোরপাড় গ্রামের নিকট মিলিত হয়েছে। এই মিলনস্থল থেকেই কালজানি নদী নামে পরিচিত। এর উপনদীগুলি হল পারের নদী, নিমতিঝোরা, কালাঝোরা, বুনিয়া নদী প্রভৃতি। আলিপুরদুয়ার থেকে দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত হয়ে কালজানি খোলটা গ্রামে প্রবেশ করেছে। বক্সার পূর্ব দিকে ভূটান পাহাড় থেকে জয়ন্তী নদী উত্তর থেকে পূর্বে প্রবাহিত হয়ে আমবাড়ি গ্রামে গদাধর নাম নিয়ে কালজানি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এর মোহনায় প্রতি মার্চ মাসে অষ্টমী স্নানের মেলা বসে। পূর্ব খোলটায় আরোও দুটি জলধারা নুগ ও চেকো কালজানি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ভেলাপেটা গ্রামে চলে আসে।

241097

LIBRARY

এখানে কালজানির বামতীরে খাটাজানি বলে আর একটি জলধারা কালজানির সঙ্গে মিলিত হয়ে চিলাখানা, ঘড়ঘড়িয়া হয়ে পানিশালা গ্রামে প্রবেশ করে। এখানে তোর্ষা ও ঘড়ঘড়িয়া কালজানির সঙ্গে মিলিত হয়। এরপর কালজানি ছৌখুসি বলরামপুর হয়ে ধুবড়ি রোড অতিক্রম করে ছোটো লোচাফেলা দিয়ে রংপুরে (বাংলাদেশ) প্রবেশ করে।[২৩] এরপর ভিটার বাঁধের শিলখুড়ি গ্রামের মধ্য দিয়ে তিনমাইল প্রবাহিত হবার পর গতি পরিবর্তন করে আবার কুচবিহার জেলায় প্রবেশ করে এবং সংকোশ নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এই দুই নদীর মিলিত প্রবাহ দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়।

নদীটি খরস্রোতা ও গভীর জলবহনে সক্ষম। উজানে প্রায় ৯০০ ফুট চওড়া ও ভাটিতে প্রায় ৬০০ ফুট চওড়া।[২৪] স্বাধীনতার পূর্বে বণিকেরা লবণ, চাল, মশলাপাতি এই নদীপথে আমদানি করত। এছাড়া বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য যেমন - পাট, তামাক, ধান, সরষে বীজ, তেল নদীপথে রপ্তানি করত। পূর্বে ভবানীগঞ্জ থানা কালজানি গ্রামে নদীর ডান দিকে ছিল। পরবর্তীকালে কুচবিহার শহরে স্থানান্তরিত হয়। তখন থেকেই কুচবিহার শহরের বাজারের নাম হয় ভবানীগঞ্জ বাজার।[২৫]

ধরলা নদী ঃ

ভূটানে এটি চিল নদী নামে পরিচিত। ভূটান পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম ডুয়ার্স দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ মন্দিরের পশ্চিম দিকে পবিত্র নদী হিসেবে প্রবাহিত হয়ে চেংমারির সঙ্গে পশ্চিম ডুয়ার্সের বিভাজন ঘটিয়েছে। এরপর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আঁকা-বাঁকা পথে প্রবাহিত হয়ে পানিশালা দিয়ে চ্যাংড়াবান্ধা বন্দরকে ডান দিকে রেখে নিজ তরফ মৌজার দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আবার জলপাইগুড়ি জেলার পাটগ্রামে প্রবেশ করেছে। এরপর বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডকে ডান দিকে রেখে মাথাভাঙ্গা মহকুমা মহিষমুড়িতে প্রবেশ করেছে। তারপর তেতুলের ছড়া, ময়নাতলি, রথেরডাঙ্গা হাট দিয়ে সরু আঁকা-বাঁকা পথে প্রবাহিত হয়ে শিবপুরে বড়ুয়া হাটে সিঙ্গিমারি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এতদঞ্চলের লোকগানে ধরলা নদীর প্রসঙ্গ পাই।

রায়ডাক ঃ

ভূটান ও তিব্বতের সন্ধিস্থলে টাকাফু কুমফু শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন জলপাইগুড়ি জেলার ভূটান ঘাটে এসে রায়ডাক নাম ধারণ করে চেংমারী, পাঁচকোড়া পাড়া, কাতারাম, কামাখ্যাগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে কুচবিহার জেলায় প্রবেশ করে। এই নদী টিয়ামারীর কাছে ১নং রায়ডাক ও ২নং রায়ডাক এই দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। ২নং রায়ডাক ধওলা, তুরতুরী, ধারসী

প্রভৃতি ছোট নদীর জলধারায় পুষ্ট হয়ে সংকোশে পড়েছে। কুলকুলি ও ঘোড়ামারা রায়ডাকের দুটি প্রধান উপনদী। ১নং রায়ডাক কুচবিহারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কুচবিহার জেলায় তুফানগঞ্জ মহকুমায় রায়ডাক আবার তিনটি নামে পরিচিত — দীপা রায়ডাক, মরা রায়ডাক ও রায়ডাক। দীপা রায়ডাক রায়ডাকের একটি উপনদী। পূর্বে রায়ডাক নদীর তীরে অবস্থিত ফুলবাড়ির সঙ্গে বাংলাদেশে বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও ঢাকার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চলত।

সংকোশ ঃ

ভূটানের কাশীথাং পাহাড় থেকে উৎসারিত হয়ে জলপাইগুড়ি জেলার পূর্ব প্রান্ত নিউল্যাণ্ড, পোখরি গাঁও, হলদিবাড়ি, বালাপাড়া, নয়াবাড়ি, ভক্কা, জোড়াই, মাঝের ডাবরি প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হয়েছে। ২নং রায়ডাক ও বেথুয়া এর প্রধান উপনদী।

গদাধর ঃ

বক্সাদুয়ার ছোট সিঞ্চুলা পাহাড়ের পামুসে চুড়া হতে উৎপন্ন হয়ে জয়ন্তী, চুনিফাঝোড়া, সলসলাবাড়ি, সাউথপাড়া, কার্জীপাড়া হয়ে কুচবিহার জেলায় উত্তর দিক থেকে ঘোগারকুটির অন্তর্গত লাউকুটি রাস্তা অতিক্রম করে প্রবেশ করে। এরপর দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে ধুবড়ির রাস্তা ধরে পূর্ব ও দক্ষিণে এক মাইল গিয়ে গাইবাড়ি দিয়ে রংপুর জেলায় প্রবেশ করে ও সংকোশ নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। গদাধরের উত্তর ভাগকে ধেরসি এবং মোহনায় দিকের অংশকে খোরা বলা হয়। গদাধর নামটি সম্প্রতি চালু হয়েছে।[২৬] এটি কালজানির একটি উপনদী। মূলতঃ গদাধর ও কালজানির মিলিত প্রবাহই সংকোশ নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। দাউদখান, জোড়াই, টাকুলা এই নদীগুলি গদাধরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

ডুডুয়া ঃ

পশ্চিম ডুয়ার্সের বিন্নাগুড়ি অঞ্চলে কতগুলি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহ বা জলধারা যেমন, কুল্লুয়া, আংরাভাটা, ইচা, গয়েরখুটা, গারতলী, নোসাই ইত্যাদি মিলিত রূপ ডুডুয়া নদী। এটি একটি মাঝারি মাপের নদী। প্রায় ২০০ গজ চওড়া। জোড়াপানী ও বালাসুন্দর অঞ্চল অতিক্রম করার পর কুচবিহার জেলায় সিঙ্গিজানি গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জলঢাকার সঙ্গে মিলিত

হয়েছে।

আলোচ্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিচয় ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে মৌসুমী জলবায়ুর দ্বারা বৃষ্টিপাত হয়। এতদঞ্চলের উত্তরাংশে পাহাড়ের চরিত্র থাকলেও নিচের দিকে আস্তে আস্তে তা সমতলের রূপ নিয়েছে। তিস্তা ও তোর্ষা বিধৌত উর্বর পলি মাটি সমৃদ্ধ সমতলভূমি যা কৃষিবলয় নামে পরিচিত। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। মোটামুটিভাবে বলা যায় এখানকার মাটি কৃষির উপযোগী। বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছালি পশু পাখি, ফুল, ফল ও শস্যাদি রয়েছে। তবে সবরকম ফসল আলোচ্য অঞ্চলের সর্বত্র হয় না। আলোচ্য অঞ্চলের দক্ষিণ পূর্বাংশে অর্থাৎ মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, শীতলখুচীতে যে পরিমাণ তামাক ও পাট উৎপাদন হয় তা উত্তর-পূর্বাংশে বা উত্তর-পশ্চিমাংশে তেমন হয় না। অবশ্য সর্বত্র কৃষি উৎপাদনের একটা প্রয়াস চলছে। যাইহোক, বর্তমানে আলোচ্য অঞ্চলে রয়েছে এমন সব বৃক্ষ-লতা-শস্যাদি এবং পশু-পাখি-মাছাদির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

ফুল ঃ

অপরাজিতা, অশোক, আকন্দ, কলকে, কলাফুল, কৃষ্ণচূড়া, কলমী, কামিনী, কাঞ্চন, খয়ের, সর্পগন্ধা, কেতকী, গন্ধরাজ, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, চাঁপা, জবা, জুই, টগর, পদ্ম (ময়লানী), পলাশ, বনফুল, বকুল, বেল, মোরগঝুঁটি, নাগকেশর, রক্তজবা, রাধাচূড়া, শালুক, শিউলি, শেফালি, সন্ধ্যাতারা, সূর্যমুখী, ধুতরা, স্থলপদ্ম, বকফুল, তারাফুল, সন্ধ্যামালতি, নাইন-টুয়েলভ্, নাইটকুইন্, কলাবতী, ধুলপি, দোপাটি, ভাউটি ফুল, মাদার ফুল ইত্যাদি।

ফল ঃ

আতা, আম, কাঁচামিঠা আম, কলা, আঁটিয়া কলা, মালভোগ কলা, চম্পা কলা, মধুয়া কলা, মানিক কলা, দখিনা কলা,আনাজী কলা, কাঁঠাল, আনারস, কামরাঙা, পানিয়াল, সবেদা, তরমুজ, তাল, কমলা, খিরা (শসা), খেজুর, গোলাপ জাম, নটকো, ডালিম, ডুমুর, জাম, জামরুল, পেয়ারা, বোগরি বা কুল, পানিফল (নিক্না), বেল, খিরা, তেতুল, তরমুজ, চালতা, জম্বুরা বা বাতাবি লেবু, পেঁপে, মনুয়া কলা, চিনিয়া কলা (চিনিচাম্পা), ছোট কুল (বনবগুড়ি), বল্লাগুটা সুপারি ইত্যাদি।

মূল ঃ

আদা, হলুদ, বার্লি, রসুন, পেয়াজ, শতমূল, শাঁকালু, ওল, কাঠ আলু, মিষ্টি আলু বা রাঙা আলু ইত্যাদি।

বৃক্ষ ঃ

শিমূল, শিশু, শাল, সেগুন, বন কাঠালি, পয়া, শিরীষ, মেহগিনি, বট, পাকুড়, নিম, জগডম্বুরা, কদম, ঝাউ, ঘোড়া নিম, সর্পগন্ধা, অর্জুন, খয়ের, জিগা, মাদার, আম, জাম, কাঁঠাল, আকাশমণি, ছাতিম, শেওড়া, জামরুল ইত্যাদি।

বাঁশ ঃ

বড়ো বাঁশ, মাকলা বাঁশ, জাওটা বাঁশ, বেরু বাঁশ, নল বাঁশ ইত্যাদি।

লতা ও গুল্মাদি ঃ

অনন্তমূল, আকন্দ, বাঁশফুল, তুলসি, সজিনা, হেলেঞ্চা, গন্ধভাদালি, পাথরকুচি, কালমেঘ, স্বর্ণলতা, রাম তুলসি, হাড়ভাঙা বা হাড়জুড়া, পুদিন, পিপুল, পাথরকুচি বাসক, চিরতা, সিঙ্কোনা, চন্দন, অশ্বগন্ধা, থানকুনি পাতা, পুনর্ণভা, গুলঞ্চ,চাকোড় বা চাকোন্দা, রাংচিতা, লজ্জাবতী, বিশল্যকরনি, নিশিন্দা, বিছুটিপাতা, ভেরেন্ডা, গোলমরিচ, নাগকেশর, শুশনি (সুষমি), শ্যামালতা, দুধিয়া লতা, খুড়িয়া, কাঠালি খুড়িয়া, পান (জাতি পান, আসামী পান, বড় পান) ইত্যাদি।

শাক সবজি ঃ

ওল কপি, কচু, মান কচু, শোলা কচু, সজি কচু, দুধ কচু, বিষ কচু, কাবরি কচু, কাঁচা কলা, থোড়, বাড়ালি, কইল্লা (করলা), কুমড়ো (মাটিয়া, জাঙ্গি), গিমা, বতুয়া, লাউ, শিম, পালং, লাফা, পুঁই, পেঁপে, ঢেড়স, ঝিঙ্গা, বরবটি, চিচিংগা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বাদামী আলু, দম আলু, বেগুন, গেছো আলু, মাটিয়া আলু, পটল, চাল কুমড়ো, মূলো, কলমি, হেলেঞ্চা ঢেঁকিয়া শাক, লাল শাক, পাট শাক, ডাটা, তিতারি শাক, মটর শাক, খেসারি শাক, ধনেপাতা, বীট, গাজর, টমেটো, সজনে, কুয়াশ ইত্যাদি।

ডাল ঃ

খেসারি, মাস কলাই (ঠাকুর কলাই), টাউরি কলাই (রাহার কলাই) মটর, মুসুর, মুগ ইত্যাদি।

তৈলবীজ ঃ

তিল, তিসি, বাদাম, সরষে, সূর্যমুখী, ভেরেণ্ডা, মগা ইত্যাদি।

সূক্ষ্ম তন্তু ঃ

পাট (তিতা, তোসা), মেসতা পাট, তুলা (শিমূল, কার্পাস), রেশম (গুটি পোকা) ইত্যাদি।

খাদ্য শস্য ঃ

বিভিন্ন প্রকার ধান, গম, কাওন, চিনা, ভুট্টা, বজরা, মারুয়া, মাকাই ইত্যাদি।

ঘাস ঃ

হোগলা, ঘাগড়া, পুণ্ডি, মধুয়া, দূর্বা, চেপটি, কাশিয়া, এলুয়া, ছন, বিন্না, বাক্সা ঘাস, বাঁদালি ইত্যাদি।

মসলা ঃ

আদা, ধনিয়া, মৌরি, তেজ পাতা, পিয়াজ, রসুন, লঙ্কা, গুলমরিচ, হলুদ, দারচিনি ইত্যাদি।

গুড় ঃ

আখ, খেজুড় ইত্যাদি।

মাদক দ্রব্য ঃ

বংকেট, তামাক, হুকো, ছিলিম, খৈনী, তাড়ি, হাড়িয়া, চুলাই ইত্যাদি।

বাগান ঃ

কলা বাগান, সুপারি বাগান, পান বরোজ, লেবু বাগান, চা-বাগান, কমলা বাগান ইত্যাদি।

মাছ ঃ

আইড়, কই, শিঙ্গি, মাগুর, পুঁটি, শোল, সাটি, কাট্‌না, টেপা, দারিকা, ট্যাংরা, বোয়াল, বাইম, নদীচাঁদা, সরপুটি, বাঘি, চেলি, খলিয়া, কুরসা, কালবোস, শাল, ফলি, ভেদা, বালি ছেকা,

চাটা, বালিয়া, শিলটোকা, বৈরালি বা বোরেলি, চ্যাং, কুচিয়া, আহেলা, পানি মাছ (কচ্ছপ), শামুক, খসলা, গুত্তুম বা পয়া, গচি, ইচা বা ইচ্‌লা, মৌডকা, রাইচ্যাং, ভাগ্না মাছ, রানি, বাচা, চ্যাপটি, নদীয়ারি, মহাশোল, উথাব, তেলাপিয়া, খোট্টি, বাঁশপাতা, ভোলা, এলাং, চেলা, ঢাকরা, রুই, চিতল, শাল বা গজীড়, বাগ আইড়, তিতা, ল্যাংসা, খুটা বাতাসি, মুগরুম, ঘোরা, পগোল, খকসা, উটা (কাকল্যা), ঠোনা, দুরামাছ ইত্যাদি।

পাখি ঃ

শাড়ো (শালিক), গুই শালিক, ঘুঘু, মাছরাঙা, সাদাবক, কালা বক, দোয়েল, ঘেচু (ফিঙে), চড়ুই, বাবুই, কাক, চিল, পেঁচা, পানিকৌড়ী, ডাহুক, কোকিল, বালিহাঁস, হাঁস, মুরগি, কাঠঠোকরা, পায়রা, বাদুড়, হরিয়াল, ময়না, টিয়া, হাড়গিলা, মধুচোষা, বিন্দিচোরা, করুয়া, ভ্যালোয়া (শঙ্খচিল), ফুটিকজল (চাতক), বাওই, কলানাথ, বেসকঝেকি, টুনটুনি, হলদেপিয়ালি, ময়ূর,নীলকণ্ঠ, নদিয়া শাড়ো, মাছরাঙা, ধনেশ ইত্যাদি।

পশু ও জন্তু ঃ

কুকুর, গরু, ছাগল, খরগোস, ভ্যাড়া, ঘোড়া, বানর, বেড়াল, শুকর, হাতি, খাটাস, ভাল্লুক, হায়েনা, বেজি, বাঘ, ইদুর, চিতা বাঘ, উদ্, কাঠ বিড়াল, ভাম, খেকশিয়াল, শিয়াল, গণ্ডার, বাইসন, হরিণ, সজারু, মহিষ, বুনোমহিষ ইত্যাদি।

সাপ ঃ

গোমা (গোখরে), ডারাস, ঢোঁরা, গুঁইসাপ, লাউডগা, বাঁশ সাপ, শঙ্খনাগ, গেন্টি, সুতা সাপ, দুমুখা সাপ, গাঙ্গা সাপ ইত্যাদি।

কীটপতঙ্গ ঃ

উই, ফড়িং, পিঁপড়ে (লাল, কালো), রক্ত চোষা, টিকটিকি, আরশোলা, কাঁকড়া, কাঁকড়বিছা, গান্ধিপোকা, শ্যামাপোকা, বোল্লা (বোলতা), ঘাসফড়িং, জোঁক, জোনাকি, ঝিঁঝি পোকা, মাকড়সা, মশা, মাছি, মধুমাছি, ব্যাঙ (সোনা ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ, কোটরি ব্যাঙ, গেছো ব্যাঙ) ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক পরিচয় ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভর করে। আলোচ্য অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষের কৃষির প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এখানকার হাটবাজার মূলতঃ কৃষিদ্রব্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তাই একটি বাজারে বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের নাম নিয়ে বিভিন্ন 'হাটি' গড়ে ওঠে। যেমন — পাট হাটি, ধান হাটি, তামাক হাটি, সবজি হাটি, কলা হাটি, পান হাটি, চিড়া হাটি, দই হাটি, দুধ হাটি ইত্যাদি। তবে সব সময় যে চাষাবাদ লাভজনক হয় তা কিন্তু নয়। খরা বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে চাষে অনেক সময় ক্ষতিই বেশি হয়। তবু মানুষ চাষাবাদ করেন। এর পেছনে প্রচলিত একটি প্রবাদ বিরাট ভূমিকা পালন করে —

"ধান পান গাই
এই তিন হলে কারো দুয়ারে না যাই।"

এইরূপ ধারণার ফলেই হয়তো মানুষ কৃষিকাজ করেন। তাছাড়া কিনে খাওয়ার মতো সামর্থ সবার নেই। লাভজনক না হলেও ঘরের ফসলে সারা বৎসর খেতে পেলে মানুষ নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করে। আজকাল অবশ্য অনেকে ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত রয়েছে, যেমন — গ্যারেজ মিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি, রাজ মিস্ত্রি, ভ্যানচালক, রিক্সা চালক, মোটর গাড়ি চালক ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে একটা বড় অংশ ভিন রাজ্যে কাজ করে এলাকায় অর্থনৈতিক অবস্থাকে সচল রেখেছে।

কৃষির মধ্যে ধান, পাট, তামাক, বিরাট ভূমিকা পালন করে। মূলতঃ এই তিনটি ফসলই অর্থনৈতিক কাঠামোর মূলে রয়েছে। আজকাল আলুও একটি অর্থকরী ফসল হিসেবে উঠে এসেছে। আমাদের রাজ্যে তেইশ লক্ষ বিঘা জমিতে আলু চাষ হয়। রাজ্যে আলুর গড় বিঘা প্রতি ৮৭ মন। সর্ব ভারতীয় গড় বিঘা প্রতি ৫৮ মন। পশ্চিমবঙ্গে সারা ভারতের প্রায় ৩৫ শতাংশ আলু উৎপাদন হয়। হুগলী, বর্ধমান, মেদেনীপুরে রাজ্যের উৎপাদনের ৬৫ শতাংশ আলু হয়। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে আলু চাষ হয়। গড় ফলন জাতীয় গড় ফলনের প্রায় সমান।[২৭] ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, শীতলখুচী, সিতাই, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার,ফালাকাটা ব্লকে ধান, তামাক, পাট, আলুই জীবিকার প্রধান হাতিয়ার। তিস্তা ও তোর্ষা নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপাদন হত। একদা এই তামাক রপ্তানি হত ব্রহ্মদেশে (মায়ানমার), এছাড়া স্থানীয় পাইকাররা বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলেও এই তামাক রপ্তানি করত।

তামাকের মত পানও একটি অর্থকরী ফসল। ময়নাগুড়ি ব্লকের পানবাড়ি, ধওলাগুড়ি,

ধূপগুড়ি ব্লকের দুরামারি, মাগুরমারি, তুফানগঞ্জের বলরামপুর, বারকোদালি, আলিপুরদুয়ার, সলসলাবাড়ি, ভাটিবাড়ি, মরিচবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পান চাষ হয়ে থাকে। এই পান বিশেষ করে সুপারি বাগানে পরিলক্ষিত হয়। সুপারি গাছকে ঘিরে পান চাষ এতদঞ্চলের একটি বিশেষ রীতি। পান প্রধানতঃ দুই প্রকারের। ১. আসামী পান, এই পান একটু ঝাল হয়। ২. জাতি পান, এই পান মিষ্টি হয়। আর্থিক ও সামাজিক ভাবে রাজবংশী সমাজে পান-সুপারির ভূমিকা বিরাট। অতিথি অভ্যর্থনা থেকে শুরু করে বিদায় পর্যন্ত বিশেষ সম্মান হিসেবে পান-সুপারি অপরিহার্য। আজও তিস্তা ও তোর্ষা পারের একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে বড় বড় পান-সুপারি বাগান লক্ষ্য করা যায়।

আলোচ্য অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ধান জন্মে। ধান বৎসরে দুইবার মাত্র রোপণ করা হয়। তার মধ্যে আউশ এবং আমনই প্রধান। বর্তমানে উৎপাদিত, লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় ধান সমূহের নাম, ধানের আকারগত বৈশিষ্ট্য এবং ভূ-প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হল।

জমির অবস্থা	ধানের জাত	গাছের উচ্চতা	দানার আকার	স্থিতিকাল
মাঝারি, উঁচু	কাতার	আংশিক বেঁটে	মাঝারি সরু	৯০-১০০
মাঝারি, উঁচু	ধারেয়া	আংশিক বেঁটে	মাঝারি সরু	৯০-১০০
মাঝারি, উঁচু	মালা	আংশিক বেঁটে	বেঁটে মোটা	৯০-১০০
নীচুজমি	গারো ঢেপি	আংশিক বেঁটে	মোটা	৯০-১০০
মাঝারি, নীচু	পাইজাম	বেঁটে	ছোট, মাঝারি সরু	৯০-১০০
মাঝারি, নীচু	আসামী (পাইজাম)	বেঁটে	ছোট, মাঝারি সরু	৯০-১০০
নীচু	বগাধান	আংশিক বেঁটে	মাঝারি সরু	৯৫-১১০
নীচু	বাইগন বিচি	আংশিক বেঁটে	সরু বেঁটে	৯৫-১১০
নীচু	ডুমুরা	আংশিক বেঁটে	সরু বেঁটে	৯৫-১১০
নীচু	পরাঙ্গী	আংশিক বেঁটে	মাঝারি বেঁটে	৯৫-১১০
নীচু	কাশিয়াবান্ধা	মাঝারি লম্বা	মাঝারি সরু	৯৫-১১০
নীচু মাঝারি	চায়না	আংশিক বেঁটে	মাঝারি সরু	১১০-১২০
নীচু মাঝারি	এরিধান	আংশিক বেঁটে	ছোট সরু	১১০-১২০
নীচু মাঝারি	দুধকলম	আংশিক লম্বা	মাঝারি লম্বা	১৪০-১৬০
নীচু, মাঝারি	কলম	আংশিক লম্বা	মাঝারি লম্বা	১৪০-১৬০
নীচু মাঝারি	স্বর্ণ	আংশিক বেঁটে	মাঝারি বেঁটে	১৪০-১৪৫

জমির অবস্থা	ধানের জাত	গাছের উচ্চতা	দানার আকার	স্থিতিকাল
নীচু মাঝারি	জাদু	আংশিক লম্বা	মাঝারি বেঁটে	১৩০-১৪৫
উঁচু ও মাঝারি	ভোগধান	আংশিক লম্বা	সরু	১৩০-১৪৫
উঁচু ও মাঝারি	নুনিয়া	আংশিক লম্বা	সরু	১৩০-১৪৫
উঁচু ও মাঝারি	নুনিয়া (কালো)	আংশিক লম্বা	সরু	১৩০-১৪৫
নীচু মাঝারি	বন্নিধান	আংশিক লম্বা	মাঝারি বেঁটে	১২০-১৪০
নীচু মাঝারি	কুকুর জালি	আংশিক লম্বা	মাঝারি সরু	১৩০-১৪০
নীচু মাঝারি	লাল ঢেপি	আংশিক লম্বা	বেঁটে মোটা	১৩০-১৪০
নীচু মাঝারি	লোহা জাং	আংশিক লম্বা	বেঁটে মোটা	১৩০-১৪০
সর্বত্র	বচি	আংশিক লম্বা	বেঁটে মোটা	১৩০-১৪০
সর্বত্র	আইরেট	আংশিক লম্বা	বেঁটে মোটা	১৩০-১৪০
সর্বত্র	লালসীতা	আংশিক লম্বা	সরু লম্বা	১৩০-১৪০
সর্বত্র	সাম্বা মাসুরি	আংশিক লম্বা	সরু লম্বা	১৩০-১৩৫
সর্বত্র	নিলাঞ্জনা	আংশিক লম্বা	সরু লম্বা	১৪০-১৪৫
মাঝারি	স্বর্ণমাসুরি	মাঝারি লম্বা	ছোটো সরু	১২০-১৩০
মাঝারি	মাশুরি	মাঝারি লম্বা	সরু, স্বর্ণ বর্ণ	১২০-১৩০
মাঝারি	রাজলক্ষ্মী	মাঝারি লম্বা	সরু, স্বর্ণ বর্ণ	১৪০-১৪৫
মাঝারি	হীরা	মাঝারি লম্বা	সরু, স্বর্ণ বর্ণ	১৪০-১৪৫
মাঝারি	শ্যামলী	মাঝারি লম্বা	সরু, স্বর্ণ বর্ণ	১৪৫-১৫০
মাঝারি, নীচু	রঞ্জিত	আংশিক লম্বা	লম্বা, সরু	১৪০-১৫৫
মাঝারি, নীচু	পঙ্কজ	আংশিক লম্বা	লম্বা, সরু	১৪৫-১৫০
মাঝারি, নীচু	সি. আর. ১০০৬	আংশিক লম্বা	লম্বা, সরু	১৫০-১৫৫
মাঝারি, নীচু	সি. আর. ১০১০	আংশিক লম্বা	লম্বা, সরু	১৫৫-১৬০
মাঝারি, নীচু	উৎকল প্রভা	আংশিক লম্বা	লম্বা, সরু	১৫৫-১৬০
সর্বত্র	ধরিত্রী (সি. আর. ১০১৭)	মাঝারি লম্বা	বেঁটে, সরু	১৫৫-১৬০
সর্বত্র	গায়ত্রী - সি. আর. ১০১৮	মাঝারি লম্বা	বেঁটে, সরু	১৫৫-১৬০

জমির অবস্থা	ধানের জাত	গাছের উচ্চতা	দানার আকার	স্থিতিকাল
সর্বত্র	আই. আর. - ২৬	আংশিক বেঁটে	বেঁটে, সরু	১৫৫-১৬০
সর্বত্র	আই. ই. টি. - ৫৬৫৬	আংশিক বেঁটে	বেঁটে, সরু	১৫৫-১৬০
সর্বত্র	বি.এন. ২০	আংশিক বেঁটে	বেঁটে, সরু	১৫৫-১৬০
সর্বত্র	এন.সি. কলমা	আংশিক লম্বা	মাঝারি লম্বা	১৫৫-১৬০
সর্বত্র	সাবিত্রী (সি.আর. ১০০৯)	আংশিক লম্বা	মাঝারি লম্বা	১৫৫-১৬০
বেশি নীচু জমি	সবিতা (এন.সি. ৪৯২)	মাঝারি লম্বা	মাঝারি, সরু	১৫৫-১৬০
বেশি নীচু জমি	লুনিশ্রী সি.আর.এম. ৩০	মাঝারি লম্বা	মাঝারি সরু	১৬০-১৬৫
বেশি নীচু জমি	গীতাঞ্জলি	মাঝারি লম্বা	মাঝারি সরু	১৬০-১৬৫
সর্বত্র	জয়া	আংশিক বেঁটে	মোটা, সাদা	১৪৫-১৫৫
সর্বত্র	ইরি-আট	আংশিক বেঁটে	মোটা, লম্বা	১৪৫-১৫৫
উচু ও মাঝারি	সাদা নুনিয়া	মাঝারি লম্বা	সাদা, সরু	১৬০-১৬৫
মাঝারি নীচু জমি	সরু স্বর্ণ (এম.টি.ইউ.৭০২৯)	আংশিক বেঁটে	মাঝারি সরু	১৪০-১৪৫
উঁচু জমি	অন্নদা (আই.ই.টি.- ৬২২৩)	আংশিক বেঁটে	বেঁটে মোটা	১০৫-১১০
উঁচু জমি	আদিত্য (আই.ই.টি.- ৭৬১৩)	মাঝারি লম্বা	লম্বা মোটা	৯৫-১০০
উঁচু জমি	রসি (আই.ই.টি.- ১৪৪৪)	বেঁটে	মাঝারি মোটা	১০৫-১১০
উঁচু জমি	পারিজাত (আই.ই.টি.- ২৬৮৫)	আংশিক বেঁটে	সরুদানা	৯৫-১০০
উঁচু জমি	ভূপেন (আই.ই.টি.- ১২১৩২)	মাঝারি লম্বা	লম্বা সরু	১১০-১১৫
মাঝারি জমি	শতাব্দী (আই.ই.টি.- ৪৭৮৬)	আংশিক বেঁটে	খুব সরুলম্বা	১১০-১১৫

জমির অবস্থা	ধানের জাত	গাছের উচ্চতা	দানার আকার	স্থিতিকাল
মাঝারি জমি	ক্ষিতীশ (আই.ই.টি.- ৪০৯৪)	বেঁটে	লম্বা সরু	১১৫-১২০
মাঝারি জমি	ললাট (আই.ই.টি.- ৯৯৪৭)	আংশিক বেঁটে	লম্বা সরু	১১৫-১২০
মাঝারি জমি	আই. আর. ৩৬ (আই.ই.টি.- ৪৫৫৫)	আংশিক বেঁটে	লম্বা সরু	১১৫-১২০
মাঝারি জমি	গজপতি (আই.ই.টি.- ১৩২৫১)	আংশিক বেঁটে	মাঝারি মোটা	১১৫-১২০
মাঝারি জমি	সুরক্ষা (আই.ই.টি.- ৭৯৪৬)	আংশিক বেঁটে	লম্বা মোটা	১১৫-১২০
মাঝারি নীচু	বিজেতা (এম.টি.ইউ.- ১০০১)	আংশিক বেঁটে	মাঝারি লম্বা মোটা	১৩৫-১৪০
মাঝারি নীচু	অজয়া (আই.ই.টি.- ৮৫৮৫)	আংশিক বেঁটে	লম্বা মোটা	১৩০-১৩৫
নীচু জমি	শশী	মাঝারি লম্বা	লম্বা সরু	১৪৫-১৫০
নীচু জমি	সি.আর.-১০১৪	মাঝারি লম্বা	মাঝারি সরু	১৫০-১৬০
নীচু জমি	সি.আর.-১০০২	আংশিক বেঁটে	বেঁটে মোটা	১৫০—১৬০
বেশি নীচু জমি	অমূল্য	লম্বা	লম্বা সরু	১৫৫-১৬০
বেশি নীচু জমি	ভূদেব	মাঝারি লম্বা	মাঝারি সরু	১৫০-১৬০
বেশ নীচু জমি	আই.ই.টি. - ১৪৪৯৬	মাঝারি লম্বা	মাঝারি সরু	১৫০-১৬০
মাঝারি জমি	বুড়াবন্নী	মাঝারি লম্বা	লম্বা, সরু	১৫০-১৬০
উঁচু জমি	বোয়াপাকড়ি	আংশিক বেঁটে	বেঁটে, সরু	১৫০-১৬০
উঁচু, মাঝারি	বামনভোগ	আংশিক বেঁটে	বেঁটে, সরু	১৪০-১৫০
উঁচু, মাঝারি	ধাউলি	আংশিক লম্বা	মাঝারি, সরু	১৪০-১৫০
সর্বত্র	পাখিরি	মাঝারি লম্বা	লম্বা, সরু	১৪০-১৪৫
সর্বত্র	ফুল পাখিরি	মাঝারি লম্বা	লম্বা, সরু	১৪০-১৪৫
উঁচু, মাঝারি	কাঁতসাইল	আংশিক লম্বা	লম্বা, বেঁটে	১২০-১৩০

জমির অবস্থা	ধানের জাত	গাছের উচ্চতা	দানার আকার	স্থিতিকাল
নীচু জমি	বড়োপানাতি	আংশিক লম্বা	লাল, লম্বা	১৫০-১৬০
নীচু জমি	ছোটপানাতি	আংশিক লম্বা	লাল, ছোটো	১৫০-১৬০
নীচু জমি	আমলাকাসা	আংশিক লম্বা	মোটা, লম্বা	১৫০-১৬০
নীচু জমি	গাঠিয়া	লম্বা মোটা	মোটা, বেঁটে	১৫০-১৬০
উর্বর মাঝারি	নীলাজি	আংশিক বেঁটে	লম্বা, সরু	১৪০-১৪৫
উঁচু, মাঝারি	বীরমন্দিনী	মাঝারি লম্বা	কালোলালচে, লম্বা	১৩০-১৪০
উঁচু, মাঝারি	জমিরা	মাঝারি লম্বা	মোটা, খয়েরি	১৪০-১৫০
উঁচু, মাঝারি	গোবিন্দ ভোগ	আংশিক বেঁটে	ছোটো, সরু	১৬০-১৬৫
নীচু জমি	বাতাই ধান	লম্বা	মোটা, লম্বা	১৭০-১৮০
নীচু জমি	হরিণতুর (মুড়ির জন্য বিখ্যাত)	মাঝারি লম্বা	মাঝারি, মোটা	১৫০-১৬০
মাঝারি জমি	স্বপনডেলি	মাঝারি লম্বা	লম্বা, সরু	১৫০-১৬০

এছাড়া আরো কিছু ধানের নাম পাওয়া যায় যেমন — বলরামভোগ, চিনিশংকর, ইন্দ্রসাইন, বগাঝুন, মহারাজা, ভূসর, যোশোয়া, গুঞ্জারী, খাঙ্গারমাও, হলদিজাম, নারিকেলঝোপা, চাপান, ভূমরা, কালপুখরি, ছাইতান, সাটিয়া, উবজাল, কালো শনি, মেঘ আন্‌ধারি, বারিবাংলা, ছোট শনি, ধলকাচ্চা, বোয়াদার, লুধিয়ান, মালশিরা ভাদই, ধৌলি, কচুডালা, রাভণ, এ্যাণ্ডা, কাকুয়া, এন্দুরশাইল, পানিশাইল, কেওয়া, বিন্দিভোগ, গান্‌জিয়া, কাঠারিভোগ, নাইওর, বিন্নাফুলি, কলড়োমা, ডাঙ্গাবোরুয়া, পব্বতজিরা, উকনিমধু, গড়িয়া, নেলপাই, পাড়াসী, ছাতনডুম্‌রা, জগন্নাথভোগ প্রভৃতি।

গ) সমাজজীবন ও জনবিন্যাস ঃ

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নানা জাতি ও উপজাতি, বর্ণ ও ধর্মের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলা অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে পদার্পণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে স্থায়ীভাবে বাস করছে। কেউবা ইতিহাসের নিয়মে কিছুকাল এখানে অবস্থান করে অন্যত্র চলে গিয়েছে আবার কেউ কেউ মিশে গিয়েছে পরবর্তী মানব প্রবাহের সঙ্গে। কিন্তু এইসব মানবগোষ্ঠীর অবশেষগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এখানকার ভাষা, সংস্কৃতি ও জনগঠনের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে গড়ে তুলেছে একটি মিশ্র জনমণ্ডলী। তিস্তা ও তোর্ষা পারে এই রূপ জনমণ্ডলীর মধ্যে কোচ, রাভা, টোটো, মেচ, সাঁওতাল, বোড়ো, ওরাওঁ অন্যতম।

আলোচ্য অঞ্চলের সমাজ মূলতঃ গ্রামীণ সমাজ। মহকুমা ও ব্লকভিত্তিক শহর থাকলেও সেই শহরগুলিতে যারা বাস করেন, তারা কোন না কোন ভাবে গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে যুক্ত। তবে চাকুরি ব্যবসা ইত্যাদি কারণে গ্রামীণ সমাজে পশ্চিমি সভ্যতা ও বাইরের শহুরে সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একত্রে বাস করেন। যে যার বৃত্তি করা ছাড়াও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে অন্যান্য বৃত্তিও করে থাকেন। সমাজে দেউনিয়া ব্যবস্থা আজও রয়েছে। তবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আসার পর 'দেউনিয়া' বা 'দেওয়ানির' গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে। কয়েক দশক পূর্বেও একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র দেখা গেছে। আজ আর খুব একটা দেখা যায় না। বাল্য বিবাহ ও বিধবা বিবাহ খুব একটা দেখা না গেলেও গ্রাম্য দলাদলি ইত্যাদি পরিচয় পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক চিত্র ও সমাজ চিত্র পরস্পর পরিপূরক। তাই আর্থ-সামাজিক চিত্রের পর্যালোচনায় এবার আমরা উত্তরবঙ্গের সমাজচিত্র অবলোকন করব।[২৮] নিচের টেবিলের মাধ্যমে একটি শ্রেণিগত সমাজ চিত্রের নমুনা দেওয়া হল —

উচ্চবিত্ত	মধ্যবিত্ত	নিম্নবিত্ত	সাধারণ	অতি সাধারণ
জমিদার,	উকিল, ডাক্তার,	সাধারণ কৃষক,	প্রান্তিক কৃষক,	ভূমি ও গৃহহীন
জোতদার,	শিক্ষক, পুলিশ,	সাধারণ সরকারী	জেলে, কুলি	কৃষি ও অকৃষি
মহাজন,	চা-বাগানের বাবু,	চাকুরে, মুদি	মজুর, মাঝি,	শ্রমিক, ভিখারী
চাকলাদার,	ছোট ব্যবসায়ী,	দোকানদার	সাপুড়ে,	ইত্যাদি
চা-বাগানের	স্বাধীন বড় চাষী	ইত্যাদি	দোকানের	
মালিক,	ইত্যাদি		কর্মচারী,	
কন্ট্রাক্টর,			রিক্সাওয়ালা,	
বড় ব্যবসায়ী,			কৃষি শ্রমিক,	
বড়চাকুরে			সীমান্তের	
ইত্যাদি			চোরাকারবারী	
			ইত্যাদি	

শ্রেণি বা পেশাগত সমাজচিত্রের পর এবার আমরা ভাষা/উপভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায় লিঙ্গ ও অন্যান্য বিষয়ের এতদঞ্চলের চিত্র পর্যালোচনা করব।

ভাষা/উপভাষা	ধর্ম	সম্প্রদায়	লিঙ্গ	অন্যান্য
রাজবংশী	হিন্দু,	রাজবংশী	পিতৃশাসিত,	উদ্বাস্তু
সাঁওতাল	মুসলমান	নমঃশূদ্র	মাতৃশাসিত	থারু
মদেশিয়া	খ্রীষ্টান	ধাওয়া	মহিলাদের	ধীমাল
নেপালি	বৌদ্ধ	মালো	অবস্থান।	মেচ, রাভা
বাঙ্গালী	ইত্যাদি।	কৈবর্ত		গারো,
কুরমী		ইত্যাদি।		টোটো
টোটো/ডুকপা				ইত্যাদি।
ইত্যাদি।				

আর্যদের আগমনের পূর্বে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সীমানা জুড়ে বাস করতেন প্রাক্-আর্যগোষ্ঠীর মানুষ কোল, ভীল, মুণ্ডা, পুলিন্দ, কিরাত ও শবরেরা। পরবর্তীকালে নেপাল ও হিমালয়ের দক্ষিণবঙ্গ, বিহার ও কামরূপ অঞ্চল বাস করতে এসেছেন হিমালয়-প্রান্তিক মঙ্গোল

শাখার মানুষ। এরাই প্রধানতঃ কিরাত গোষ্ঠীর মানুষ। একদিকে আর্য সংস্কৃতি ও অন্যদিকে কিরাত-সংস্কৃতির মিলনের ফলে সৃষ্ট উত্তরবাংলার সংস্কৃতি তাই স্বাভাবিক ভাবেই মিশ্র সংস্কৃতি। বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ই এই সংস্কৃতির প্রধান কথা। পরবর্তীকালে এখানে এসেছেন ইংরেজ, মোঘল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল প্রভৃতি শ্রেণির মানুষেরা। নেপালিরাও এসেছেন এখানে। ইতিহাস বলে, যুগে যুগে এখানে নানা ধর্মের প্লাবনও বয়ে গিয়েছে এখানে। হিন্দু, বৌদ্ধ, শৈব, জৈন, নাথ এবং খ্রীষ্ট্র ধর্মের ধারাও এসেছে এখানে অবিচ্ছিন্ন গতিতে। পাল আমলে এখানে যে বৌদ্ধ সংস্কৃতির জোয়ার জেগেছিল সে কথাও ইতিহাস সমর্থিত। মহাযান শাখার বৌদ্ধরা যারা তান্ত্রিক বৌদ্ধ বা সাধকরূপে পরিচিত উত্তরবঙ্গে নানা স্থানে তাদের নানা মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। নানা ধরনের আচার-আচরণ ধর্মবিধি এখানে ছড়িয়ে রয়েছে। পাল রাজাদের পর সেন রাজাদের যুগে আবার এসেছে হিন্দুধর্ম। অন্যদিকে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রবাহ পাশাপাশি বয়ে গিয়েছে। উত্তরবাংলার লোকসাহিত্য তাই এই বিচিত্র লোকসংস্কৃতির প্রেরণা। কামরূপ কামতা বা কুচবিহার রাজ্যের নানা ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চল বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক। অবশ্য এর বাইরে আসামের গোয়ালপাড়া জেলা, কামরূপে উত্তরে নওগা জেলার পশ্চিমাংশেও রাজবংশীদের বাস আছে। এই রাজবংশী সমাজের উদ্ভব ও আবির্ভাব সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইংরেজ গবেষকদের হান্টার[২৯] রিজলি[৩০] রাজবংশীদের দ্রাবিড়িয় শাখার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ও ডোলেন[৩১] তাঁর "ভারত আদম সুমারির বিবরণ" (১৮৯১) প্রসঙ্গে মনে করেছেন যে পূর্ব গিরিপথগুলি দিয়ে মঙ্গোলীয়দের আগমন ধারার তৃতীয় শাখা রাজবংশীগণ। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার লোক বলেছেন।[৩২] ড. গিরিজাশঙ্কর রায় মনে করেন "আসাম, ব্রহ্মদেশ, ত্রিপুরা, নেপাল এবং হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত স্থানগুলির লোকেদের যে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার দৈহিক আকৃতির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়কে বিচার করিলে এই মতের সমর্থন না করিয়া পারা যায় না। পরবর্তীকালে ইহাদের সহিত অষ্ট্রিক দ্রাবিড় ভাষা-ভাষি গোষ্ঠীর মিশ্র জাতি বাঙ্গালীদের সহিত রক্ত সংমিশ্রণ ঘটিতে পারে। তাহার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রাজবংশীরা যে ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, সেটি বাংলা ভাষারই একটি বিশিষ্ট উপভাষা।"[৩৩] আমরা অবগত আছি যে জনতত্ত্ব নিরূপণে ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির ভূমিকা কিছু মাত্র কম নয়। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন — জননির্ণয়ে ভাষা বিশ্লেষণ যে অন্যতম সহায়ক

একথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কোন জনের ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখা যায় যে সেই ভাষায় জীবন চর্যার মূল শব্দগুলি কিংবা পদরচনা রীতি কিংবা পদভঙ্গি অথবা মানুষ ও স্থান ইত্যাদির নাম অন্যকোন জনের ভাষা হইতে গৃহীত বা উদ্ভূত তখন স্বভাবতই এ অনুমান করা চলে যে সেই পূর্বোক্ত জনের সঙ্গে শেষোক্ত জনের রক্তে সংমিশ্রণ না হোক মেলা মেশা ঘটিয়াছে।"[৩৪] খ্রীষ্ট্র-পূর্ব চতুর্থ শতকে আর্য ভাষীরা এবং তার কিছুকাল পরে তিব্বত ব্রহ্মীয় ভাষীরা যদি বাংলাদেশে প্রবেশ করে থাকে অনুমান করা যেতে পারে তা হলে এটাও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে বাংলাদেশে আর্যভাষী বনাম প্রাগার্যভাষীদের সভ্যতা সংস্কৃতির সংঘাত সমন্বয় গ্রহণ বর্জন যখন চলছিল তখন তাতে আর্যপর তিব্বত-ব্রহ্মীয় ভাষা-শাখার লোকদেরও একটা সবিশেষ ভূমিকা বর্তমান ছিল।[৩৫] সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন খ্রীষ্টাব্দ গণনার সময়েই আসাম, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার বৃহৎ বোড়ো জাতির মেচ কোচ কাছারি প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি বসতি স্থাপন করে।[৩৬] আর্য ও প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ভাষার মিলনে এতদঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিপুলভাবে পরিপুষ্ট হয়। ইন্দো-মঙ্গোলীয়রাই এ অঞ্চলের প্রধান জনগোষ্ঠী সুতরাং আর্য ভাষার মিলনের ফলে এখানে ভাষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা যায়। দশম শতাব্দীতে প্রাপ্ত উত্তরবাংলার একটি শিলালিপিতে বেশ কিছু তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় শব্দ দেখা যায়।[৩৭] এগুলি প্রধানতঃ স্থানে নাম এবং স্থান বিশেষের বিবরণ বাচক শব্দ। যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করা যাবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রণের ফলে দৈহিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু রাজবংশীরা আদিতে মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা তথা উত্তরবঙ্গের সমাজ জীবনের স্রোতধারায় যারা এসেছেন, তার মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা না বললেই নয়। সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এতদঞ্চলে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই সূত্রে নস্যশেখ জনগোষ্ঠীর বসবাস উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলাতে বেশ পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণের মতে নস্যশেখ মুসলিমদের উৎস রাজবংশী, কোচ ও পলিয়া। শুধু ধর্ম বিশ্বাস ছাড়া অন্যত্র এমন পার্থক্য নেই। J.F. Grunning ১৯১১ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন — 'The sheikhs and the Nashyas may be considered native to the district (Jalpaiguri), though a considerable number of them came originally from the adjoining districts of Rangpur and Dinajpur and from the Cooch Behar state. In appearence, dress and customs, they differ little from the Rajbansis.'[৩৮] এইসূত্রে তাই বলা যায় নস্যরা এখানকার ভূমিপুত্রও বটে। এখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী কোচ-রাজবংশীদের সমস্ত চিহ্নই

তাদের মধ্যে বিদ্যমান। Grunning সাহেবও উল্লেখ করেছেন - 'They were very much the sons of the soil.'[৩৯]

এবার দেখা যাক তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অর্থাৎ জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার জনবিন্যাস (২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী)।

মোট জনসংখ্যা	ঃ	৬৮৮০৩২৮ জন
পুরুষ	ঃ	৩০২৩২৩৯ জন
মহিলা	ঃ	৩৮৫৭০৮৯ জন
সাধারণ	ঃ	২৭৩৩৪৪৩ জন
পুরুষ	ঃ	১৪১২২৯০ জন
মহিলা	ঃ	১৩২১১৫৩ জন
তপশিলি জাতি	ঃ	২৪৯০৯৫১ জন
পুরুষ	ঃ	১২৭৯২৭৪ জন
মহিলা	ঃ	১২১১৬৭৭ জন
আদিবাসী	ঃ	৬৫৫৯৩৪ জন
পুরুষ	ঃ	৩৩১৬৭৫ জন
মহিলা	ঃ	৩২৪২৫৯ জন

কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত জনবিন্যাস (২০০১) —

কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত -

মোট জনসংখ্যা	ঃ	১৬৩১২৪৫ জন
সাধারণ	ঃ	৬০৩০৪৮ জন
তপশিলি	ঃ	৯২৬৭৮৯ জন
আদিবাসী	ঃ	১০১৪০৮ জন

কৃষি শ্রমিকের জনবিন্যাস —

মোট শ্রমিক	ঃ	১৩৩৩৩৫৮ জন
সাধারণ	ঃ	৫০৩৯৬৭ জন
তপশিলি	ঃ	৭৪৬৬২৭ জন
আদিবাসী	ঃ	৮২৭৬৪ জন

পশ্চিমবঙ্গে রাজবংশী সমাজের জনবিন্যাস (১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী) ঃ

প্রশাসনিক বিভাগ	মোট রাজবংশী	শতকরা
জলপাইগুড়ি বিভাগ	১০,২৭,৬৬৯ জন	৭৫.৯০
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	২,২৬,২৫০ জন	১৬.৭২
বর্ধমান বিভাগ	১,০০,০০০ জন	৭.৩৮

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের জনবিন্যাস (১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী) ঃ

জেলা	মোট রাজবংশী	শতকরা
কুচবিহার	৪,৮১,৩০৪ জন	৪৬.৮৪
জলপাইগুড়ি	৩,২৯,১৯১ জন	৩২.০৩
দার্জিলিং	৩১,৫০৫ জন	৩.০৬
পশ্চিম দিনাজপুর	১,৩৪,৯৭৬ জন	১৩.১৩
মালদহ	৫০,৬৯৩ জন	৪.৯৪

এখন দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গে ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুসারে রাজবংশী সমাজের জনবিন্যাস কিরূপ ঃ

প্রশাসনিক বিভাগ	মোট রাজবংশী	শতকরা
জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮,১৮,৬৪৭ জন	১৯.১৪
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	৩২,৩৯,৯৯২ জন	১.১০
বর্ধমান বিভাগ	৩৭,৪৭,৯৫ জন	১.০৩

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের জনবিন্যাস (২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী) ঃ

জেলা	মোট রাজবংশী	শতকরা
কুচবিহার	৯,৭২,৯২৮ জন	৩৯.২৪
জলপাইগুড়ি	৮,১১,৬২৭ জন	২৩.৮৬
দার্জিলিং	১,২৯,৯৭৯ জন	৮.০৭
দক্ষিণ দিনাজপুর	২,৯৪,৩৫৭ জন	১৯.৫৮
উত্তর দিনাজপুর	৪,৩৭,৯৬২ জন	১৭.৯৩
মালদহ	১,৭১,৭৯৪ জন	৫.২২

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের মোট রাজবংশী জনসংখ্যা (১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী) যেখানে ৮,১০,৪৯৫ জন, সেখানে ২০০১ সালে আদমসুমারি অনুসারে মোট জনসংখ্যা দাড়িয়েছে ১৭,৮৪,৫৫৫ জন। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ২২০ শতাংশ।

এবার আলোচনা করে দেখা যাক আমাদের প্রকল্পধৃত রাজবংশী সমাজের উৎপত্তি কথা। রাজবংশী বলে যে জনজাতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নেপাল, উত্তরপূর্ব ভারত, ভূটান ও বাংলাদেশে বাস করে তাদের পরিচয় কি? নেপালি? ভূটানি? আবার বাংলাদেশে কেউ কেউ এদেরকে আদিবাসী বলে। ভারতীয় সংবিধানের ভিতর থেকে এক এক রাজ্যে এক এক রকম সংরক্ষণের আওতায় পড়েছে। অসমের রাজবংশীরা MOBC[৪০] (More other Backward Class), বিহারে OBC পশ্চিমবঙ্গে SC আবার অসমে এক বছরের জন্য হয়েছিল ST, ইংরেজ গবেষকদের ভুল গবেষণার তথ্য দিয়ে এখনও কেউ কেউ এদেরকে বলতে চায় আর্যগোষ্ঠী, দ্রাবিড়গোষ্ঠী, Proto-Australoid ইত্যাদি। কিন্তু অনেক নৃ-তত্ত্ববিদ ও জাতিতত্ত্ববিদ (Ethnologist) রাজবংশী সমাজটাকে Indo-Mongoloid গোষ্ঠীর একটি শাখা বলে মনে করেছেন। অবশ্য আজকাল সমুদায় সমাজটাকে কোচ-রাজবংশী সমাজ বলে চিহ্নিত করা হয়। আর এই সূত্র ধরে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজবংশী সমাজে উৎসকথা বিচার করলে দেখা যায় রাজবংশী সমাজের আসল গোত্র পরিচয়ের উদ্ভব কথা।

জানা যায় চর্যাপদ লেখা হয়েছিল হিমালয় পর্বতের কোলে বসে। আর সেখানেই অন্যান্য ভাষার সঙ্গে রাজবংশী ভাষারও কিছু কিছু সূত্র পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও তন্ত্রবৌদ্ধকালে রাজবংশী সমাজও বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তার প্রমাণ তন্ত্রবৌদ্ধের নানা আচার অনুষ্ঠান এখনও এই সমাজে দেখা যায়। আবার জৈন ধর্মের প্রভাবের কথাও পণ্ডিতেরা কেউ কেউ বলে গেছেন। প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে চৈতন্য পন্থী বৈষ্ণবধর্ম পশ্চিমবঙ্গে আর অসমে শংকরীয় বৈষ্ণবধর্ম দেখা দিলেও চৈতন্যধর্মী বৈষ্ণবধর্ম রাজবংশী সমাজে দেখা যায় খুব হলে দু'শ বছর আগে। কিন্তু কোচ রাজা নরনারায়ণের কাল থেকে শঙ্করীয় বৈষ্ণব ধর্ম কিছুটা গ্রহণ করেছে। যা রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মাও বলে গেছেন।[৪১]

পণ্ডিতদের কথামতো যদি কামরূপ রাজা ভাস্কর বর্মার সময় থেকে কল্পিকরণ (Sanskritization) ধরে নিই তাহলেও ক্ষত্রিয় আন্দোলন রাজবংশী সমাজের জাতিসত্তা বা জনগোষ্ঠী নিয়ে উৎস সন্ধানে খুবই নাকাল হতে হয়। কেননা, কালে কালে রাজবংশী ও কোচরাজবংশী সমাজে মিশে যায় আরো নানা প্রজাতির মঙ্গোলিয়ান - অমঙ্গোলিয়ান জনজাতি। যার পরিচয় আজও উজ্জ্বল হয়ে দেখা যায়। এই সব জনজাতির ভিতরই লুকিয়ে আছে রাজবংশী

জনগোষ্ঠী ও জাতিসত্তা।

রাজবংশী সমাজে আর্যসংস্কৃতির মতো নানা বর্ণবিভাজন ছিল না। কিন্তু আর্যীকরণের ফলে গোত্র হারিয়ে সমাজটা অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। আর বৈষ্ণব সংস্কৃতির দ্বারা যখন প্রভাবিত হয় তখন সমাজে উদ্ভব ঘটে 'অধিকারী' পদবীধারী সমাজ। অসমে 'মেধী', 'ভকত' পদবীধারী সমাজ। কেউ কেউ পূর্বের পদবী ভুলে বৈষ্ণব ধারার পদবীই গ্রহণ করে। তার সঙ্গে চলতে থাকে শঙ্করীয় সংস্কৃতির প্রভাব যা 'শরণীয়াকরণ' নামে পরিচিত। কোচ রাজা বিশ্বসিংহের উত্তরকালে 'শরণীয়াকরণ' নিম্ন অসমের রাজবংশী সমাজকে খুব করে নাড়া দেয়। আর অন্যদিকে, অবিভক্ত গোয়ালপাড়ার খানিক অংশ উত্তরবঙ্গ, নেপাল, বিহার আর রংপুরে নাড়া দেয় ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলন। ড. স্বরাজ বসু বলেছেন — "to claim a kshatriya descent was an out come of Brahminical cultural domination, British lower caste policies and the social changes brought about by the colonial rule."[৪২]

অঞ্চলভেদে রাজবংশী পরিচয় ঃ

ভূগোল আর ইতিহাসের তাপে ও চাপে রাজবংশী সমাজ বঙ্গ অসমিয়া, নেপালি এবং বিহারীকরণ হলেও সামাজিক ভাবে (Social sub-group) এই অংশের লোকেরা নিজের মত করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। অঞ্চলভেদে এই সমাজকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[৪৩] যেমন —

১. ঝারুয়া রাজবংশী ঃ

ঝাড় অঞ্চলে বাস করে যে রাজবংশী সমাজ। কিন্তু এখন আর আগের মতন ঝাড় নেই, তাই ঝারুয়া রাজবংশী অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

২. ঘুলিয়া রাজবংশী ঃ

অসমের বিজনী রাজার ঘুলিয়া পরগণায় বাস করত এই রাজবংশী সমাজ।

৩. মরঙ্গীয়া সমাজ ঃ

পূর্ব নেপালের মরঙ্গ বা মরং পরগণা যা দার্জিলিং জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এতদঞ্চলে বসত করা রাজবংশী সমাজ মরঙ্গীয়া রাজবংশী সমাজ নামে পরিচিত। কোন কোন পণ্ডিত মরঙ্গীয়া সমাজকে একটি আলাদা নৃ-গোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেছেন।

৪. রংপুরীয়া রাজবংশী ঃ

রংপুর অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী মানুষের পরিচয় রংপুরীয়া রাজবংশী নামে। একসময় জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এবং অসমের অবিভক্ত গোয়ালপাড়া ছিল রংপুরের ভিতর।

৫. সূর্যাপুরীয়া রাজবংশী ঃ

বিহারের কিশানগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের ইসলামপুর মহকুমা সূর্যাপুর পরগণা নামে পরিচিত ছিল। সেখানকার বসবাসকারী রাজবংশী সমাজকে সূর্যাপুরীয়া রাজবংশী বলে চিহ্নিত করা হয়।

৬. চরুয়া রাজবংশী ঃ

চর অঞ্চলে বাস করা রাজবংশী সমাজকে চরুয়া রাজবংশী বলা হয়। এখনও ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে একটি চরের নাম রাজবংশী চর। পশ্চিম অসমের সাপটগ্রাম অঞ্চলে কিছু মানুষ চর অঞ্চল থেকে এসেছে বলে তাদেরকে চরুয়া রাজবংশী বলে চিহ্নিত করা হয়।

৭. ডখরিয়া রাজবংশী ঃ

অসমের বঙ্গাইগাঁও জেলার ডখরা পরগণায় বসবাসকারী রাজবংশী সমাজকে ডখরিয়া রাজবংশী বলা হয়।

৮. বারো হাজারি রাজবংশী সমাজ ঃ

অসমের বঙ্গাইগাঁও -এ খুটাঘাট পরগণার বসবাসকারী মানুষ, যারা রাজার সৈন্য ছিল তারাই বারো হাজারি রাজবংশী নামে পরিচিত।

নৃ-গোষ্ঠীগত দিক থেকে রাজবংশী জাতি ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে কালের ঘোরপ্যাঁচে ধীরে ধীরে রাজবংশী জাতিসত্তার সঙ্গে সংমিশ্রণ হয় বিভিন্ন মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর। যেমন — হাজং, জলদা, ধীমাল, থারু, রাভা, মেচ (বোড়ো)। এই মিশ্রণের চিহ্ন কোথাও কোথাও এখনো পাওয়া যায়। যেমন —

মদাসি রাজবংশী ঃ

পশ্চিম অসমে মঙ্গোলীয় জাতি গোষ্ঠীর একটি শাখা মদাসি (অসমিয়া উচ্চারণে মদাহি)

রাজবংশী। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলনের (১৯০১) পরে ১৯৬৫-৬৬ সালে বারোদলি কমিটি একসঙ্গে জমায়েত হয়ে ক্ষত্রিয় হয়ে রাজবংশী বলে চিহ্নিত হয়েছে।[৪৪]

ড. দীপককুমার রায় আরো যে সমস্ত রাজবংশী জাতির শিকড়ের সন্ধান দিয়েছেন তা এই রকম — হাজং রাজবংশী, জলদা রাজবংশী, দোভাষিয়া রাজবংশী, কোচকাহার বা কাহার রাজবংশী, দেশীয়া রাজবংশী, পলিয়া রাজবংশী, কোচ রাজবংশী, মেচ রাজবংশী। যাইহোক, এতসব বির্তকের মধ্যে না গিয়ে একথা বলা যায় যে, কালের বিবর্তনে মানুষের পরিবর্তন স্বাভাবিক। সেই পরিবর্তনশীলতার প্রবাহে আজকে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে আমরা যে সমাজের আলোচনায় ব্রতী হয়েছি তাকে শুধুমাত্র রাজবংশী সমাজ বলে চিহ্নিত করে আলোচনায় অগ্রসর হবো। কেননা, সরকারি দলিল দস্তাবেজে এই সমাজকে সমস্ত শ্রেণি নির্বিশেষে শুধুমাত্র রাজবংশী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘ) তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকার লোকায়ত জীবন ও লোকসংস্কৃতি ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকার অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর আগমন ঘটলেও এ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতির পরিসংখ্যানের হিসেবে প্রধান জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজ। তবে এখানকার লোকসংস্কৃতি এককথায় মিশ্র সংস্কৃতি। একদা ভূটানের অধিকারে থাকার ফলে এতদঞ্চলের সংস্কৃতিতে ভূটানের সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন স্থান নামের মধ্যে। যেমন — ভোটপাটি, ভোটপাড়া, ভোটের হাট, ভূটানির ঘাট, ভাটিবাড়ি, ভেটাগুড়ি ইত্যাদি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তবে ভূটানি সংস্কৃতির স্থায়ী ছাপ পড়লেও মূলতঃ রাজবংশী অধ্যুষিত এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে রাজবংশী কৃষ্টি সংস্কৃতি প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এখানকার আচার, নৃত্য, গীত, বাক্যে ও জীবন জীবিকায় নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক সমৃদ্ধির লক্ষণটি প্রাধান্য পেয়েছে। একদা বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষ কার্যকরী ছিল। ভূটানের দেবরাজ ও ধর্ম রাজারা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ। তবে উচ্চস্তরের ভূটিয়া প্রভাব এই সব অঞ্চলে আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চল তথা উত্তরবঙ্গ এমন একটি অঞ্চল যার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সমগ্র বাংলার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। বস্তুতপক্ষে, অখণ্ড বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতার পীঠস্থান হিসেবে এখানে যে সমস্ত জনপদ গড়ে উঠেছিল, তাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকালের ধারা বেয়ে আজও তা বিদ্যমান। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল যখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্লাবনে আলোড়িত, তখন তার রেশ উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনকেও আন্দোলিত করেছিল। এইসব অঞ্চলে যেমন প্রাক্ আর্যগোষ্ঠীর বাস ছিল তেমনি পরবর্তীকালে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম প্রভৃতি নানা ধর্মগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে। এখানকার সংস্কৃতি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। নানা দেবদেবী সৃষ্টি, দেবদেবীর পূজা, আচার প্রথা, মূর্তি নির্মাণ, শিল্প সৃষ্টি, ব্রত পার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠান গুলি এতদঞ্চলের এক মিশ্রিত ও মিলিত সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। রাজবংশী, কোচ, মেচ, গারো, রাভা, বোড়ো, পলিয়া প্রভৃতি এবং তার সঙ্গে পরবর্তীকালে ইংরেজ যুগে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অন্যান্য অধিবাসীদেরও বিপুল ভাবে আগমন ঘটে। যেমন সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষ এবং তারাও সঙ্গে করে নিয়ে আসে নিজস্ব রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি, ধর্ম-সংস্কার বিশ্বাস। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে অবাধ মিলন ও মিশ্রণের ফলে নানা সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

সুপ্রাচীন কাল থেকে এতদঞ্চলের উত্তরভাগে লেপচা-ভূটিয়া, সিকিমি, তিব্বতী নেপালিদের বসবাস। এই সব মানুষদের মধ্যে একমাত্র নেপালি ছাড়া আর সকলের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব কার্যকরী রয়েছে। পাল রাজাদের যুগে এই বৌদ্ধ প্রভাব খুবই বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া মহাযানীদের নানা তন্ত্রমন্ত্র

উপাসনা এখানকার লোকজীবনে খুবই প্রভাব বিস্তার করে। এই বৌদ্ধ সাধকেরা তান্ত্রিক বৌদ্ধ নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত লোকনাথ মূর্তির বিভিন্ন গঠন পার্থক্যই উত্তরবঙ্গের তান্ত্রিক বৌদ্ধচারের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। এইসব বিভিন্ন ধরনের শ্রীমূর্তি সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশেষ ভাবে জড়িয়ে আছে।[৪৫] অন্যদিকে কুচবিহার রাজ্যে কোচরাজাদের মধ্যে প্রথমে ছিল শৈবধর্মের প্রভাব এবং পরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার দেখা যায়। কাজেই বলা যায় সামাজিক নিরবিচ্ছিন্নতার এই ধারা চলেছে যুগের পর যুগ ও বংশানুক্রমে।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতির শিকড় জড়িয়ে আছে এখানকার জনজাতির জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এবং সারা বছর ধরে প্রচলিত বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, ব্রতকর্মকে ঘিরে। এই আচার অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম হল — গমিরা, বিষুয়া, চড়কপূজা, মেছেনি বা ভেদেই, গচিবুনা, ভোগা দেওয়া বা ডাকনী পূজা, চোরচুন্নি, গরুচুমানি, গোরখনাথ পূজা, নয়াখৈ, আষাঢ়ী, বাঁশখেলা, কাদোখেলা, বিশুয়া, আমাতি, বুড়া বুড়ি, গেরামঠাকুর, খেতিলক্ষ্মী, পুষনা, সোনারায় পূজা, ভাণ্ডানী পূজা, যাত্রা পূজা, হাইচাও খেলা, আষাঢ়ী মেলা, কাতিপূজা, জখাজখিনী, ঢ্যালঠাকুর, গছাদেওয়া, মৈপির পূজা, পাগলাপির, কৈপির পূজা ইত্যাদি। এছাড়া সারা বছরের কর্মব্যস্ত জীবন মূলতঃ কৃষি নির্ভর, এই সকল সাধারণ মানুষগুলো মনোরঞ্জনের জন্য দোতরাডাঙ্গা আসর, পালাটিয়া গান, কুশান, যাত্রা, মনোশিক্ষাগান ও এতদঞ্চলের প্রাণ মাতানো মনমজানো ভাওয়াইয়ার আসরের আয়োজন করে। D.H.E. Sunder সাহেব রাজবংশীদের বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর উল্লেখ করেছেন।[৪৬] শস্যের জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টির কামনায় বিষুব ঠাকুর, আগুনের হাত থেকে রক্ষার জন্য বর্মা ঠাকুর, ফসল রক্ষার জন্য বপনঠাকুর, দুর্ভিক্ষ ও দুর্বিপাকের হাত থেকে ফসল ও মানুষের রক্ষার্থে বসুমতী ঠাকুর, ফসল ও গবাদি পশু বৃদ্ধিতে এবং শিশুর কল্যাণের জন্য বিষহরি ঠাকুরাণী, কলেরার হাত থেকে বাঁচবার জন্য চণ্ডীঠাকুরাণী, ভয় ও ভীতির জন্য কালী ঠাকুরাণী, হিংস্র বন্য জন্তুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য মহাকাল ঠাকুর, এছাড়া গ্রাম ঠাকুর, শিব ঠাকুর, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, ধরম ঠাকুর প্রভৃতি পূজায় কথাও বলেছেন। রাজবংশীদের বিভিন্ন কুসংস্কারের কথাও শুনা যায়, যেমন - জন্মবার ও গুরুবারে বাঁশ কাটতে নেই, তাহলে বাঁশ বন মরে যায়। বাড়ির উত্তর ও পূর্বে তেঁতুল গাছ ও পশ্চিমে তাল গাছ লাগালে অমঙ্গল হয়। কালো বিড়াল ও কালো গাই সৌভাগ্যের প্রতীক। হলদে বিড়াল অমঙ্গল আনে। বসত বাটির ক্ষেত্রেও কিছু সংস্কার রয়েছে। 'পূর্বে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে গুয়া দক্ষিণে ধুয়া।' অর্থাৎ এই ছড়া অনুসারে বসত বাটি নির্মাণ করলে বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে বলে বিশ্বাস। বছরভর বিভিন্ন সময়ে কৃষিকাজের স্তরভেদে এইসব ব্রতানুষ্ঠানে সমাজ মনে দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করেছে।

অনাবৃষ্টিজনিত কারণে কৃষিকর্মের অসুবিধা দূর করতে হুদুমদ্যাও ঠাকুরের পূজো ও তার আনুষঙ্গিক ব্রতকর্মের সৃষ্টি হয়েছে। নদনদীর প্লাবনের প্রাবল্য যেমন মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর অসুবিধা সৃষ্টি করে, ফসলের প্রভূত ক্ষতির কারণ হয় তেমনি জমির উর্বরতা বৃদ্ধিরও সহায়ক হতে পারে। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের প্রচলিত নদীকেন্দ্রিক পূজা অনুষ্ঠানকে কৃষিকৃত্যের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

এতদঞ্চলের সমাজ জীবনে গোষ্ঠীচেতনা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এখানকার সমাজে একটি গ্রামে বিভিন্ন 'টারি' বা মহল্লা আজও দেখা যায় যা গোষ্ঠীবদ্ধ কৌমজীবনের প্রকাশ। যেমন, দেউনিয়াপাড়া, ফেচারটারি, গীদালপাড়া, বাবুপাড়া, কেরানিপাড়া, প্রধানপাড়া, ও কলোনিপাড়া এই সাতটি পাড়া নিয়ে গঠিত হয়েছে পূর্ব দুরামারি গ্রাম। আবার পূর্ব শালবাড়ি গ্রাম গঠিত হয়েছে খালপাড়া, হবিলেরটারি, চাঁদেরডাঙ্গা, কুমোরপাড়া, সূত্রধরপাড়া, বাজারপাড়া নিয়ে। এইরকম পাড়া সংস্কৃতি এতদঞ্চলের সমস্ত জায়গায় পরিলক্ষিত হয়। রাজবংশীদের মধ্যে সম্পন্ন গৃহস্থ যারা তাদের বাড়ি সাধারণতঃ নিজস্ব জমির উপর তৈরি হত। আসেপাশে আবাদী জমি দেখা শুনা এবং চাষ আবাদ করার সুবিধা ভোগ করার জন্য। জোতদার যারা তাদের বাড়ি অবশ্যই বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকত। বাড়ি সাধারণতঃ উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বমুখী হ'ত। বিশ্বাস পশ্চিমদুয়ারী বাড়ি নাকি সর্বনাশ। এ সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। বাড়ির সামনে সবারই একটা খোলান বা উঠান থাকত। এই উঠানে আবাদী ফসল মাড়াই করার জন্য তোলা হ'ত। এই জোতদার বাড়িকে ঘিরে কৃষক, শ্রমিক আধিয়াররা ঘর করে থাকত। এদেরও ঘরবাড়ির আদল একই রকম। শুধু অভাব ও দারিদ্র্যের ছাপ লক্ষ্য করা যেত, এখনও এই সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

এতদঞ্চলের জীবনযাত্রা গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আর এই গ্রামীণ জীবন মূলতঃ আদিম অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। নিগ্রোজাতীয় মানুষ, নিষাদ জাতীয় মানুষ, দ্রাবিড়ভাষী মানুষ এই ভাবে আমরা এসে পৌঁছই আর্য ভাষা মানুষে। স্রোতধারায়, যাঁরা এলেন রইল তাঁদের পদচিহ্ন। অবশ্য ভাঙনে জলোচ্ছ্বাসে ঝর্নাধারায় অনেককিছু হারিয়েও গেল। এই অঞ্চলের আদিম বনশ্রেণি, গতি পরিবর্তনশীল নদী ও বিভিন্ন জনজাতির প্রবল সংমিশ্রণ সঙ্গম বারবার নতুন করে গড়েছে এখানকার ভয়াল সুন্দর জনজীবনকে। তখন প্রকৃতিই একমাত্র নিয়তি। ফলে বলা যায় নিয়তি শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত সমাজে ধর্ম কর্ম ব্রতকথা থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

নেগ্রিটোদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার আজ আর কোন উপায় না থাকলেও একথা বলা যায় তাদের সাংস্কৃতিক স্পর্শ উত্তরবঙ্গের মাটিতে কোথাও না কোথাও

আজও সংগুপ্ত রয়েছে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, নেগ্রিটোদের কাছ থেকেই উত্তরবঙ্গের জাতি-জনজাতিরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে-বৃক্ষপূজা-প্রজনন ও উর্বরাশক্তির উপাসনা ইত্যাদি সংস্কৃতির আনয়ন ঘটিয়েছে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অনেক বিষয়ই অষ্ট্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত। এরাই প্রথম আমাদের দেশে প্রবর্তিত করেছে ধান ও গমের চাষ, এনেছে মৃৎপাত্র তৈরির কৌশল; লাউ-কুমড়ো-বেগুন প্রভৃতি সবজীর চাষ; আখ থেকে চিনি তৈরির কৌশল এরাই আবিষ্কার করেছে। এদের কাছ থেকেই আমাদের জীবনে এসেছে হলুদ ও সিঁদুরের ব্যবহার। এরাই আমাদের শিখিয়েছে হাতী পোষা, শিখিয়েছে সুতী আর সিল্কের কাপড় বোনার পদ্ধতি। কুড়ি কুড়ি গোনার রীতিও এসেছে অষ্ট্রিক-সংস্কৃতি থেকে। লোকজীবনে প্রচলিত নানাপ্রকার 'ট্যাবু' ও এসেছে অষ্ট্রিক জনজীবন থেকে।[৪৭]

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তন্ত্রমন্ত্র যেমন একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। তেমনি বৌদ্ধধর্ম ও তার প্রভাব এতদঞ্চলের সংস্কৃতি সত্তা গঠনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রধানতঃ লামাদের প্রভাবই ছিল এই ধর্মের প্রধান বিশেষত্ব। ভূত-প্রেত, কুসংস্কার, দৈত্য-দানব ইত্যাদি নিয়েই লামাদের কারবার। কবজ-তাবিজ দেওয়া, ব্যাধি দূর করার কাজ ইত্যাদি নানা অতিপ্রাকৃতের কারবারী ছিল এঁরা।[৪৮] তিস্তা ও তোর্ষাপারের লোকজীবনের নানা প্রবাহে এইসব মন্ত্র-তন্ত্র, তুক-তাক, অভিচারক্রিয়া-প্রক্রিয়াদির প্রভাব রয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। এই সমস্ত বৌদ্ধিক ধর্মজাত জাদুবিশ্বাস নিজস্ব সংস্কৃতির ফসলরূপে নানা পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠানে এতদ্‌অঞ্চলে দেখা যায়। নানা বিচিত্র ধরনের উৎসব, ধর্মীয় আচরণের অঙ্গরূপে ভয়াল মুখোশ, নৃত্য, লোকসঙ্গীত, মন্ত্র ইত্যাদির প্রভাব এখানে স্পষ্ট। এই লোকজীবনেরই ফসলরূপে নানা লোকসঙ্গীত ছড়া ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিকথা ও জনপদ নিয়ে বলার আগে সর্বাগ্রে আসে নদীর কথা। কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় নদী বিরাট ভূমিকা পালন করে। কৃষির সঙ্গে নদীর সম্পর্ক গভীর। আবার প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে এখানকার নদীগুলি হয় সরু, নাব্যতা থাকে কম। তবে প্রচণ্ড স্রোতধারী পাহাড়ী এই নদীগুলি বর্ষায় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে দুই তীরে অবস্থিত বিস্তীর্ণ জনপদকে প্লাবিত করে। আবার খরস্রোতা নদী সহসা তার গতিমুখ পরিবর্তন করে। (নিকট অতীতে হ্যালিমটন গঞ্জে বসতির উপর দিয়ে কালজানি নদীর গতিপথ পরিবর্তন এখানে স্মর্তব্য।) ফলস্বরূপ, ধূ ধূ বালুভূমি অন্যদিকে ভাঙন — এই দুরবস্থার মধ্যে চাষিকে পড়তে হয়। নদীবহুল এই অঞ্চলের জীবন ও জনবসতি ছিল অনিশ্চিত। একদিকে গভীর অরণ্যের ভয়াল ছায়া, অপরদিকে বান বন্যায় বিভীষিকাময় নিত্যপরিবর্তনশীল

নদী। এর মধ্যে ছোট ছোট সংসার, কৃষিক্ষেত্র ও পশুচারণ। তাই পরিণামে আসে গান, আসে দৈবনির্ভরতা এবং পূজা-পার্বণ এবং আসাটা খুবই স্বাভাবিক। লোক গানের সঙ্গে নদীর তুলনায় ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন — "প্রান্ত উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি এমনই যে নদীগুলি অপ্রশস্ত ও অগভীর হয়। কিন্তু সঙ্গে হয় খুবই খরস্রোতা যে কারণেই নদীগুলি খুব ঘন ঘন, হঠাৎ বাঁক নেয়। সেই Abruptness ধরা পড়ে 'গলাভাঙায়। নদীর এই হঠাৎ হঠাৎ বাঁক নেওয়া প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সাংস্কৃতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। জলধারা নিম্নগামী বলে স্বতই তা উত্তর থেকে দক্ষিণাভিমুখী হবে; কিন্তু স্বল্প স্থানের মধ্যে বাঁক নিলে জলধারা উত্তরাভিমুখী হবে - বিশেষ স্থানে। যেহেতু উত্তরাভিমুখী জল অস্বাভাবিক, সেইহেতু এই জলের উপর নানা যাদুগুণ আরোপিত হয়। বিশেষ বিশেষ কর্মানুষ্ঠানে সেই জলের ব্যবহার অপরিহার্য।"[৪৯]

শুধু কৃষিভিত্তিক সভ্যতাই নয়। বিশ্বের তাবড় তাবড় নগর সভ্যতাগুলিও গড়ে উঠেছে কোন না কোন নদীর পাশে। লণ্ডন, রোম, প্যারিস, নিউইর্য়ক, বাগদান, মিশর, দিল্লি, পাটনা, কোলকাতা ও আরো নানা নগর মহানগর। আমাদের আলোচ্য বিষয় জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার নদী অববাহিকায়, যেমন — তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি, সংকোশ, গদাধর, ডুডুয়া, মানসাই, ধরলা প্রভৃতি নদীসমূহ লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে তার একটি ছক এখানে দেওয়া হল।

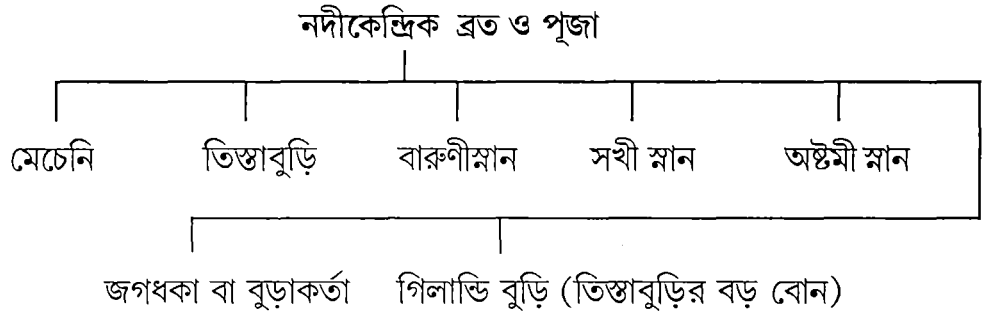

কথায় বলে, বাঙালীর বার মাসে তেরোপার্বণ। উত্তর বাংলার কৃষিজীবী জনপদের মধ্যেও পূজা উৎসবাদি কোন অংশে কম নেই। এর মূলে মুখ্যতঃ দুটি কারণ সক্রিয় বলে মনে করেন ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, তা হল — "প্রথমতঃ কৃষিকর্মের স্তরগুলিতে একটি হইতে অন্যটির মাঝখানে সাময়িক ভাবে একটি অবসর থাকে। এই অবকাশ যাপনের সুযোগ হইতে নানাবিধ দেবদেবী, পূজা-উৎসব সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদির কল্পনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কৃষিকর্মে প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা কাটাইবার উদ্দেশ্যে কৃষকের আদিম মানসিকতা স্বাভাবিক ভাবে জাদু নিয়ন্ত্রিত কৃত্যের আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছে। রাজবংশী সমাজের কৃষিকেন্দ্রিক অধিকাংশ পূজা উৎসবাদির মধ্যে জাদু বিশ্বাসের তীব্রতা লক্ষ্য করি।"[৫০] ড. রায়ের এই মত কৃষিকর্মে দৈবনির্ভরতা ধর্ম-কর্ম-ব্রত অনুষ্ঠান ইত্যাদিকেই সমর্থন করে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামঠাকুর তার নির্দিষ্ট স্থানে পূজা পেয়ে আসছেন। এতদঞ্চলের তার ব্যতিক্রম নেই। এখানকার গ্রামঠাকুর বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন ভাবে পূজা পেয়ে থাকেন। এই পূজা সাধারণতঃ কর্ষিত জমি বপণযোগ্য হলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের দিকে সম্পন্ন হয়। আবার গ্রামে রোগ ভোগ, বাও বাতাস, ব্যারামাদির থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যও এই গ্রামঠাকুরের পূজা নৈবেদ্য হয়ে থাকে। সুতরাং গ্রামঠাকুরের সঙ্গে লোকায়ত জীবনের যোগ খুব নিবিড়। আবার থানশ্রী বা 'থানছিরি' প্রত্যেকটি পরিবারে পরিলক্ষিত হয়। থানশ্রীর সঙ্গে কৃষির ঘনিষ্ঠতা বর্তমান। কেননা, আনুষ্ঠানিক ধান্য রোপণের পর শিষগুলি তার প্রতীক বংশদণ্ডে বেঁধে দেওয়া হয়। সুতরাং বাংলাদেশের পল্লীজীবনের কৃষির সঙ্গে যারা পরিচিত তারা জানেন 'মাঠে হাল চালনার প্রথমদিনে, বীজ ছড়ানোর, শালি ধান বুনবার, ফসল কাটবার বা ঘরে গোলায় তুলবার আগে নানা প্রকারের আচারানুষ্ঠান বাংলার নানা জায়গায় আজও প্রচলিত। এই প্রত্যেক অনুষ্ঠানই বিচিত্র শিল্প সুষমামণ্ডিত। জাতি বর্ণনির্বিশেষে সকলেই এইসব পূজানুষ্ঠানের অধিকারী, মূলতঃ নবান্ন উৎসব বা নতুন গাছের বা নতুন ঋতুর প্রথম ফল বা ফসলকে কেন্দ্র করে যেসব পূজানুষ্ঠান আমাদের মধ্যে প্রচলিত তারমূলেও একই চিত্তধর্মের একই বিশিষ্ট প্রকৃতি সক্রিয়। শুধু কৃষিজীবনকে কেন্দ্র করে নয় শিল্পজীবনেও দেখা যায় এক ধরনের ধর্মানুষ্ঠানের প্রচলন। কিন্তু মূলতঃ এই ধরনের পূজাচারে লোকায়ত সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোন প্রয়োজন পড়ে না। এতদঞ্চলের এইসব গ্রাম্য কৃষি ও কারুজীবনের পূজাচারকে কেন্দ্র করেই বাঙালীর ধর্মকর্ম জীবনের অনেক সৃষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ, শিল্পময় জীবনের অনেক মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য এইসব আচারানুষ্ঠানের অনেক আবহ ও উপাচার আমাদের ভদ্রস্তরের আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুসৃত হয়ে গেছে।

তিস্তা ও তোর্ষাপারের লোকায়ত জীবনে শিব বা শৈবধর্মও বিরাট ভূমিকা পালন করে। এতদঞ্চলের শৈবধাম হিসেবে পরিচিত জল্পেশ মন্দির, জটিলেশ্বর মন্দির, বাণেশ্বর মন্দির একথা প্রমাণ করে। এই অঞ্চলের শৈবধর্মই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অন্যত্র প্রসারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — "কোচ কৃষক সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈবধর্মের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীন সাহিত্যেও শিবকে কোচ রমণীদিগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাংলার সর্বত্র প্রচলিত লৌকিক শিবের ছড়ায় কোচ রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।

অতএব, মনে হয় কোচ জাতীয় কৃষকদিগের সমাজেই পৌরাণিক শিব সর্ব প্রথম আসিয়া প্রবেশ লাভ করে। অতঃপর সেখানেই তাহার চরিত্র স্থানীয় কোচদিগের সামাজিক জীবনের উপাদানে মিশ্রিত হইয়া একটি স্থানীয় ও লৌকিক ভাষা পরিগ্রহণ করে। কালক্রমে তাহাই বাংলার সর্বত্র প্রচার লাভ করে।"[৫১]

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে লোকভাষা ও লোকসাহিত্যের দানের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করা যায়। বোড়ো ও বরো সম্প্রদায়ের যে শাখাটি নেপাল থেকে মেচি নদী পেরিয়ে এ দেশের উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে অনেকে মনে করেন তাদেরই মুখে এ অঞ্চলের নাম বাংলা রূপে ভূষিত হয়েছে। সমীক্ষকদের বিশ্লেষণে দেখা যায়, বোড়ো ভাষায় 'হা-বাংলা' দ্বারা এ অঞ্চলটিকে তারা পরিচিত করেছিলেন। তাঁদের মতে 'হা-বাংলা' থেকেই বাংলা শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে।[৫২] বোড়ো ভাষায় 'হা' শব্দের অর্থ জমি বা স্থান। 'বাং' শব্দের অর্থ প্রচুর এবং 'লা' শব্দের অর্থ অধিকার করা। এই ভাবে শব্দটির ইংরেজিতে অর্থ দাঁড়ালো — "possess or occupy as much as you can as there is enough fertile land."[৫৩] মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন কৃষিজীবী এবং এতদ্ অর্থে কৃষি সম্পর্কিত কিছু কিছু শব্দ বড়ো ভাষা থেকে এসেছে বলে দাবি করা হয়। বোড়ো ভাষায় 'নাঙ্গল' (লাঙ্গল), 'লাষ্ঠি' (লাঠি), 'জুঙ্গল' (জোয়াল), 'যুসলি' (যোয়ালী), মই প্রভৃতি শব্দ এতদঞ্চলের মঙ্গোলয়েড নৃ-গোষ্ঠীয় উত্তরাধিকারকে জোরদার সমর্থন করে। চাষবাস, কর্ষণ, বীজবপণ, ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিরাট প্রভাব অধিকার করে আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এখন তিস্তা ও তোর্ষা পারের রাজবংশী সমাজ নাঙ্গল, জুঙ্গল (যোয়ালী) শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

ড. সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মনে করেন — "J.D. Auderson saw a strong 'Bodo' influence in the growth of Bengali language. He postulated that Bengali syntax and accentuation were influenced by 'Bodo' language." [৫৪]

উত্তরপূর্ব ভারতের মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে জল সম্পর্কিত নানাতর সাংস্কৃতিক প্রবাহ তথা জলবাচকতা হল নিজস্ব মিথ কথা তা তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলেও বিদ্যমান। জল উপাসনা বা নদী উপাসনা এতদঞ্চলের জীবন ধারার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। হয়তো সাংপো বা ডিহং অববাহিকা ধরে নদী পথে এই নৃ-গোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করেছিল বলে এই রূপ জল উপাসনা প্রাধান্য লাভ করেছে। বোড়ো ভাষায় জলবাচক শব্দ দৈ, ডিমাসা ভাষায় দি এবং যার রূপান্তরিত বা কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দ তি, তৈ, তোয় ইত্যাদি; যার উৎস দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কোন ভাষা এইমত ভারতীয় ভাষা বিজ্ঞানীদের।[৫৫] এতদঞ্চলের বিভিন্ন নদীর নামের মধ্যে তিব্বত

বর্মীভাষা পরিবারের মিল পরিলক্ষিত হয়।

তিস্তা ঃ

উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ নদী। লিম্বু ভাষায় তিস্তাকে বলা হয় তি-সা-থা, যার অর্থ তোমার সঙ্গে মিলিত হতে চাই। অর্থাৎ লেপচা লিম্বু লোককথা অনুসারে রঙ্গীত (নদী) মিলিত হতে চায় তিস্তা নদীর সঙ্গে। তিস্তা নদী তিস্তা বুড়ি দেবীতে পরিণত এবং তিস্তা বুড়িকে কেন্দ্র করে বৈশাখ মাসে রাজবংশী রমণীরা যে ব্রত পালন করে তা মেচেনি খেলা এবং ভেদেই খেলী নামে পরিচিত। তিস্তার 'তি' এবং ভেদেই খেলীর দেই (< দৈ) জলবাচক প্রত্ন শব্দ।[৫৬]

নিমতি ঃ

পূর্ণ শব্দটি হল নিমতি ঝোরা। এতদ্অঞ্চলের অন্যতম জলধারা। অনেকে মনে করেন 'ঝোরা' শব্দটি কানাড়া 'জরু' (অর্থ সরু জলধারা) থেকে বাংলায় গৃহীত। তবে নিম-তি ঝোরা শব্দে 'তি' জলবাচক।

ডায়না ঃ

এখানকার ফরেষ্ট, চা-বাগান এবং একটি নদীর নাম উৎস দৈ/দোই + না > দৈনা > ডায়না।

তোর্ষা ঃ

জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার অন্যতম নদী। তায়/তোরা + সা (বোড়ো ভাষায় সা অর্থ সন্তান) = জলের সন্তান।

ডুডুয়া ঃ

জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম নদী। উৎস দৈ + দুয়া > দৈদুয়া > ডুডুয়া। ' দৈ শব্দের মানে জল আর 'দুয়া' শব্দের অর্থ প্রবাহ অর্থাৎ ডুডুয়া শব্দের মানে দাঁড়ায় জলের প্রবাহ।

সুতরাং মঙ্গোলীয় ভাষা গোষ্ঠীর প্রভাব, শব্দব্যবহার আদর্শ, প্রথা এবং রীতিনীতির প্রভাব হিন্দু সংস্কৃতির মূলে লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — "The local Sakta,Saiva and Vaishnava development of Hinduism is Assam and Bengal, are due, partly atleast to the reaction of the early Mongoloides in

North Bihar and to the temperament of the newaries in Nepal and of Bodos,the Ahoms and the khasis in Bengal and Assam."[৫৭] বৈদিক সভ্যতার মহিষ বলি প্রথা প্রসঙ্গে আও-নাগাদের মিথান বা বুনো বাইসন বলি প্রথার কথা বিশেষ ভাবে এই প্রসঙ্গে উঠে আসে।[৫৮] উত্তরবাংলার কোন কোন অঞ্চলে এখনো যে বিচিত্র পদ্ধতিতে দেবতা প্রসাদ সাধন কল্পে পশু উপসর্গ প্রথার প্রচলন আছে, তা এইসব মানুষদেরই প্রভাব বলে মনে হয়।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকায়ত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এতদঞ্চলের লোকজীবনের আদিম ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার প্রক্রিয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। আদিম জীবনাচরণের ক্ষেত্রে ভগবানের প্রাথমিক ধারণা ছিল 'Dynamism' বা 'Power' সম্পর্কিত ধারণা। অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস ও তার প্রসাদার্থে পূজার্চনা ইত্যাদি। তিস্তা ও তোর্ষাপারের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তাই নদী, বন, পাথর ও বৃক্ষপূজা ইত্যাদির অস্তিত্ব দেখা যায়। রাজবংশী মেচ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঘ-কুমীর প্রভৃতি পূজাও দেখা যায়। উত্তরবাংলার বেশিরভাগ নদীই তিস্তা-তোর্ষা, সংকোশ প্রভৃতিকে দেবী বা দেবতারূপে পূজা করা হয়। হিংস্র ও ক্ষতিকর পশুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য সোনারায়ের পূজা করে থাকে। মনসা, মহাকাল যেমন পূজা পান, তেমনি পূজা পান গাছও। মেচ সম্প্রদায়ের বাঠৌ নামে পূজিত দেবতা আসলে সীজবৃক্ষ। তেমনি মইনাও রূপে পূজিত শক্তির প্রতীক লক্ষ্মীদেবী আসলে মৃত্তিকা দেবীর উপর স্থাপিত অলংকৃত বাঁশ। রাজবংশী সমাজের সন্ন্যাসী পূজা, বিষহরি পূজা, ধরমঠাকুর পূজা, মদনকাম পূজা, মেচেনি খেলা অনুষ্ঠান এবং নানা আনুষ্ঠানিক পূজা প্রচার প্রথা ইন্দো-মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির দান। "লোকায়ত বিশ্বাস "every tree is a sort of emblem of life".[৫৯] সুতরাং বৃক্ষকে সন্তুষ্ট করার প্রথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বৃক্ষপূজা নানাভাবে এতদঞ্চলে প্রচলিত। বাঁশখেলা উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের এই রকমই এক পূজা বিশেষ।

ড. নীহাররঞ্জন রায় মঙ্গোলীয় প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন — কোচ, পলিয়া রাজবংশী প্রভৃতি লোকেদের ভিতর ইহার একটি ধারা প্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়োছে। .... ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাধৃত ধারাটির একটি প্রবাহ ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশে আসিয়া ঢুকিয়া পড়ে, এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এই ভাবেই খানিকটা মঙ্গোলীয় প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।[৬০]

এই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিই মূলতঃ উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি রূপে পরিচিত। অবশ্য এর সঙ্গে প্রাক্ আর্য কোল, ভীল, মুণ্ডা, পুলিন্দ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ও মিশ্রণ আছে, তবে উত্তরবঙ্গের লোকসমাজে রাজবংশী কোচ, মেচ, গারো, রাভা, পলিয়া প্রভৃতি প্রভাবেই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বৃক্ষ, পাথর ফুল, ফল, পাহাড়, নদী, পশু, পক্ষী, কিংবা বিশেষ স্থানে পূজা

এগুলি প্রাক্ অর্থ লোকজীবনেই বিশিষ্ট সংস্কৃতি। আধিবাসীদের কৃষি ও বিশেষ প্রজনন শক্তির পূজা, বিশেষ বিশেষ টোটেম ও ট্যাবো, গুহ্য জাদু শক্তির পূজা, আরো নানা সামাজিক প্রথা স্ত্রী আচার ব্রত ইত্যাদি আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিহার ছোটনাগপুর, রাঁচী প্রভৃতি নানা অঞ্চল থেকে নানা শ্রেণির আদিবাসী উত্তরবঙ্গে আসেন। কোচ, মেচ, গারো, রাভা, দেশি, পলিয়া, টোটো প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বাস করতে থাকেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ প্রভৃতি নানা শ্রেণির আদিবাসি। তারাও নিজস্ব আচার-বিশ্বাস, রীতি-প্রথা অনুষ্ঠান সঙ্গে করে আনেন, সেই সঙ্গে নিজস্ব ছড়া, লোকগান, লোককথা, প্রবাদ ইত্যাদি ইংরেজ আমলে চা-বাগান ও আনুষঙ্গিক কলে-কারখানায় কাজ করার জন্যও আদিবাসী এসেছিলেন। কালক্রমে তাঁরা উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীরূপে পরিগণিত হয়ে গেছেন। জীবনের সূচনা থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠান রীতি প্রথা ইত্যাদির মধ্যে লোকজীবনের বিচিত্র সংস্কৃতির পরিচয় ছড়ানো আছে। ছড়া, প্রবাদ, লোকগান, ধাঁধা, লোককথা, ব্রত অনুষ্ঠান, মন্ত্র-তন্ত্র, নানা উৎসব অনুষ্ঠানগুলির আচার পদ্ধতির মধ্য থেকে সেই সংস্কৃতির অনুসন্ধান সম্ভব।

তথ্যসূত্র ঃ

১. দত্ত, সব্যসাচী - উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ৭ই অক্টোবর, ২০০৭।

২. দাস, সুকুমার - উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, ১৯৮২, পৃ. ১৫।

৩. দাস, সুকুমার - উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, ১৯৮২, পৃ. ১৬।

৪. ঐ, - পৃ. ১৮।

৫. ঐ, - পৃ. ১৮।

৬. ঐ, - পৃ. ১৯।

৭. ঐ, - পৃ. ২৭-২৮।

৮. রায়, নীহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃ. ৩৪।

৯. কর, অরবিন্দ (সম্পাদক) - কিরাত ভূমি, শীত সংখ্যা, ২০১০, পৃ. ৬৮।

১০. ঐ, - পৃ. ৬৭।

১১. West Bengal District Gazzetteers, Jalpaiguri, 1981, p.1.

১২. কর, অরবিন্দ (সম্পাদক) - কিরাত ভূমি, শীত সংখ্যা, ২০১০, পৃ. ৬৮।

১৩. ঐ, - পৃ. ৬৯।

১৪. Sunyal, Dr. Charu Chandra - The Meches and the Totes two sub-Himalayan Tribes of North Bengal, 1973, p. 1.

১৫. West Bengal District Gazzetteers, Jalpaiguri, 1981, p. 48.

১৬. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদিত) - মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ. ২৩।

১৭. পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ২০০৬, পৃ. ৩৬।

১৮. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদিত) - মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ. ৩১।

১৯. ঐ, - পৃ. ৩৩।

২০. ঐ, - পৃ. ৩২।

২১. West Bengal District Gazzetteers, Jalpaiguri, 1981, p. 36.

২২. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদিত) - মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ. ৩৬।

২৩. পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ২০০৬, পৃ. ৪৩।

২৪. ঐ, - পৃ. ৪৩।

২৫. ঐ, - পৃ. ৪৩।

২৬. ঐ, - পৃ. ৪৩।

২৭. রায়, ড. দীপককুমার (সম্পাদক) - 'স্মরণিকা' ২১তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা ও উত্তরবঙ্গ মেলা ২০১০, পৃ. ২৩।

২৮. সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত) - ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৮৭।

২৯. Hunter, W. W. - Statistical Account of Bengal, Vol - X, p. 402.

৩০. Risely, H. H. - The Tribes and Caste of Bengal, Vol - I, p. 491.

৩১. সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত) - ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৮০।

৩২. ঐ, - ৮০।

৩৩. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতি পূজা-পার্বণ, ভূমিকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৯।

৩৪. রায়, নীহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃ. ২৪।

৩৫. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতি পূজা-পার্বণ, ভূমিকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৯।

৩৬. Chatterjee, Dr. S. K. - The Origin and Development of Bengali language, Part - I, p. 69.

৩৭. সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত) - ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৮১।

৩৮. Grunning, J. F. - Eastern Bengal & Assam District Gazetters, Jalpaiguri, 1911, Reprint - 2008, p.46.

৩৯. ঐ, - পৃ. ৪৫।

৪০. People of India Assam, 2003, Anthropological Survey of India, Calcutta, p. 695.

৪১. রায়, ড. নিখিলেশ (সম্পাদিত) - ডেগর, ২০০৬, 'রাজবংশী সমাজের গোড়াশির কাথা ঃ ড. দীপককুমার রায়', পৃ. ৬৫।

৪২. Basu, Dr. Swaraj - Dynamics of a caste movements - The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947, New Delhi-64, 2003, p. 65.

৪৩. রায়, ড. নিখিলেশ (সম্পাদিত) - ডেগর, ২০০৬, 'রাজবংশী সমাজের গোড়াশির কাথা ঃ ড. দীপককুমার রায়', পৃ. ৬৬।

৪৪. ঐ, - পৃ. ৬৮।

৪৫. ভট্টাচার্য, শ্রীসুশীলকুমার - উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৭।

৪৬. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদক) - মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, ডি. এইচ. ই. সান্ডারের প্রতিবেদন, ড. পবিত্রকুমার গুপ্ত, পৃ. ৯৫।

৪৭. দাস, সুকুমার - উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, ১৯৮২, পৃ. ১৭।

৪৮. সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত) - ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৮৫।

৪৯. ভৌমিক, ড. নির্মলেন্দু - ভাওয়াইয়া গানের কথা, ২০১০, পৃ. ১৮১।

৫০. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতি পূজা-পার্বণ, ভূমিকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৭।

৫১. ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ - বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ১০৪।

৫২. সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত) - ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৭৯।

৫৩. সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত) - ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৭৯।

৫৪. Chatterji, Sunity Kr. - The Origin and Development of the Bengali language, 1926, reprint, 1986, Part - I, p.70.

৫৫. ভট্টাচার্য, ড. দেবাশিস - তরস্বী, ২০০৭, 'তি, তৈ, দৈ ইত্যাদি ঃ জলবাচক প্রত্নশব্দ ও প্রত্যয় - একটি সমীক্ষা ঃ ড. দীপককুমার রায়, পৃ. ৩৮।

৫৬. ঐ, - পৃ. ৩৯।

৫৭. Chatterji, Dr.S. K. - Kirat-Jana-Kriti, 1951, reprint-1998, p. 53.

৫৮. সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত) - ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৭৯।

৫৯. ঐ, - পৃ. ৭৮।

৬০. রায়, নীহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ২০০১, পৃ. ৩৪।

_____ ****_____

দ্বিতীয় অধ্যায়
কৃষিজীবন ও কৃষি সংস্কৃতি

ক) সভ্যতার অগ্রগতিতে কৃষি ও উর্বরতাতন্ত্র ঃ

লুইস হেনরি মর্গানের পরিভাষা অনুসারে সভ্যতার স্তরে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত মানুষের অবস্থাকে মোটামুটি দুটি অংশে ভাগ করা যায়।

১) বন্যদশা, ২) বর্বরদশা।

এই দুটি দশারই আবার স্তর বিভাগ রয়েছে ঃ নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ। অর্থাৎ মানুষ শুরু করেছে নিম্ন বন্যদশা থেকে, তারপর এগিয়ে এসেছে মধ্য বন্যদশায়, তারপর উচ্চ বন্যদশায়। তারপর মানুষ বন্যদশা ছেড়ে বর্বরদশায় উঠে এসেছে। বর্বরদশাতেও আবার তিনটি স্তর অর্থাৎ নিম্ন বর্বরদশা, মধ্য বর্বরদশা ও উচ্চ বর্বরদশা অতিক্রম করে সভ্যতার আওতায় এসে পড়েছে। তিনি আরও বলেছেন নিম্ন বন্যদশার মানুষের পরিচয় পাওয়া না গেলেও মধ্য বন্যদশায় এবং উচ্চ বন্যদশায় নানা দল বা জাতিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এর পরের স্তরে উচ্চ বর্বরদশার লোকের পরিচয়ও তিনি পেয়েছেন। এই উচ্চ বর্বরদশার আওতা পেরিয়েই সভ্যতার শুরু। তাই মর্গান সিদ্ধান্ত করেছেন — "Commencing, then, with the Australians and Polynesians, following with the American Indian tribes, and concluding with the Roman and Grecian, who afford the highest exam-plifications respectively of the six great stages of human progress, the sum of their united experiences may be supposed fairly to represent that of the human family from the Middle Status of savagery to the end of ancient civilization. Consequently, the Aryan nations will find the type of the condition of their remote ancestors, when in savagery, in that of the Australians and Polynesians; when in the Lower Status of barbarism in that of the partially village Indians of America; and when in the Middle Status, in that of the Village Indians, with which their own experience in the Upper Status directly connects. So essentially identical are the arts, institutions and mode of life in the same status, upon all the continents, that the archaic form of the principal domestic institutions of the Greeks and Romans must even now be sought in the corresponding institutions of the American aborigines, ... In studying the condition of tribes and nations in these several ethnical periods we are dealing, substantially, with the ancient history and condition of our own remote ancestors."[১]

অর্থাৎ মানুষের অগ্রগতির ছ'টি প্রধান স্তরের প্রকৃষ্টতম নির্দশন পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয় ও পলিনেসিয়দের থেকে শুরু করে আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের অনুসরণ করে রোমান ও গ্রীকদের কথায় শেষ করলে; এদের মিলিত অভিজ্ঞতাকে মধ্য-বন্য-দশা থেকে শুরু করে প্রাচীন সভ্যতার শেষ পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বলা যায়। অতএব আর্যজাতিগুলি তাদের সুদূর পূর্বপুরুষদের বন্য-দশার অবস্থাটা দেখতে পাবে অস্ট্রেলিয় ও পলিনেসিয়দের মধ্যে; নিম্ন-বর্বর-দশার অবস্থাটা দেখতে পাবে আমেরিকার আংশিকভাবে গ্রামবাসী রেড্-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে — এদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর্যজাতিগুলির উচ্চ-বর্বর-দশার অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। সমপর্যায়ের মানুষদের মধ্যে শিল্প, সমাজ-সংগঠন ও জীবন-যাপন পদ্ধতি সমস্ত মহাদেশের বেলাতেই এমন মৌলিকভাবে অভিন্ন যে, গ্রীক ও রোমানদের গার্হস্থ্য-ব্যবস্থার আদিম রূপটিকে এখনো খুঁজতে হবে আমেরিকার আদিবাসীদের অনুরূপ ব্যবস্থার মধ্যে[২]। নৃতত্ত্বমূলক এই বিভিন্ন পর্যায়গুলিতে যে-সব বিভিন্ন জাতি-উপজাতি রয়েছে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীন ইতিহাস এবং অবস্থার কথাও জানতে পারি।

লুইস হেনরি মর্গানের সূত্র ধরেই আমরা উর্বরতাতন্ত্র ও কৃষি লোকায়ত সমাজে কতদূর প্রোথিত এবং কীভাবে বর্তমান সমাজে তার প্রতীকী ব্যঞ্জনা বহন করে চলেছে তা বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব।

কৃষিকাজ যে মেয়েদের আবিষ্কারের এবং একান্তভাবে মেয়েদের হাতেই কৃষিবিদ্যার বিকাশ ঘটেছে তা স্বীকার করেছেন অনেকেই।[৩] অর্থাৎ শিকারজীবী পর্যায়ের আগে পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদন বলে কিছু ছিল না। তার বদলে ছিলো বীজ, ফল, ছোটো জানোয়ার সংগ্রহ। অতএব, তখন শ্রমবিভাগ বলেও কিছু ছিলো না। কিন্তু বল্লম আবিষ্কারের ফলে শিকার হলো পুরুষের কাজ। তখনো মেয়েরা আগের মতোই খাদ্য আহরণের কাজ করতে লাগলো। এই যৌন-শ্রম বিভাগ শিকারজীবী ট্রাইবদের মধ্যে সার্বভৌম ঘটনা; কেননা, এর কারণ হল গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানের সময়টায় মেয়েদের পক্ষে আপেক্ষিক ভাবে ঘোরাফেরা করবার ক্ষমতা কম থাকে। শিকার থেকেই মানুষ পশুপালন শিখলো। শিকার জীবনের পরে যখন পশুপালন এলো তখন গৃহপালিত পশু তাকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিল। জানোয়ারটাকে মেরে ফেলবার বদলে ঘরে ধরে আনা এবং বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হতে লাগলো। ফলে পশুপালন প্রায় সর্বত্রই পুরুষদের কাজে পরিণত হল। অপরপক্ষে, মহিলারা খাদ্য-আহরণের চেষ্টায় বস্তির আশেপাশের ছোটোছোটো জমিতে বীজ পোঁতবার কাজের দিকে মন দিল। অতএব, যে বাগানক্ষেত (garden tillage) কৃষিবিদ্যার আদিক্ষেত্র তাই হল মেয়েদের কাজ।[৪] এই সময়কালে গোষ্ঠীর সন্তান সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং দৈহিক মিলন নিয়মিত হতে থাকে। আর কৃষির আবিষ্কারের ফলে জীবন হয় অনেক নিশ্চিন্ত। খরা কিংবা অতিবর্ষণ কৃষিকর্মে মানুষকে মাঝে মাঝে অসুবিধায় ফেলত কিন্তু তা দীর্ঘকালের যন্ত্রণা হয়ে থাকত না। কিন্তু যৌন ভাবনার যুগান্তর এনেছিল আগুনের আবিষ্কার। আর আগুনের আবিষ্কার কৃষির আবিষ্কারের সময় কালেই ঘটেছিল।[৫] তারপর জানোয়ার

জোতা, লাঙ্গল ব্যবহার শুরু হওয়া থেকে কৃষিকাজ এলো মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে। আফ্রিকায় কোথাও কোথাও সম্প্রতিকালে লাঙ্গলের প্রচলন শুরু হয়েছে, যেখানে আজকের দিনে এই পরিবর্তনটি প্রত্যক্ষভাবে ঘটতে দেখা যায়।[৬]

উর্বরতা কী, এ বিষয়ে বলতে গেলে এককথায় বলতে হয় সৃষ্টিতত্ত্ব অর্থাৎ সন্তান সন্ততির মাধ্যমে নিজের সম্প্রসারিত রূপটি দেখাতে চাওয়া। আবার অন্যদিকে, ফসল সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। 'সন্তান' শব্দটি বিশ্লেষিত করলে তার অর্থও তাই। মানুষ সম্যক ভাবে 'তান' অর্থাৎ বিস্তারিত করে নিজেকে যার মধ্যে, সে-ই সন্তান। আহার্য গ্রহণ করে বাঁচা আর বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিস্তারিত বিবর্ধিত হওয়া।[৭] আর এই সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে উর্বরতার ভাবনা মানুষের চেতনে অবচেতনে সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই ছিল। কেননা ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন খোদাই করা আদিম মূর্তিগুলি ছিল নারীমূর্তি যা কখনো উলঙ্গ, অর্ধনগ্ন, কখনো বা আসন্ন সন্তান প্রসবা মাতৃমূর্তি। অর্থাৎ এখানে বলার কথা হল, নারীর কোনো মোহময়ী বা 'সঞ্চারিণী পল্লবিনীর লতার ন্যায় সৌন্দর্যময়ী' রূপ নয়। ফলদায়িনী-উর্বরামূর্তিই প্রথমে তার চোখে পড়েছিল। উর্বরতার প্রতিশব্দ হিসেবে ইংরেজিতে গৃহীত হয়েছে Fertility, অপরদিকে Fertilisation হল নিষেক প্রক্রিয়ার নির্দেশক। শুক্রানু ও ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় এবং এই ক্রমবর্ধিত ভ্রূণই নতুন শিশুর জন্ম সম্ভব করে তোলে। সুতরাং উর্বরতাতন্ত্রের মূলে কামনা, তা ফসলই হোক বা সন্তান-সন্ততি। তার জন্য চাই উপযুক্ত অনুকূল পরিবেশ। চাই আলো-জল। আলো পাই সূর্য থেকে আর সূর্য পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির উৎস। অন্যদিকে জল পাই নদী থেকে তাই নদীকে বলা হয় মাতা, আবার শিশুর পুষ্টি মাতৃস্তন্যে, তাই নদী ও মাতা সমার্থক। নদী জলে পুষ্ট উর্বরজমি যেমন জীবন বিকাশে সহায়ক তেমনি মাতৃ বা মাতৃদুগ্ধ শিশু বিকাশে সহায়ক। কাজেই নদী এবং নারী উর্বরাতন্ত্রের মূল কথা, যা সমগ্র বিশ্বে নানা ভাবে নন্দিত হয়ে এসেছে বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন ভাবে।

সমগ্র বিশ্বে উর্বরতাবাদ ও প্রজননের দেবতা নারীরূপে কল্পিত হয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষ উর্বরতা কামনা করেছে ভূমি এবং নারীর কাছ থেকে। অধিক ফসলাকাঙ্ক্ষায় ভূমির উর্বরতার জন্য চেয়েছে জল আর বংশবৃদ্ধির জন্য নারীর কাছে চেয়েছে সন্তান। সৃষ্টির রহস্য জানা আছে যেমন ধরিত্রীর তেমনি নারীর। তাই ধরিত্রীর শস্য সম্ভব ক্ষেত্র এবং সন্তান সম্ভব নারীদেহ সমার্থক হয়ে ধরা দিয়েছে অতীত প্রাচীন কাল থেকেই।[৮]

ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন — ''জন্মদানের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা থাকলেও মানব সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে নারীর ভূমিকা ছিল স্বাভাবিক স্বীকৃত। কেননা তাঁর মাতৃত্বমূলক কাজের ক্ষেত্রে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। তার পুরুষ-সঙ্গীর ভূমিকা গৌণ, কেননা, জন্মদানের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বের উপলব্ধি ঘটতে সময় লেগেছিল অনেক কাল। আদিম সমাজে পিতৃত্বের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা ছিল। তাই নারীই ছিল জীবনদাত্রী, তার মাতৃত্বমূলক অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ সমূহ জীবনদায়িকী শক্তির প্রতীক হিসাবে সর্বত্রই গড়ে উঠেছিল।"[৯]

আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল অশ্লীল কথাবার্তা ও যৌনক্রিয়া জমির উর্বরতা ও ফসলের ফলন বাড়ায়। সে মনে করতো এ সবে জাদুশক্তি আছে। সেই জন্য শস্য বোনার আগে সস্ত্রীক ক্ষেতে গিয়ে যৌনক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতো। কোথাও কোথাও এই যৌনক্রিয়াদি শস্য বপন উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করত।[১০] সাধারণতঃ জাদুক্রিয়ার অঙ্গ ছিল মন্ত্র-তন্ত্র। নানা রকমের অঙ্গভঙ্গি ও নাচ এবং যাদু উদ্দিষ্টের কোনও প্রতীক ব্যবহার। বর্বর মানুষের কাছে নাচের বড় আদর ছিল। নানারকম অঙ্গ ভঙ্গী করে নাচাকে সে প্রধান জাদুক্রিয়া মনে করতো। এই নাচ গোষ্ঠী সুদ্ধ সবার সমবেত নাচ। রোদ, বৃষ্টি বা হাওয়ার দরকার হলে সবাই মিলে নেচে দিত সূর্য নাচ বা বায়ু নাচ বা বৃষ্টি নাচ। সে বিশ্বাস করতো এতেই বাঞ্ছিত ফল মিলবে। পাশাপাশি রক্ত বা রক্তবর্ণ এই প্রতীকটিও বিশেষ তাৎপর্যময়। রক্তবর্ণ বা রক্ত সুপ্রাচীন কাল থেকেই উর্বরতার প্রতীক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। এ বিষয়ে সন্দীপকুমার সোমের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'ঋতুমতী নারীর রজোদর্শনই প্রাণজন্মের প্রথম শর্ত কারণ অ-ঋতুমতী নারীর পক্ষে গর্ভধারণ সম্ভব নয়। মানুষ আদিমযুগে দেখেছে, বন্যপ্রাণী ও মানুষ কিংবা দু'দল মানুষের সংঘর্ষের পরিণামে কিছু মানুষ বা পশুর দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে রক্তবর্ণ উষ্ণ তরলের ধারা। আবার রজোদর্শনের পর নারীর মধ্যে পুরুষ সঙ্গীটিকে কাছে পাওয়ার আকুল কামনা জাগে এবং তার দেহ মিলনের পরিণামে কিছুকাল পরে নারী এক থেকে দুই হয়ে যায় - তার দেহ থেকে জন্ম নেয় সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ক্ষুদ্র আরেক মানব বা মানবী। কাজেই রক্তের আবিষ্কার ও আনুষঙ্গিক ঘটনায় একে সহজেই মানুষ উর্বরতাবাদের সঙ্গে যুক্ত করেছে।'[১১] তাই পশুবলি বা নরবলি দিয়ে ভূমিকে উর্বর করার প্রচেষ্টা আমরা বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে দেখতে পাই। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ড. নির্মল কুমার বসু 'হিন্দু সমাজের গড়ন' গ্রন্থে লিখেছেন — ''উড়িষ্যার দক্ষিণ ভাগে কন্দজাতির মধ্যে কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত মেরিয়া নামক নরবলির প্রচলন ছিল। ... ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য একজন মানুষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার মাংস ক্ষেতের মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়ার রীতি ছিল। কোনো কোনো গ্রামে আবার সেই ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে দগ্ধ করিয়া ছাইগুলি মাঠে বা যে নদী হইতে সেচ দেওয়া হইত সেই নদীর জলে মিশানো হইত। মানুষটিকে বলি দেওয়ার পরদিন তাহার মাথা এবং দেহের অবশিষ্ট অংশ ও অস্থি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া একটি জীবন্ত ভেড়ার সঙ্গে একত্র দগ্ধ করা হইত। এই দিনের ছাই মাঠে ছড়ানো হইত অথবা জলে গুলিয়া ঘরে বা শস্যের গোলায় শস্য রক্ষা হইবে এই আশায় লেপিয়া দেওয়া হইত।"[১২] সুতরাং একথা সহজেই বলা যেতে পারে যে লাল বর্ণ বা রক্তবর্ণ বা ঐ জাতীয় রং যেমন সিঁদুর ইত্যাদি উর্বরতা তন্ত্রের আদিমরূপ যা আজও তার স্মৃতি বহন করে চলেছে। সুতরাং আমরা এরূপ ভাবনা কিভাবে লোকায়ত সমাজের ক্রমবিবর্তনে রূপান্তরিত হয়েছে তার একটা ছক এভাবে দেখাতে পারি —

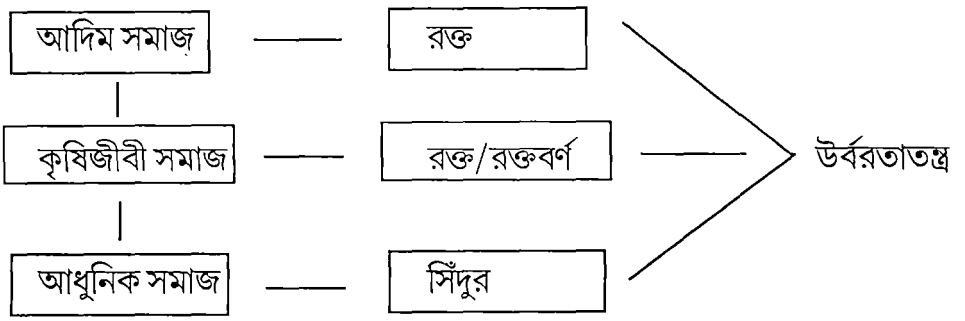

উপনিষদের ঋষি মৈথুনকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের উপায় মনে করত না। সেই সঙ্গে ধন উৎপাদনের উপায় বলেও বর্ণনা করেছেন। আর এই ধারণার জন্য মিথুনকে খুবই জরুরী বলে মনে করা হয়েছে। তাদের ধারণায় ধন সম্পদ উৎপাদন ও সন্তান উৎপাদন দুই-এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।[১৩] পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল পরগণায় দেখা যায় এমন একটি উৎসব যার সঙ্গে চাষাবাদের উন্নতির সম্পর্ক আছে। সাঁওতালদের মধ্যে এ উৎসবে লক্ষ্য করা যায়, "শুরুতে গ্রামের মোড়ল গ্রামের সবাইকে ডেকে একটি বক্তৃতায় বলে, মৈথুন ব্যাপারে যা কিছু করতে পারো। কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি নারীকে স্পর্শ করা চলবে না, তাছাড়া মনের সুখে মজা করো। উত্তরে গ্রামের সবাই বলে যে, তারা কানের মধ্যে বারো গোলা তুলো পুরছে - কোনো দিকে নজর দেবে না, কিছু শুনবে না, কিছুই দেখবে না - কিছুই নয়। এ উৎসব ওদের পক্ষে এক কলঙ্কময়।"[১৪] সাঁওতালদের মধ্যে এই উৎসব পৌষমাসে হয় কিন্তু মজার ব্যাপার হল উৎসবটার নামের সঙ্গে আষাঢ় মাসের যোগ আছে। কেননা, আগে তাদের কাছে আউশই ছিল প্রধান ফসল। বর্ষার সেই ফসল উপলক্ষে তাদের উৎসবটা ছিল বর্ষাকালে। পরে, আমন বা হেঁউতি ফসল ফলাতে শিখে উৎসবটা বর্ষার বদলে হেমন্তকালে চলে এসেছে। আসলে, ফসলের এই সময়টায় ওরা অনুভব করে নিজেদের মধ্যে বীজের ভার। জমিতে বীজ ছড়ানো আর নারীর মধ্যে সন্তানের বীজ স্থাপন করা দুটো সমার্থক।[১৫] এ বিষয়ে স্যার জেমস্ ফ্রেজার বলেছেন — "...the profligacy which notoriously attended these ceremonies was at one time not an accidental excess but an essential part of the rites, and that in the opinion of those who performed them the marriage of trees and plants could be fertile without the real union of the human sexes. At the present day it might perhaps be vain to look in civilized Europe for customs of this short observed for the explicit purpose of promoting the growth of vegetation. But ruder races in other parts of the world have consciously employed the intercourse of the sexes as a means to ensure the fruitfulness of the earth; and some rites which are still, or were till lately, kept up in Europe can reasonably explained only as stunted relics of a similar practice."[১৬] মধ্য আমেরিকার পিপিলে

আদিবাসীদের মধ্যেও একই রকম দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। বীজ বোনবার আগে পুরুষেরা চারদিন স্ত্রী-সংসর্গ করে না, যাতে বীজ বোনবার আগের রাতটিতে কামনাকে প্রচণ্ড ভাবে চরিতার্থ করা যায়। এমনকি যে মুহূর্তে জমিতে প্রথম বীজ বোনা হবে সেই মুহূর্তে মৈথুন করবার জন্যে কয়েকজনকে বিশেষ করে নিযুক্ত রাখা হয়। পুরোহিতদের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেককেই এই উপলক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য; এমনকি উক্ত অনুশাসন না মেনে বীজ বুনতে যাওয়াটাকে আইন গর্হিত মনে করা হয়।[১৭]

আবার অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির মানুষদের বিশ্বাস, সূর্য হল পুরুষ, ভূমি হল নারী। বর্ষাকালে সূর্য নাকি একবার নেমে আসে ধরণীকে গর্ভবতী করার জন্যে। আর পুরো পৃথিবী জুড়ে উৎপাদনের যখন এরকম মহোৎসব তখন মানুষেরাও মেতে উঠে ওই একই উৎসবে - নরনারীর অবাধ মিলনে। তাদের বিশ্বাস উৎসবটির উদ্দেশ্য হল পিতামহ সূর্যের কাছ থেকে বহুল পরিমাণে বৃষ্টি অন্ন, পশু ও প্রজা পাওয়া[১৮]। এ উৎসবটি তারা সযত্নে ও রীতিমতো ভক্তি ভরে সম্পন্ন করে। তাদের ধারণায় এরই উপর নির্ভর করছে জমির উর্বরতা আর মানুষের মঙ্গল।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি আগুন আবিষ্কার কৃষি যুগে হলেও তা ব্যবহারের তিনটি স্তর ছিল। প্রথমে তারা দাবানলে দগ্ধ পশুর মাংস খেয়ে অবাক হয়। দাবানলে তারা ভীত হত কিন্তু অপেক্ষা করে থাকত আবার কবে দাবানল হবে এবং পোড়ানো মাংস খেতে পাবে। দ্বিতীয় স্তরে তারা কোনো প্রাকৃতিক উৎস থেকে আগুন নিয়ে এসে সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে রাখত কিন্তু যাতে নিভে না যায় সে দিকে দৃষ্টি রাখত। কেননা, একবার নিভে গেলে সর্বনাশ। আর শেষ স্তরে তারা নিজেরাই আগুন জ্বালাবার কৌশল আবিষ্কার করে। এই শেষ স্তর মানে প্রস্তর যুগ, আর এই যুগ থেকেই মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটতে থাকে। বলাবাহুল্য, চিন্তা বিকশিত হয়ে যখন একটি নির্দিষ্ট ও সুসংহত রূপ পেল তখনই উর্বরতাকেন্দ্রিক ধারণার উৎসার ঘটল।[১৯] তারা বুঝতে শিখল শুধুমাত্র নারীর সন্তান হয়, মেয়ে পশুর বাচ্চা হয়। জলা জায়গায় ফসল হয়। পুরুষ মানুষ, পুরুষ পশু ও ডাঙ্গা জমির কোনো কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। চিন্তার এই প্রাথমিক স্তরে তারা ভাবতে পারেনি সন্তান উৎপাদনে পুরুষেরও সমান ভূমিকা আছে। দেহ মিলনের সঙ্গে সন্তান উৎপাদন ও জলের সঙ্গে ফসল উৎপাদনের সম্পর্কের হদিস সেই স্তরে অজানা ছিল। কিন্তু নারী ও জলা জমির বিষয়টি তাদের ভাবিয়ে তোলে কৃষির প্রাথমিক পর্যায়ে।

উত্তর আমেরিকার উড়ল্যাণ্ড এলাকার আবানিকা আদিবাসীদের লোকপুরাণে তাত্ত্বিক ভাবে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান যে কথা বলে তার সমস্ত তথ্যই তার মধ্যে রয়েছে। যে লোকবিশ্বাস নারী শরীরকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে তার অনন্য প্রকাশ ঘটেছে এই লোকপুরাণে —

"আমাদের প্রথম পিতা যে একা একা থাকত। এখানে ওখানে ঘন বনভূমি, অল্পদূরে তিরতিরিয়ে বয়ে যাওয়া নদী, উঁচু পাহাড়, পাহাড়ে অনেক গুহা, পাহাড়ি লতায় ঢাকা, আশে পাশে জলাভূমি

এসবের মধ্যে সেই একজন মানুষ। দীর্ঘ তার দেহ, মাথায় ঘনচুল, হাতপায়ের গড়ন পাহাড়ের পাথরের মতন। কথা বলার লোক নেই, তাই সে শুধু চেয়ে থাকে, অবাক হয়। সময় কেটে যায় কিন্তু সে বড় একা। আশে পাশে প্রকৃতি ছাড়া আর কেউ নেই। না, কেউ নেই।

সে আগুন জ্বালাতে জানে না। গাছের ফল, শেকড় কিংবা মাটির নীচের বাদাম খেয়ে বেঁচে থাকে। সবই কাঁচা খায়। রাতে বড় কষ্ট, চাঁদের আলো থাকলে ভাল লাগে, কিন্তু চাঁদ তো সবদিন আকাশে উঠে না। কেন যে ওঠে না? মাঝে মাছে রাতে বড় শীত করে। উপায় নেই, এভাবেই তার রাত কাটে, দিন কাটে, রাত পেরিয়ে দিন হয়।

তার দেহে কোন পোশাক নেই। পোশাক সে বানাতে জানে না। পোশাক যে পরতে হয় তা সে জানেই না। পোশাক বুনবেই বা কি করে? সে তো কিছুই শেখেনি।

সে মানুষ বড় ক্লান্ত। গাছের শেকড় খুঁজে খুঁজে সে ক্লান্ত। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বাদাম খুঁজতে খুঁজতে সে ক্লান্ত। অনেক উঁচু ডালের ফল আনতে আনতে সে ক্লান্ত। তার মনও ভাল নেই, বড় একঘেয়ে খাবার। নিত্যদিন কি এক জিনিস খেতে ভাল লাগে? তার অরুচি ধরে গেল। আর ভাল লাগে না। কয়েকদিন সে কিছুই খেল না। নরম রোদে শুধু শুয়ে থাকল। সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। আগে স্বপ্ন দেখত না। এখন চোখ খুলে সাদা আকাশের দিকে তাকিয়ে সে স্বপ্ন দেখে। মেঘ ভেসে যাচ্ছে, সেই ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে তাকিয়ে সে স্বপ্ন দেখে। উঁচু গাছের ডালপালা কেমন হাওয়ায় মাথা নাড়ছে, জলায় জলের ঢেউ খেলছে বাতাসের ছোঁয়ায় সেদিকে তাকিয়ে সে স্বপ্ন দেখে।

একদিন স্বপ্ন দেখছে। ক্লান্ত চোখের পাতা রয়েছে বন্ধ। চোখ মেলে সে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। চমকে উঠল। ভয় পেল। এরকম কিছুতো সে আগে কখনো দেখেনি। তার সামনেই সেই দেহ এবার কথা বলল। কী মিষ্টি যে তার কথা। সেই মানুষের ভয় ভাঙলো। মনে খুব আনন্দ হল।

সামনে দাঁড়িয়ে এক নারী। তার দেহ সোনালী রঙের, মাথার চুল রুপোলি, পিঠের ওপর ছড়ানো। ঠোঁট রয়েছে অল্প খোলা, সাদা মেঘের মতো দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। ছড়ানো বাদামের মতো সেই দাঁত, ঠোঁট দুটো জলে ভেজা। চোখ দুটিও যেন হাসছে। কী অপরূপ দেহ। তার দেহেও কোন পোশাক নেই। সেকি মেঘের রাজ্য থেকে নেমে এলো?

মানুষ এই প্রথম হাসল। হেসে তাকে কাছে ডাকল। মেয়ে কাছে এল না। মানুষটি এগিয়ে গেল। মেয়ে দূরে সরে গেল। তার পেছন দেখা যাচ্ছে, পিঠের ওপরে চুলের রাশি দুলছে। খিল্‌খিল্ হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আরও এগিয়ে গেল সে, মেয়ে আরও দূরে সরে গেল। মানুষটি যত এগোয়, মেয়েও তত দূরে চলে যায়। শেষকালে মেয়ে এল নদীর কাছে। অনেক দূর থেকে মানুষটি বলল, ওগো মেয়ে, তুমি যখন আমার কাছে এসেছ, আর দূরে চলে যেও না। আমি বড় একা, আমার কাছে কেউ নেই, কথা

বলার কেউ নেই, বড় কষ্ট আমার। কাছে থাকো দূরে যেও না।

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়ে বলল, বেশ আমি কোনদিন আর দূরে চলে যাব না। কিন্তু আমি তোমাকে যা যা করতে বলব, তোমাকে তাই করতে হবে। তুমি যদি আমার কথা শোন, আমি চিরকাল তোমার কাছে থাকব। কথা দাও।

মাথা নুইয়ে সায় দিল সেই পুরুষ। সোনালি মেয়ে মিষ্টি হেসে কাছে এগিয়ে এল। এসে তার হাত ধরল। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল। মানুষটি জীবনে এত আনন্দ পায়নি। তার মন ভরে গেল।

হাত ধরে এগিয়ে গেল সেই মেয়ে। নদীর ধার দিয়ে জলাভূমি পেরিয়ে এসে মেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এক খণ্ড জমির ওপরে। সেই জমিতে পড়ে রয়েছে অনেক শুক্‌নো ঘাস। রোদে পুড়ে খুব শুক্‌নো হয়ে রয়েছে সেই লম্বা লম্বা মোটা ঘাস।

মেয়ে নিচু হয়ে সবচেয়ে মোটা দুটো শুক্‌নো ঘাস তুলে দিল। পুরুষের হাতে ঘাস দুটি দিয়ে বলল, হাতের তালুর মধ্যে এ দুটো নাও। তালু দুটো চেপে খুব জোরে ঘষতে থাকো।

পুরুষটি তাই করল। কিন্তু কিছুই হল না। মেয়েটি তাকে দেখিয়ে দিল কীভাবে ঘষতে হবে। আরও জোরে, খুব তাড়াতাড়ি ঘষতে হবে। তুমি জোয়ান পুরুষ, গায়ে তোমার অসীম শক্তি। ঠিক পারবে।

এবারে জোরে জোরে ঘষতে ঘষতে ঘাস দুটোয় আগুন জ্বলে উঠল। হাতের তালুতে তাপ লাগছে, সে ঘাস ফেলে দিল। জ্বলে ওঠা ঘাস নীচে পড়ল, আশেপাশের শুক্‌নো ঘাসে দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠল।

পুরুষ ভয় পেয়ে দৌড়ে দূরে চলে গেল। সে কখনও আগুন দেখেনি। সে আগুন দেখেছে সূর্যের মধ্যে, ভরদুপুরে। কিন্তু সে তো দূরের আগুন। গায়ে আঁচ লাগে না।

আগুন নিভে গেল। গোটা মাঠে কালো শুকনো ছাই। মেয়ে এল পুরুষের পাশে। বলল, এই আগুন আর ছাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে। আমরা সুখী হব। এই জলা থেকে আঁজ্‌লা করে জল এনে জমিতে দাও। আমিও জল আনছি।

পুরুষ আঁজলা করে জল আনছে। জমিতে দিচ্ছে, আবার যাচ্ছে, মেয়ে জলায় চুল ভিজিয়ে নিচ্ছে, জমিতে এনে চুল নিঙড়ে জল ফেলছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। তারা একটা বড় ঘন গাছের ছায়ায় বসে রইল। মেয়ে কোনো কথা বলছে না।

গাছের ছায়া একদিকে বড় হচ্ছে। অনেক বড়। রোদের তেজ কমে এসেছে। দূরে আঁধার, আঁধার দেখা যাচ্ছে। মেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আমি এই জমিতে শুয়ে পড়ছি, তুমি আমার চুল ধরে এই জমির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। জমির এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে। আমার দেহের ছোঁয়া যেন জমির সবখানে লাগে। আমার দেহের ছোঁয়ায় জমির চেহারা পালটে যাবে।

মেয়ে শুয়ে পড়ল। পুরুষ বলল, না, এ আমি পারব না। তোমার ব্যথা লাগবে, চুল ধরে টানলে ব্যথা করবে। দেহ জমির ওপর দিয়ে গেলে দেহ কেটে যাবে, রক্ত ঝরবে।

মেয়ে বলল, হয়তো একটু লাগবে, হয়তো রক্ত ঝরবে। কিন্তু উপায় নেই । বাঁচতে হলে এ কাজ করতে হবে। আমার দেহের ছোঁয়া ছাড়া জমি কোনো কথা শুনবে না। আমার দেহ সমস্ত জমিতে না গড়ালে জমি কিছুই দেবে না। কথা শোন, যে আনন্দ আমরা পাব তাতে দেহের ওই ব্যথা কিছুই নয়।

পুরুষ নেমে এল জমিতে। মেয়ের চুল গোছা করে ধরল। তার খুব কষ্ট হচ্ছে, তবু সে মেয়ের কথা শুনল। পুরুষ আস্তে করে টান দিল। কিন্তু মেয়ের দেহ বড়, বেশ ভারি। এত আস্তে টানলে চলবে না। এবার জোরে টান দিল। মেয়ের দেহ এগিয়ে আসছে। মেয়ের সোনালি দেহ কালো পোড়া ঘাস ও কাদায় অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। দেহে কালো কাদা, কালো জলের ছিটে। পুরুষ সমস্ত মাঠে মেয়ের দেহ নিয়ে ঘুরছে, এপাশ থেকে ওপাশে, ওপাশ থেকে এপাশে। জমিও কেমন যেন কাদামাটি হয়ে উঠছে। জমির চেহারা পাল্টে যাচ্ছে।

অনেক সময় কেটে গেল। এখন চারিদিকে অন্ধকার। তারা নদীতে গেল। দেহ পরিষ্কার করল। আবার মেয়ের সোনালি রঙ ফিরে এল। তারা গুহায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বড় ক্লান্তি, তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

দিন যায় রাত যায়। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে। বৃষ্টির দিন শেষ হয়ে গেল। রোজ মেয়ে জমিতে যায়, অনেকক্ষণ থাকে। পুরুষ তখন ফল আনে, শেকড় খোঁজে, বাদাম তোলে।

একদিন সকালে মেয়ে পুরুষের হাত ধরে জমির পাশে গেল। জমির দিকে তাকিয়ে পুরুষ অবাক হয়ে গেল। মেয়ে হাসছে।

সোনালি ফসলে জমি ভরে গিয়েছে। ফসলের ডগায় রুপোলি শীষ। মেয়ের সোনালি দেহের ছোঁয়ায় ফসলের রঙ হয়েছে সোনালি আর রুপোলি চুলের ছোঁয়ায় ফসলের শীর্ষ হয়েছে রুপোলি।

মেয়ে বলল, এই ফসল আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে। এই ফসল আমাদের সুখী করে তুলবে। আমাদের মিলনে যারা জন্মাবে, তারা এই ফসল খেয়েই বেঁচে থাকবে। এই এক জমি ফসল থেকে অনেক ফসল হবে। পাশের জমিতে, তার পাশের জমিতে, সব জায়গায়।"[২০]

নারীর দেহকে ঘিরে উর্বরতার ধারণা যে কত গভীর ও ব্যাপক তা এই দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এই নারী কৃষির সন্ধান জানে। জল, পোড়া ছাই, কাদা মাটি এবং জমি চষার কথা এই লোকপুরাণে রয়েছে। সেই সঙ্গে আদিম বিশ্বাস, নারী দেহের যে উর্বরতা আছে তা জমিতে সঞ্চারিত করতে হবে। নারীর দেহের মধ্যে এমন রহস্য আছে যার পরিণামে নারী সন্তানবতী হয়। ঠিক তেমনি জমিতেও সেই ক্ষমতা বিস্তৃত করতে হবে। এর সঙ্গে আবার নগ্ন নারীদেহেরও সম্পর্ক রয়েছে। নারীদেহের উর্বরতার সঙ্গে নগ্নতার সম্পর্ক খুব গভীর। নগ্ন নারীদেহ ঘিরে জাদু বিশ্বাসও খুব সক্রিয়।

কৃষি কাজে যখন লাঙ্গল দেওয়ার প্রথা চালু হল তখনও কিন্তু নগ্ন নারীদেহ ও জমির ফসলের উর্বরতার বিষয়টি বিলুপ্ত হয়নি। লোকবিশ্বাস ও লোকাচারে তার আমরা আভাস পাই। যেমন আফ্রিকা মহাদেশে ঘানার ক্রাচি আদিবাসীরা প্রথা হিসেবে পালন করে একধরনের আচার। বর্ষায় জমি চাষের উপযুক্ত হলে প্রথম লাঙ্গল দেওয়ার আগে দুইজন ঋতুমতী নারী জমিতে গিয়ে প্রথমে লাঙ্গল চালিয়ে কিছুটা জমি চাষ করে।[২১] নারী দেহের দুটি অঙ্গ মানুষের কাছে ছিল রহস্যময় ও বিস্ময়কর। নারীর স্তন ও জননেন্দ্রিয়ের কার্য কলাপ সম্বন্ধে তাদের ব্যাখা অজানা ছিল। নারীদেহ থেকে জন্ম নিচ্ছে সন্তান আর সন্তান জন্মের পর ঠিক পরেই তার বুক ভরে উঠছে দুধে। এই দুধ সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখে। আবার সন্তান কিছুটা বড় হলে বুকের দুধ উধাও। অন্য সময় বুকে দুধ থাকে না। স্বাভাবিক ভাবেই এই দুটি অঙ্গ ঘিরে রহস্য, বিশ্বাস ও জাদু বিশ্বাসের ধারণা গড়ে ওঠে।[২২] আবার অন্যদিকে নারীদেহ শুধু ফসল ফলাতেই সক্ষম নয়। সে বৃষ্টিও আনতে পারে। প্রবল খরায় যখন মাঠ ফুটিফাটা হয়ে যায় তখন ফসলের জমিতে ঋতুমতী নারীর উপস্থিতি ও বৃষ্টির আহ্বান সুফল ডেকে আনে। এটি আসলে একটি কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস। কেননা, "পশুপালনের তুলনায় জমি কোপানো, বীজ বোনা আর ফসল কাটার কাজ অনেক মন্থর,কঠিন, অনিশ্চিত। অতএব তার জন্যে দরকার ধৈর্য্য, দূরদৃষ্টি, বিশ্বাস। কৃষিভিত্তিক সমাজে তাই জাদু বিশ্বাসের অনেক ব্যাপক বিকাশ। কামনা আর কামনা-সফল হওয়ার মাঝখানে যে অনিশ্চয়তার ব্যবধান তা সবচেয়ে তীব্রভাবে অনভূত হয়েছে কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়েই। তাই এই পর্যায়েই কামনা-সফল হওয়ার কল্পনা দিয়ে ব্যবধানটিকে ভরাট করে তোলবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। নকলের সাহায্যে কামনা-সফল হওয়ার কল্পনাটিকে ফুটিয়ে তোলাই হল জাদু বিশ্বাসের প্রাণবস্তু। তাই কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়ে জাদু বিশ্বাসের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। ... বীজ থেকে শস্য কেন জন্মায় তা জানা নেই, জানা নেই মাটির রহস্য। কিংবা যদিও বা জানা থাকে তাও একান্ত অস্পষ্ট ও একান্ত প্রাথমিক ভাবেই। অপরপক্ষে মানুষ এ অবস্থায় যা চাইছে তা মানুষের চোখের সামনে নেই, তাকে চাওয়া আর তাকে পাওয়ার মধ্যে শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধান নয়, শুধু সুদীর্ঘ অবকাশ নয়, অনেক আর প্রায় অসম্ভব অনিশ্চয়তাও। এ কাজ তাই ঢের বেশি কঠিন, এ কাজের জন্য তাই মনের বল প্রয়োজন অনেক বেশি, মনের বিশ্বাসকে জাগিয়ে রাখবার জন্য দরকার নানান রকম আয়োজন।"[২৩] এই নানা রকম আয়োজনে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকায় কী ধরনের লোকসংস্কৃতি বিদ্যমান তা যথাস্থানে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। আবার প্রবল ঝড় যখন গোষ্ঠীর এলাকাকে তছনছ করে দেয় তখন পুষ্ট বুকের নারীরা যদি বাড়ির সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ঝড় অন্যদিকে ঘুরে যায় বলে আদিবাসী গোষ্ঠীর জাদু বিশ্বাস।[২৪]

সভ্যতার উষালগ্নে আদিম চেতনার এক ধরনের সহজ সরল ভাবনা ছিল, যার মূলে শুধুই উর্বরতার ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে। নারীদেহ, নগ্নতা, গর্ভাবস্থা, নারীর কেশ এবং নারীত্ব উন্মেষের ঋতুকালীন ভাবনা বিষয়ে সহজ অভিব্যক্তি রয়েছে। যৌন ভাবনা তখনও নেহাতই বিস্ময় ও

জাদু বিশ্বাসের স্তরে আটকে থেকেছে। এর পরবর্তী কালে জনগোষ্ঠী অনেক সংহত হয়েছে। পরিবারের ধারণা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার জন্মেছে। জমির উর্বরতা বিষয়ে জ্ঞান প্রসারিত হয়েছে; শুধুমাত্র বৃষ্টির জলের উপরে তারা নির্ভর করছে না। নদী-পুকুর থেকে জল এনে কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, বীজ সংরক্ষণ করতে শিখেছে। গৃহপালিত পশুসম্পদ বেড়েছে। অস্ত্র এবং শস্ত্র অনেক উন্নত হয়েছে। যৌন ভাবনায়ও বিবর্তন ঘটেছে এই সময় কালে। যৌন ভাবনা আবর্তিত হল শুধুমাত্র নর-নারীর দৈহিক মিলনকে কেন্দ্র করে। এই স্তরে জন্ম রহস্যে পুরুষের ভূমিকাও জানা হয়ে গিয়েছে। আর দেহগত মিলন ও আনন্দ যখন প্রাধান্য পায় তখন আদিম বিস্ময় ও সরলতাও ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। যৌন ক্রিয়ায় দুটি দেহের দুটি অঙ্গ সক্রিয় এই ভাবনা এক ধরনের স্থূলতার জন্ম দিল। শুধুমাত্র এই ধারণা অতি প্রাধান্য পাওয়াতে উর্বরতার বিষয়েও পুরনো চিন্তা বিসর্জিত হল।[২৫] বর্তমানে পুরনো যেসব বিশ্বাস রয়েছে চিন্তার সারল্যে তা শুধুমাত্র আচার অনুষ্ঠানে লক্ষিত হয়। যা শুধুমাত্র লৌকিক বিশ্বাসজাত ঐতিহ্য।

যে সমস্ত উপকরণ এসব আচার অনুষ্ঠানে নির্বাচন করা হয় সেগুলি গাছের পাতা কিংবা বড় ফুলের পাপড়ি, ত্রিভুজাকৃতি কোন পাত্র এবং গোল দণ্ড জাতীয় কিছু। প্রথমগুলি স্ত্রী অঙ্গ ও পরেরটি পুরুষাঙ্গের প্রতীক। আবার কখনো রং এর ব্যবহার উর্বরতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন মন্দির গাত্রে বা প্রাচীন ভাস্কর্যে মিথুন মূর্তির আধিক্য যৌন-ক্রিয়ার প্রতীককে স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার এই সব মূর্তির পাশে ফুল, ফল, লতাপাতা, ত্রিভুজ, সর্প ইত্যাদি চিত্রে যৌন ভাবনা রয়েছে তা বাস্তব জীবন ও চিন্তার প্রতিফলন বলেই ধারণা করা যায়। অন্যদিকে বিভিন্ন লোকাচারে বিশেষ করে আনন্দ উৎসবে যৌন ভাবনা বা প্রজননতন্ত্র বা Fertility Cult যে প্রকাশিত হয়েছে, নানাভাবে পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনজাতির মধ্যে এই প্রতীক ভাবনা থেকেই তা সুস্পষ্ট।

আমাদের প্রকল্পধৃত তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে লোকাচারে উর্বরতাতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে কী কী উপকরণ বহুল ভাবে ব্যবহৃত হয় তার একটি তালিকা তুলে ধরা হল —

১. পান,	২. সুপারি,	৩. সিঁদুর,	৪. কড়ি,
৫. কলা,	৬. ঘট,	৭. ধান,	৮. দূর্বা,
৯. আম্রপল্লব,	১০, মাছ,	১১, খই,	১২, কুলো,
১৩, আলতা,	১৪, ডিম,	১৫. ফুল,	১৬. শোলা এবং
১৭. ডাব ইত্যাদি।			

কিছু ফল লোকাচারে ব্যবহৃত হয়। কিছু যেমন, সুপারি, কলা, ডাব। প্রতি গাছে এসব ফল একসঙ্গে অনেক ফলে। এখন মানুষের চিন্তার প্রতিফলন যা কামনায় ধরা পড়েছে তা হল এই সব

ফলের মতো গোষ্ঠীর সম্পদও যেন প্রচুর হয়। আবার ডাব গর্ভবতী নারীর প্রতীক হিসেবে যেমন কল্পনা করা হয় তেমনি কলা পুরুষাঙ্গের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।

শুভ কাজে মাছ দেওয়া হয়। একটি মাছের অগুনতি ডিম আর ডিমে থাকে অসংখ্য পোনা।

পান পাতা, পদ্মের পাপড়ি, জবাফুলের পাপড়ি, লাল মাটি, সিঁদুর শুভ কাজে দিতে হয়। এসবই স্ত্রী জননেন্দ্রিয় ও ঋতুমতী নারীর প্রতীক।[২৬]

লোকায়ত সমাজের প্রকৃতিগত আচরণ ও সামাজিক বিন্যাস বিশ্লেষণ করে এবং আচার অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত গুলি বিশ্লেষণ করলে মানুষের যৌন ভাবনা, যৌন প্রতীক তথা উর্বরতাতন্ত্রকে সহজেই অনুভব করা যায়। যা যৌন ক্রিয়ার আচরণ মূলক জাদু বিশ্বাসের ইঙ্গিত বহন করে।

অপরদিকে দেহগত মিলনের স্থূল চিন্তা ও তার অতি প্রকটরূপও দেখতে পাই। রুদ্র বা শিব যে কৃষির দেবতা তাতে তাকে বলা হয়েছে 'অন্নানাং পতিঃ' অর্থাৎ অন্নসমূহের অধীশ্বর এবং 'ক্ষেত্রানাং পতিঃ' অর্থাৎ ক্ষেত্র সমূহের অধীশ্বর। এই অন্নানাংপতিই পরবর্তীকালে অন্নপূর্ণাপতি শিবে রূপান্তরিত হয়েছেন। অন্য এক জায়গায় রুদ্রকে উর্বর বা উর্বরভূমিতে জাত ধান্যাদিতে বর্তমান বলা হয়েছে।[২৭] শৈব প্রতীকগুলি বিশ্লেষণ করলেও শিবকে কৃষির দেবতা হিসেবে ধরা যায়। শিবের বাহন বৃষভ। বৃষভ শব্দটি কৃষির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বৃষ আবার প্রজননের প্রতীক। এই প্রজনন সন্তান উৎপাদন ও শস্য উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। শিবের অন্যতম ভূষণ সাপ। এই সাপও প্রজননের, কাজেই কৃষির প্রতীক। অন্যদিকে শিবের প্রধানতম প্রতীক লিঙ্গ। উত্তরবঙ্গের শিবমন্দিরগুলিতে শিবের কোনো মূর্তি থাকে না, পরিবর্তে গৌরী পাঠের উপর স্থাপিত লিঙ্গের পূজা হয়ে থাকে। লিঙ্গ কেবলমাত্র যৌনায়নের রূপ নয়, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ। কেননা 'লিঙ্গ' ও 'লাঙ্গল' দুটি শব্দই অষ্ট্রিক এবং দু' এর মূল এক। আদিম যুগে লিঙ্গের মতো এক ধরনের পাথরের অস্ত্রে মাটি খোঁড়া ও কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত হত। অনেকে শস্য বৃদ্ধির আসায় ক্ষেতে লিঙ্গ পুঁতে দিত। এবং বলাবাহুল্য লাঙ্গল লিঙ্গ শব্দ জাত।[২৮] কাজেই তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে শৈবধাম ও শৈব সংস্কৃতি দেখে শিবকে সহজেই কৃষি দেবতা রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন জল্পেশ্বর, জটিলেশ্বর, নীলেশ্বর, সর্বেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, বাণেশ্বর সুপ্রসিদ্ধ। এছাড়া মহাকাল, সন্ন্যাসী, ধূমবাবা, যখাঠাকুর, মাশান, বুড়াঠাকুর প্রভৃতি নামে শিবই পূজিত হয়ে আসছে।[২৯]

ধরিত্রীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও দেবী মনে করেছে। কারণ উর্বরতা, উৎপাদন এ সবকে সে নারীর সঙ্গে যুক্ত কল্পনা করত।[৩০] লক্ষ্মী যে কৃষির দেবতা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেবীকে বলা হয়েছে করীষিনী। করীষ অর্থ শুষ্ক গোময়। কাজেই করীষিনী অর্থ যার অধিকারে গোবর রয়েছে অর্থাৎ যিনি গবাদি বহু পশু সমৃদ্ধা।[৩১] এই জন্য অনেক জায়গায় দেখা যায় শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজায় শুধু নারীরই অধিকার। রোমকরা মাইয়া দেবীকে 'বোনা দিয়া'ও (Bona Dea) বলত। এই দেবীও উর্বরতার দেবী। তাঁর পূজোয় শুধু নারীরই অধিকার ছিল। রাজপুতানায় যে

অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা হয় তার পূজারিণীও শুধু নারী।[৩২] তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে এমন অনেক পূজানুষ্ঠান হয় যার পূজারিণী শুধু নারী। সুতরাং কৃষির আদিমতম ধারণা কিভাবে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে তা চিত্র নং ১ এবং কৃষিকে কেন্দ্র করে কি ধরনের সংস্কৃতি এতদঞ্চলের বহমান চিত্র নং ২ -এ দেখানো যেতে পারে।

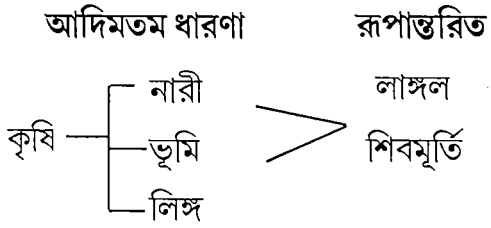

চিত্র নং - ১

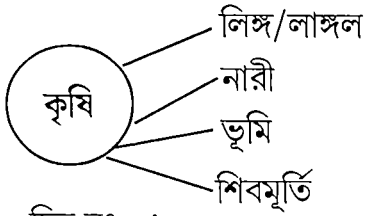

চিত্র নং - ২

অপরদিকে উর্বরাতন্ত্র প্রতীক হিসেবে প্রচলিত পূজানুষ্ঠান, তার সময়কাল, প্রতীক এবং ব্যঞ্জনাসহ নিম্নে আলোচনা করা যেতে পারে।

পূজানুষ্ঠান/ ব্রতানুষ্ঠান	কাল	প্রতীক	ব্যঞ্জনা
হুদুমদেও	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	কলাগাছ, বংশ দণ্ড, নারীর নগ্ন দেহ	বংশ বৃদ্ধি, উর্বরতাতন্ত্র।
গচিবুনা	আষাঢ়	কাঁকড়া, দূর্বা ঘাস	বংশবৃদ্ধি, উর্বরতাতন্ত্র, বেঁচে থাকার লড়াই।
তিস্তাবুড়ি	বৈশাখ	সিঁদুর, দূর্বা, কচু	উৎপাদন, বংশবৃদ্ধি, উর্বরতাতন্ত্র।
বুড়াবুড়ি	অগ্রহায়ণ	দোন, বালক/বালিকা পান, সুপারি।	প্রজননতন্ত্র, শস্য কামনা

পূজানুষ্ঠান/ ব্রতানুষ্ঠান	কাল	প্রতীক	ব্যঞ্জনা
শিবঠাকুর	ফাল্গুন মাস	লিঙ্গ, বৃষ	প্রজনন, উর্বরতা
মদনকাম	ফাল্গুন	বাঁশ, লাল নিশান	বংশবৃদ্ধি, সন্তান কামনা, উর্বরতাতন্ত্র।
গোরক্ষনাথ/ গোন্নাথ	পৌষ	বাঁশ, পান, সুপারি, সিঁদুর	বংশবৃদ্ধি, ফসল কামনা
পুষুণা	পৌষ	তিল, পান-সুপারি	বংশবৃদ্ধি বা প্রজনন
ক্ষেতিলক্ষ্মী/ ডাকলক্ষ্মী	অগ্রহায়ণ	ফুলসহ ধান গাছ	শস্য কামনা
যাত্রা পূজা	আশ্বিন	লাঙ্গল, সিঁদুর, পান, সুপারি	ধান উৎপাদন, সন্তান কামনা সমৃদ্ধি
ভাণ্ডানী পূজা	আশ্বিন	দূর্বা, বেলপাতা	ধান উৎপাদন, সন্তান উৎপাদন
কালী ঠাকুরাণী	কার্তিক মাস অমাবস্যা রাত্রি	নারকেল বা ডাব	মাতৃ শক্তি, উর্বরা শক্তি সৃষ্টি শক্তি, রক্ষা শক্তি
ব্যাঙের বিয়াও	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	সিঁদুর, দূর্বা, স্ত্রী ও পুরুষ ব্যাঙ পান সুপারি	জল কামনা, ফসল কামনা, অর্থাৎ উৎপাদনাত্মক জাদু-বিশ্বাস
মাশান	ভাদ্র	কলা, দূর্বা, কলমী শাক, পান	সন্তান কামনা রোগ ব্যাধি দূরীকরণ। উর্বরতাতন্ত্র
কাদোখেলা	ফাল্গুন	ডাব	গর্ভবতী নারী, প্রজননতন্ত্র বা উর্বরতাতন্ত্র

পূজানুষ্ঠান/ ব্রতানুষ্ঠান	কাল	প্রতীক	ব্যঞ্জনা
আমাতি	আষাঢ়	খেজুর, কাঁচা দই	শস্যোৎপাদন, সন্তানোৎপাদন
মেছেনী ব্রত	বৈশাখ	খইবর্ষণ	বৃষ্টিকামনা
আষাঢ়ী পূজা	আষাঢ়	বিভিন্ন দেবতা	সন্তান কামনা, সমৃদ্ধি
যখা	ফাল্গুন	মৃন্ময় মূর্তি, সর্প, কলা	সম্পদ সংরক্ষণ ও ধনবৃদ্ধি
সুবচনি	—	ঘট, ধান, দূর্বা	কৃষির মঙ্গল কামনা
কাতিক ব্রত	কার্ত্তিক	মৃন্ময় মূর্তি, ঘট	সন্তান কামনা, ফসল কামনা
অথাই পাথাই	আষাঢ়	বাঁশের দণ্ডযুক্ত ছাতা, বিন্নাছোপ, সিঁদুর, কলা	সমৃদ্ধি
নয়াখৈ	অগ্রহায়ণ	—	ফসল কামনা

অপরদিকে, বৃক্ষপূজা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রচলিত দেখা যায়। কেননা, পৃথিবী যখন সম্পূর্ণ ভাবে বাসের উপযোগী হয়ে উঠেনি তখন আদিম পিতা মাতা গাছের উপরেই বাস করত। এই গাছ থেকেই ফলমূল, পোশাক, কাঠ সংগ্রহ করত। কাজেই কৃষিকর্ম শেখার পূর্বে এই গাছই ছিল মানুষের জীবন নির্বাহের একমাত্র উপায়। আবার এখনও গাছের সাহায্যেই মানুষ ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরি করেন। সুতরাং লোকসমাজে গাছের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে গাছের পাতা ও ডালপালা ভাঙার শব্দ মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলত। ফলে দেবতা অপদেবতার কুদৃষ্টি এড়ানোর জন্যই প্রাথমিক ভাবে বৃক্ষপূজার উৎপত্তি হয়েছিল।[৩৩] বিশ্ববিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ফ্রেজার সাহেব বৃক্ষপূজা সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন গাছ বৃষ্টি ও সূর্যকিরণের নিয়ামক, শস্যবৃদ্ধির সহায়ক, উর্বরতাবৃদ্ধিতে সহায়তাকারী তথা সুখ শান্তি দানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৩৪] বৃক্ষপূজার সঙ্গে আরেকটি বিষয় জড়িত থাকতে পারে তা হল গাছ-গাছন্ত ও লতাপাতা থেকে বিভিন্ন মূল্যবান ভেষজ তৈরি হয়ে থাকে যা মানুষের জীবন রক্ষা করে। আজও ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে

তুকতাক, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি আভিচারিক কর্মে গাছগাছড়ার ব্যবহার একথা প্রমাণিত করে।

বৃক্ষপূজা উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক এবং তা কেবলমাত্র শস্যাদির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি। ধন, জন, পুত্র কামনা, রোগ ব্যাধি নিবারণ প্রভৃতি পার্থিব ও অপার্থিব বাসনা পূরণের জন্য এই বৃক্ষ পূজা। তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে এ বিষয়ে কি ধরনের বৃক্ষপূজা প্রচলিত তা প্রতীক ও ব্যঞ্জনাসহ দেখানো হল —

পূজানুষ্ঠান/ ব্রতানুষ্ঠান	**কাল**	**প্রতীক**	**ব্যঞ্জনা**
জুড়াবান্ধা ঠাকুর	বছরের যে কোন সময়	গাছ	কৃষিপণ্যের সমৃদ্ধি, পথে নির্বিঘ্নে চলাচল
শালশিরি	ফাল্গুন-চৈত্র	শালগাছ, কলা, মোরগ	শস্য রক্ষা, বংশবৃদ্ধি
জিগাঠাকুর	বছরের যে কোন সময়	সধবা, ঋতুমতী নারী। পান, সুপারি, সিঁদুর	সন্তান কামনা, ফসল কামনা।
বট-পাকড়ির বিবাহ	বছরের যে কোন সময়	সিঁদুর, ধান, দূর্বা	উর্বরতাতন্ত্র, শস্য উৎপাদন,

শুধুমাত্র ব্রতানুষ্ঠান বা পূজানুষ্ঠানেই যে উর্বরতাবোধক ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায় তা নয়। এতদঞ্চলে বিভিন্ন লোকক্রীড়াতেও এই উর্বরতার বিষয়টি জড়িয়ে আছে তা কিছু লোকক্রীড়ার প্রতীক ও ব্যঞ্জনাসহ উল্লেখ করা হল —

লোকক্রীড়া	**প্রতীক**	**ব্যঞ্জনা**
ডাংগুলি	ডাং, গর্ত	উর্বরতা
কাদোখেলা	ডাব	বংশবৃদ্ধি
চিলা মাছ	চিল ও মাছের পরিবর্তে দুই দল কিশোর-কিশোরী	ধনবৃদ্ধি, উৎপাদন

লোকক্রীড়া	প্রতীক	ব্যঞ্জনা
মারবেল খেলা	গুটি, গর্ত	উর্বরতাতন্ত্র, সন্তানোৎপাদন
পাখি খেলা	পাখির পরিবর্তে কিশোর-কিশোরী	ফসল কামনা
কিত্‌কিত্‌ খেলা	ছকযুক্ত ভূখণ্ড	জমি দখলের লড়াই, ফসল-কামনা
বাঘ ছাগল	ছকযুক্ত কোট	জমি দখলের লড়াই, কৃষি
পুক্কি মোঞ্জা	ছকযুক্ত কোট	জমি দখলের লড়াই, কৃষি
ষোলঘরি	ছকযুক্ত কোট	জমি দখলের লড়াই, কৃষি
আতাপাতা	মাটির ওপর অঙ্কিত বৃত্ত	ধন কামনা
মাথা লাঠি	লাঠি	কৃষিকর্ম পদ্ধতি

সুতরাং উর্বরতাতন্ত্রের ধারণা আদিমকাল থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে বর্তমান তিস্তা ও তোর্ষা বিধৌত জনসমাজে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উৎসবে আজও পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। কাজেই কৃষি ও উর্বরতার ধারণা যে কতটা গভীর এবং ব্যাপকভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে তা এতদঞ্চলের ধর্ম কর্মানুষ্ঠানের দিকে তাকালে সহজেই অনুমান করা যায়।

———

খ) কৃষিজীবন ও সংস্কৃতি ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক পরিকাঠামো দাঁড়িয়ে আছে কৃষিকৃত্যের উপর। কৃষিকর্ম রাজবংশী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বৃহত্তম কর্মসংস্থান। কৃষি ব্যবস্থা সচল রাখতে বহু কর্মী ও বহুবিধ যন্ত্রপাতি নানারকম ভাবে নিয়োজিত হয়। হাল দেওয়া একটি বড় কাজ কিন্তু হাল দেওয়ার পিছনে বহুলোকের নানারকমের কাজ রয়েছে। তারা তাঁদের স্ব স্ব বৃত্তি সঠিক ভাবে পালন না করলে কৃষিকর্মে বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন ঘটে। প্রত্যেকে প্রত্যেক কাজে পারদর্শী হয় না, যারা যে কাজে পটু তাঁরা সেইসব কাজে নিয়োজিত থাকে বলেই কৃষিকাজের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।

রাজবংশী সমাজ মূলতঃ গ্রামীণ। গ্রামে বাস করতে গেলে কি অবস্থাপন্ন কি দরিদ্র সকল পরিবারকেই স্বাবলম্বী হতে গেলে চাষবাসের জন্য পশুপালন করতে হয়। যেমন হাল কিংবা যানবাহন অথবা দুধ বা সারের জন্য কয়েকটি গোপালন অবশ্যম্ভাবী। রাজবংশী সমাজে বহু প্রচলিত প্রবাদ —

"মারিয়া মাছ আর্জিয়া ভাত"।

অর্থাৎ মাছ খেতে গেলে মাছ মেরে খাও এবং ভাত খেতে হলে চাষবাস করে শস্য ফলিয়ে খাও। ছোটখাটো ডোবা-নালা, চৌকা, পুকুর ইত্যাদি তৈরি করে মাছ পোষার ব্যবস্থা হত। প্রাকৃতিকভাবে নদী-নালা-বিল ইত্যাদিতেও মাছ পাওয়া যায়। পরিবারের জন্য হাঁস-মুরগী-পায়রা পালন যেমন করে তেমনি আবার গরু বাছুর পালন করতে দড়ি পাকানো, কাঁচাবাড়ি তৈরির কলাকৌশল এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র দরকার হয়ে থাকে। এর সবটা নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

কৃষিকর্মে ও গ্রামীণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি ঃ

চাষের জন্য জমি প্রস্তুতিতে ব্যবহারিক যন্ত্রাদি ঃ

লাঙ্গল ঃ

লাঙ্গলকে এই অঞ্চলের লোকেরা বলে থাকে নাঙ্গল। কাঠ থেকে চাষের লাঙ্গল তৈরি হয়। গাছের বাঁকা ডালকে খোদাই করে লাঙ্গল তৈরি করা হয়। বাঁকানো অংশের যেদিক নীচের বা মাটির সঙ্গে থাকে সেদিকটা একটু চ্যাপ্টা ও সরু হয়। চ্যাপটা অংশটিতে অল্প খোদাই করে ফাল লাগানো হয়। উপরের দিকটিও সামান্য সরু করে বাঁশের 'খাওয়া' দিয়ে যুক্ত

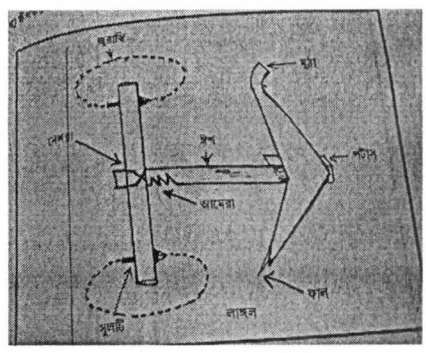

করা হয়। এটিকে 'বাসা' বলে। 'বাসা'র অংশটিতে ফুটো করে একটি বাঁশের ছোট হাতল লাগানো হয়। এটিকে 'মুটি', 'মুটিয়া' এবং কোথাও কোথাও 'ধুকুর' বা 'ধুকরী' বলা হয়। কাঠের মাঝখানে বাঁকানো অংশে ফুটো করে কোণাকুণি অংশে বাঁশ বা কাঠের ৫/৬ হাত লম্বা অংশ লাগানো হয়। এটি লাঙ্গল ও জোয়ালের সংযোগ সাধন করে এবং দু'পাশে গরুকে দাঁড়াবার জায়গা করে দেয়। এটিকে বলে ঈশ্। (ছবি দ্রষ্টব্য) এই লাঙ্গল নিয়ে এতদঞ্চলের লোকশিল্পী গান বেঁধেছেন।

"ও বাপই রে কারবা কথাত ডর
কোমরেতে গামছা বান্ধি হালের মুঠি ধর বাপইরে
জোর করিয়া হাল বুয়াও রে বাপই
জমিত ফলাও ধান
আসিবে কত কইন্যার খবর বাড়িবে কত মান বাপইরে।"

কিংবা

"মুই হাল বুয়াং রে ভ্যাকরা নাঙ্গল দিয়া
হাল বশকি বাউ বশকি ডাইন ডাইন করিয়া।"

জঙ্গাল/জোয়াল ঃ

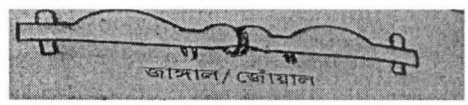

এটিও কাঠের তৈরি। একটি এক ইঞ্চি পুরু ৩/৪ হাত লম্বা তক্তাকে দু'ধারে ঢেউ খেলানো কারুকার্যের সাহায্যে তৈরি করা হয়। এটি থাকে গরুর কাঁধে। যার সঙ্গে লাঙ্গলের ঈশের যোগ থাকে। যোগসূত্রে রশি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়।

পেন্টি ঃ

হল কর্ষণে গরুকে তাড়াবার জন্য কৃষক বা হালুয়ার হাতে ১ হাতের মত একটি লাঠি থাকে। যা বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি করা হয়। হালের গরুকে রসে বশে রাখবার জন্য পেন্টির ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পেন্টিকে কোথাও কোথাও নড়ি'ও বলে। প্রবাদ আছে, 'দুধের বাটি/হালুয়ার লাঠি'।
কিংবা, ছড়ায় পাই —

"গরু সোজা হয় পেন্টিত
মানষি সোজা হয় হুমকিত
সাগাই সোজা হয় আন্দনত
নারী সোজা হয় পেন্দনত।"

মই ঃ

মই চাষের সহায়ক যন্ত্র। লাঙ্গল দিয়ে চাষ করবার পর জমিকে সমান ও সম্পূর্ণ চাষের উপযোগী করবার জন্য মইয়ের দরকার হয়। আবার উচু-নীচু, এবড়ো-খেবড়ো জমিকে সমান করার জন্য এই মই বিশেষ উপযোগী।

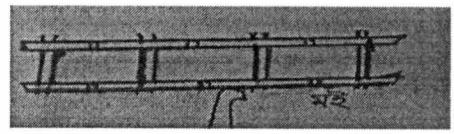

৬/৭ হাত লম্বা একটি 'বোড়' বা 'বউরা' বাঁশের টুকরোকে সমান দুটি ভাগে 'ফালা' করে সমদূরত্বে রেখে দুটি অংশে কিছু ফুটো করা হয়। ফালা করে বাঁশ দুটিকে উল্টো করে পাশাপাশি রাখা হয়। এবং সমদূরত্বে থাকা ফুটোগুলোকে ১ ফুট বা শোয়া ফুট চৌকা ঢুকিয়ে শক্ত করে যুক্ত করা হয়। এইভাবে মই তৈরি হয়। পরে দুই প্রান্তে মোটা রশি বা দড়ি লাগিয়ে জোয়ালের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

বিধা বা বেদা ঃ

এটি একটি চাষের যন্ত্র। একে বেদা বা বিধা বলা হয়। অরাজবংশী কৃষক সম্প্রদায় এটিকে নাঙ্গিলা বলে। বিধা কাঠ ও বাঁশের সমন্বয়ে তৈরি ৩ থেকে ৩$^{১}/_{২}$ হাত লম্বা একটি কাঠের টুকরো চৌকোনা করে তৈরি করা হয়। কাঠের নীচের অংশটি পায় ৩ ইঞ্চি দূরত্বে ফুটো করে সমান মাপের চৌকো টুকরোর ছুচলো অংশ নিম্ন দিক করে লাগানো হয়। নীচের এই ছুচলো অংশগুলোকে দাড় বা দাঁত বলা হয়। কাঠটির মাঝামাঝি জায়গায় বড় ফুটো করে একটি লম্বা কাঠের বা বাঁশের ঈশ লাগানো হয়। ঈশে জোয়াল লাগিয়ে গরু দিয়ে টানানো হয়। বেদা দিলে আগাছা উঠে আসে। ধান, গম, পাট বা সর্ষে ক্ষেতে চারা অবস্থায় টানা হলে আগাছা মরে চারা গাছগুলি সতেজ হয়ে উঠে।

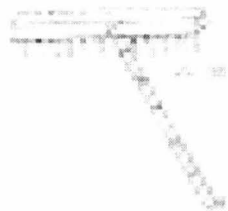

হাসকিনি ঃ

হাসকিনি বেদা বা বিধার ছোট সংস্করণ। এখানে কাঠটি ১ হাতের মত লম্বা হয়। কাঠের নীচে বেদার দাড়ের মতো বাঁশের ছুঁচলো অংশ ফুটো করে যুক্ত করা হয়। এটি টানতে কাঠের মাঝখানটিতে বড় ফুটো করে একটি সরু ও লম্বা বাঁশ লাগানো হয়। এটি টানতে গরুর দরকার হয় না। বাঁশের অংশটি ধরে মানুষই হাত দিয়ে টানে। শুকনো খেতের জমা আগাছা সরানোর কাজে খুবই সহায়ক। এছাড়া জমানো ধান বা অন্য কোন ফসলের ঢিবি ভেঙ্গে দেওয়ার কাজে হাসকিনি বেশ প্রয়োজন হয়।

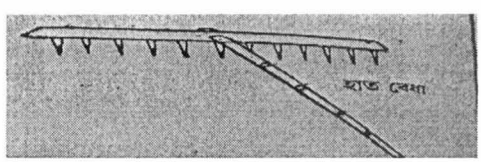

কোদাল ঃ

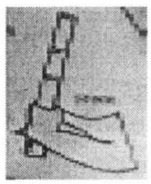

সকলেরই জানা কোদাল নামক যন্ত্রটি কৃষকের পরম বন্ধু। কোদাল লোহার তৈরি এবং মাঝখানে হাতল হিসেবে থাকে বাশের দণ্ড। এর সাহায্যে কৃষক মাটি খোঁড়ার কাজ করে। জমির আর্বজনা পরিষ্কার করে । আল বাঁধা বা আলের পাশে গজানো ঘাস বা আগাছা মাটিসহ পরিষ্কার করে কেটে ফেলে, যাকে বলে ছাঁটকোপ, তা কোদালের সাহায্য ব্যতিরেকে অসম্ভব। কোদাল বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে।

সাটা/পাচন ঃ

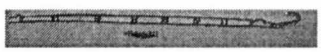

পেন্টি বা নড়ির পরবর্তী পর্যায়ে আসে 'সাটা' নামক শাসন উপকরণ। কোথাও কোথাও এটি পাচন নামেও পরিচিত। সাটার বিশেষত্ব হল একটি বাঁশের লাঠির মাথায় চামড়া বাঁধা থাকে। সাটা সাধারণতঃ মহিষ তাড়ানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গরু তাড়াতেই এর ব্যবহার দেখা যায়।

কুরশি ঃ

অরাজবংশী কৃষকেরা এটাকে ইটা মুণ্ডর বলে থাকে। কুরশি সাধারণতঃ ঢেলা ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হয়। চৈত্র/বৈশাখ বা গ্রীষ্মকালীন চাষেই এর ব্যবহার বেশি। কুরশী তৈরি হয় একটি শক্ত কাঠের টুকরো মাঝখানে ফুটো করে তার মধ্যে একটি লম্বা লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে। এই লাঠিটি হাতল হিসেবে কাজ করে।

রোপণ, নিড়ানি ও সেচে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ঃ

জমি পুরোপুরি ভাবে আবাদযোগ্য প্রস্তুতির পরে রোপণ/বপন কর্ম শুরু হয়। শস্যরোপণ, শস্য কিছুটা বড় হবার পর ফসলকে পরিচর্চা করায় জন্য জঙ্গল, ঘাস ইত্যাদি পরিষ্কার ও সেচের জন্য যে সমস্ত উপকরণাদি ব্যবহৃত হয় তা হল —

ঝুড়ি ঃ

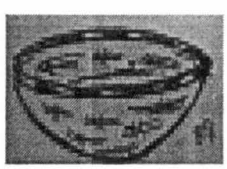

এটি বাঁশের তৈরি। এই উপকরণটি জমিতে শস্যবীজ বা বীজতলা থেকে চারা নিয়ে আসার ক্ষেত্রে রোপণ কার্যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সার ছিটানোতেও এর বিশেষ প্রয়োজন, এছাড়া ফসল তোলার সময়ে ঝুড়ির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ডাউকি ঃ

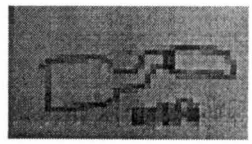

এই উপকরণটি লোহার তৈরি। তবে হাতলটি কাঠের বাঁশের দণ্ড দিয়ে তৈরি হয়। এর সম্মুখ ভাগ চওড়া এবং প্রান্তভাগ তীক্ষ্ম বা ধারালো হয়। তার পরেই ক্রমশঃ সরু হয়ে একটি আঙ্গুলের মত হয় এবং এর প্রান্ত ভাগ তীক্ষ্ম হয়। এই তীক্ষ্ম ভাগে কাঠ বা অনুরূপ কিছু দিয়ে ডাঁট লাগিয়ে হাতল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবহার হয় ফসলের মধ্যে বিভিন্ন আগাছা ও ঘাস পরিষ্কার করার কাজে।

পাসুনি ঃ

এটিকে ডাউকির পর্যায়ভুক্ত করা যায়। তবে আকৃতিতে ভিন্ন প্রকৃতির। এর নিম্নভাগ চওড়া ও নলের মত তীক্ষ্ম অংশ উপরের দিকে এবং সেখানে লাগানো থাকে কাঠ বা অনুরূপ কিছু। এই উপকরণটিও ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করতে এতদঞ্চলের কৃষকেরা ব্যবহার করে থাকে।

খাকেড়া ঃ

এই উপকরণটিও আগাছা তুলে ফেলার কাজেই ব্যবহৃত হয়। তবে একমাত্র বর্ষাকালেই এটি ব্যবহৃত হয়। বর্ষার পরে ধান ক্ষেতের ঘাস ও আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে এর ব্যবহার বেশি। এই উপকরণটি দেখতে হাতের পাঞ্জার মত। আঙ্গুলের মত ৫-৭ টি তীক্ষ্ম লোহার কাঠির সাহায্যে ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করা হয়।

সেউতি/ছেউটি ঃ

এই উপকরণটি সেচন কার্যে ব্যবহৃত হয়। টিন বা বাঁশের বাতা তুলে ছেউটি তৈরি করা হয়। সাধারণতঃ গম বা তামাক চাষে ছেউটির ব্যবহার হতে দেখা যায়।

জমিতে ফসল নজরদারির জন্য ব্যবহৃত উপকরণ ঃ

টং ঃ

জমি থেকে ১০/১২ ফুট উঁচুতে বাঁশের বা কাঠের খুঁটিতে মাচা করে ঘর বানানো হয়। এই ঘর ফসলকে বিভিন্ন বন্যজন্তু যেমন - হাতি, ভাল্লুক, শৃগালের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়। ধূপগুড়ি, ফালাকাটা প্রভৃতি অঞ্চলে এই টং -এর ব্যবহার এখনও দেখা যায়।

কাকতাড়ুয়া ঃ

বাঁশ, খড়ের মধ্যে পুরনো জামা দিয়ে দেহ এবং মাটির হাড়িতে চুন বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে মানুষের মুখ বানিয়ে জমিতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। বিভিন্ন পশু-পাখি থেকে ক্ষেতের বীজ বা ফসল রক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়। পুঁতে দেওয়ার সময় একটি মন্ত্র আওড়ানো হয় ঃ

'জাগি জাগি জাগি
যেই কামের কাম
সেই কামতে নাগিশ।'

মাছ শিকারের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ সমূহ ঃ

লোকসংস্কৃতিবিদরা বলেছেন শিকারজীবী, কৃষিজীবী জীবনধারা থেকে ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হয়ে আজকের আধুনিক সভ্যতার জন্ম হয়েছে। পৃথিবী বিখ্যাত মর্গানতত্ত্ব একথা স্বীকার করে। তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকার রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বর্তমান জীবনধারার মধ্যেও শিকারজীবী জীবনধারার কিছু কিছু নিদর্শন রয়েছে যা কালের নিয়মে খুবই স্বাভাবিক। জলজ প্রাণী মাছকে কিভাবে মানুষ শিকার করবে তারজন্য মানুষের মনের চিন্তা ভাবনা পূর্বকাল থেকে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। সেজন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ-ফন্দী, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করেছে। সেই যন্ত্রপাতি তৈরি করতে কখনো বাঁশ, কখনো লোহার যন্ত্র, কখনো সুতোর জাল তৈরি করতে হয়েছে। তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ রাজবংশী সমাজ কিভাবে মৎস্য শিকার করে এবং কিরূপ উপকরণাদি ব্যবহার করে সে বিষয়ে আলোকপাত করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

এতদঞ্চলে বিশেষতঃ মাছ ধরার বিষয়ে মানব মনের ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে বড় বড় জলাভূমিতে একজনে বা দু'জনে কোন যন্ত্র দিয়ে মৎস শিকার করা যেত না। তখন বহু মানুষ একত্রিত হয়ে সেই বড় জলা ভূমিতে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র দিয়ে মাছ শিকার করত। বহু মানুষ একত্রিত করার একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল। কাজকর্ম ফেলে লোকেরা যে একত্রিত হত তার জন্য দিন নির্দিষ্ট থাকত। যেমন - দোলযাত্রা, বিষুয়া বা চৈত্র সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তিতে কৃষিজীবী লোকেরা হালচাষ করে না। আবার বিভিন্ন পূজা-পার্বণেও হালচাষ বন্ধ থাকে - সেইসব দিনগুলি নির্দিষ্ট ছিল মাছ ধরার জন্য। পূর্বে বহু মানুষ একত্রিত হত 'শিঙা' বাজিয়ে। যে বিল বা নদীতে মাছ ধরা হবে 'শিঙা' বাজিয়ে তা সকালবেলা বলে দেওয়া হত। শিঙার শব্দে মানুষ একত্রিত হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে মাছ ধরা শুরু করত। এই মাছ ধরার পদ্ধতিকে 'বাহ' বা 'বাহু' দেওয়া বলা হয়। অবশ্য, বিষুয়া উপলক্ষে আমাদের প্রকল্পধৃত সমাজটিতে শিকার করবার উৎসব পালিত হয়ে থাকে।[৩৫] 'বাহ'কে এই রকম একটি শিকার পর্ব বলে উল্লেখ করতে পারি। যাইহোক, এখন মাছ ধরার বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

জাল ঃ

ক. সূতা নির্মিত ঃ

বর্ম জাল বা টুঙ্গি জাল ঃ

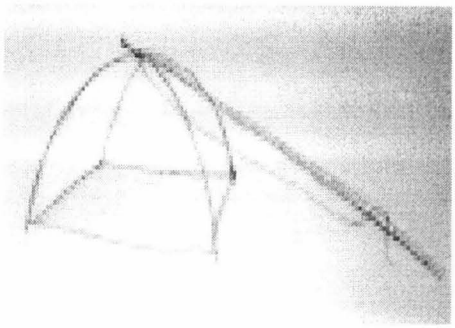

এই জালে পাতলা দুটি বাঁশের বাতাকে ৯০ ডিগ্রি কোণে মাঝখানে শক্ত করে বাঁধতে হয়। এর চার প্রান্তে জালটিকে চতুর্ভুজের ন্যায় আটকানো হয়। বাতাদুটির সংযোগস্থল থেকে একটি লম্বা বাঁশ ও একটি লম্বা দড়ি একত্রিত করে বাঁধা হয়, যার একপ্রান্ত শিকারীর পায়ে ও হাতে থাকে। উল্লেখ্য, দড়িটি জাল তোলা ও নামানোর ক্ষেত্রে লিভারের কাজ করে। এই জাল দিয়ে শুকনো জায়গা বা নদীর পার থেকে দাঁড়িয়ে মাছ ধরা হয়। এই জালে সাধারণতঃ ল্যাটা, দারিকা, পুঁটি, কৈ, মাগুর, ট্যাংরা ইত্যাদি ছোট বা মাঝারি ধরনের মাছ ধরা যায়। অনেক সময় জলে নেমেও ফেলা হয়।

ফিকা জাল/ছাপি জাল ঃ

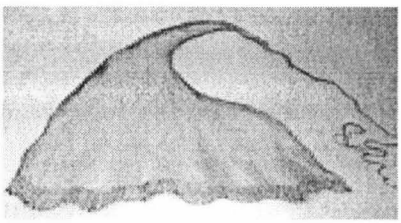

উপর থেকে নীচ দিকে ক্রমশ ছড়ানো গোলাকৃতি এই জাল দ্বারা গভীর বা স্রোতের জলে মাছ ধরার ক্ষেত্রে খুবই আরামপ্রদ। এই জালের নীচের দিকে লোহার কাঠি থাকে। বিশেষ ভঙ্গিমায় হাতের সাহায্যে এই জাল ফেলে মাছ ধরা হয় বলে এই জালকে ফিকা জাল বলা হয়। এই জাল 'ছাপা'র মতো ফেলা হয় বলে এর আরেক নাম 'ছাপি জাল'। এই জাল একজনেই ফেলে এবং তোলে।

নাগা জাল বা ফাঁসি জাল ঃ

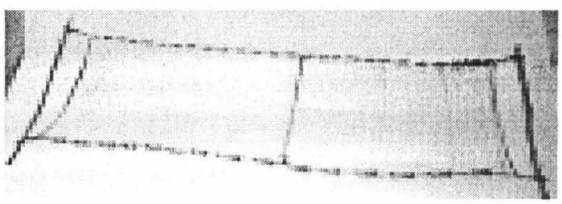

কোমর সমান জলাভূমিতে সম উচ্চতা সম্পন্ন খোপ বিশিষ্ট লম্বা জাল দিয়ে নদী বা বিলের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত লম্বালম্বি ভাবে পেতে রাখা হয়। মাছেরা যখন রাতে জলে চলাচল করতে থাকে তখন এই জালের খোপে ফাঁস লেগে আটকা পড়ে। এই জাল দুই তিন রকম হয়। একটু বড় ফাঁসে কুর্শা, রুই, মৃগেল মাছ ধরা পড়ে। সেইজন্য তাকে 'কুর্শা ফাঁসি'ও বলে। ছোট ছোট খোপ বিশিষ্ট জালে কই, মাগুর, শিঙ্গি, সরপুটি, ট্যাংরা ইত্যাদি মাছ ধরা পড়ে বলে ঐ জালকে 'কৈ ফাঁসি' বা 'কৈয়া জাল'ও বলে।

খরা জাল ঃ

বাঁশের বাতা বা জাল দিয়ে নদীকে ঘিরে এক প্রান্তে এই খরা জাল পাতা হয়। এই জাল বড় বড় বাঁশের সাহায্যে বাঁধা হয়। এই জালের প্রচলন তিস্তা-তোর্ষাপারে ছিল না। দেশভাগের পর উদ্বাস্তুরা এসে এই জালের প্রচলন করেন। পরে প্রায় সমস্ত মৎসজীবী সম্প্রদায় এই জাল ব্যবহারে করে আসছে।

জাঙ্গুরী জাল বা মশারি জাল বা/বড় জাল ঃ

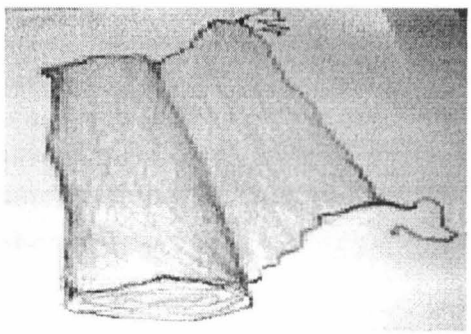

এই জালে মশারির মতো ছোট ছোট খোপ থাকে। এই জাল এত লম্বা যে নদী বা বিলের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘিরে বা বেড় দিয়ে মাছ ধরা হয়। এই জালের উচ্চতা ৮/১০ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ১০০/২০০ ফুট হয়। এই জালের উপরের দিকে শোলার বা কলার পাতার মোটা অংশ বেঁধে দেওয়া হয়। যা জালটিকে উপরের দিকে ভাসিয়ে রাখে এবং জালের নিচে লোহার কাঠি দেওয়া হয়, যাতে জালটি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত মেলে থাকে। একপ্রান্তে ১০/১৫ জন এবং অন্যপ্রান্তে সমপরিমাণ লোক জালটিকে টেনে বিলের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে মাছ ধরে। এতে মাছের পালানোর পথ থাকে না। বড় থেকে ছোট সব ধরনের মাছ এতে ধরা পড়ে।

খ. বাঁশ নির্মিত ঃ

পলো/পলাই বা ঝোকা ঃ

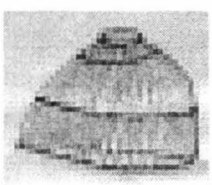

সরু সরু বাঁশের কাঠি দিয়ে বিশেষ কায়দায় তৈরি গোলাকৃতি এই যন্ত্রটিকে পলো বলে। দুই ফুট উচ্চতার যন্ত্রটির উপরের দিকে একটি ছোট মুখ থাকে নিচের দিকটি ছড়ানো এবং খোলা। হাঁটু বা কোমর জলের মধ্যে ছেপে সেই মুখ দিয়ে হাত দিয়ে ঝোকার ভিতরের মাছ ধরা হয়। ঝোকার মধ্যে মাছ পড়লে মাছের ছটফটানির শব্দ শিকারী বুঝতে পারে এবং মাছটি হাত দিয়ে তুলে নেয়।

জলঙ্গা ঃ

বাঁশের পাতলা বাতা দিয়ে 'পাতা বা বানা' তৈরি করা হয়। এই পাতা বা বানা ৩০/৪০ হাত বিশিষ্ট হয়। খালে বা বিলে মাঝখানে এই পাতা

বসিয়ে তার দুই মাথায় 'জলঙ্গা' বসানো হয়। এই বানা বা পাতার জন্য মাছ চলাচল করতে না পেরে জলঙ্গার মধ্যে ঢুকে ফাঁদে বন্দী হয়।

টেমাই/ টেপাই ঃ

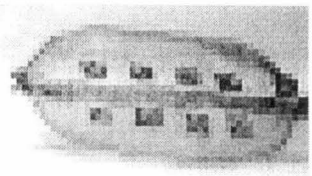

টেমাই বা টেপাই যন্ত্র বাঁশের সরু কাঠির তৈরি একটি ফাঁদ বিশেষ। স্রোত বা অল্প জল বিশিষ্ট জমিতে আল কেটে টেমাই বসানো হয়। স্রোতের অনুকূলে চলার সময় রাস্তা না পেয়ে টেমাই এর খোপে রাস্তা ভেবে আটকা পড়ে। এই টেমাই এর খোপ বিশেষ কায়দায় ভাল্বের মতো তৈরি। খোপ বা 'পারা' দিয়ে শুধু একদিক থেকে প্রবেশ করা যায়। বের হবার কোন প্রকার পথ থাকে না বলে মাছ আটকা পড়ে। মাছ বের করার একটি মুখ থাকে যেখান দিয়ে মাছ বের করা হয়। তবে এই মাছ মারার যন্ত্রটি শুধুমাত্র বর্ষাকালের জন্য।

খলাই/খলুই ঃ

মাছ ধরে তা রাখার যন্ত্রকে খলাই বলে। খলাই বাঁশের চাটাই তুলে সরু সরু ছিদ্র রেখে বোনা হয়।

জাকই বা কেকড়ি ঃ

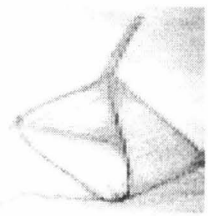

জাকই বাঁশের তৈরি তিনকোণ বিশিষ্ট একটি ফাঁদ বিশেষ। এই ফাঁদ বা যন্ত্রটি এতদঞ্চলের অধিবাসীদের নিজস্ব মাছ ধরার যন্ত্র বলে দাবি করা হয়।[৩৬] এই ফাঁদের বা যন্ত্রের সাহায্যে যেকোন মানুষ অনায়াসে মাছ ধরতে পারে। চালুনের মত বাঁশের হরাই থেকে জল পড়ে যায় এবং মাছ ধরা পড়ে। সাধারণতঃ ছোট মাছ ধরার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। একটি দড়ির সাহায্যে টেনে টেনে এই যন্ত্র দিয়ে মাছ ধরা হয়।

জান বা চান ঃ

জান বা চান দিয়ে মাছ ধরা একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে এই জানের প্রভাব একসময়ে প্রচুর দেখা দিত। মাঝারি ধরনের নদী বা নালা পথকে মাটি দিয়ে বড় আল দিয়ে বাঁধতে হয়। সব জল বাধা প্রাপ্ত হয়ে ফেঁপে উপরে উঠে এবং কিছুটা ঝরনার ধারার মত উপর থেকে নিচে পড়ে। সেই পড়ন্ত জলের মধ্যে নীচে বাঁশের মাচা করা হয়। সেই মাচার উপর বাঁশের

বাতাগুলি লম্বা ভাবে গেঁথে বসানো হয়। উপর থেকে জলের স্রোতের সাথে মাছ ঐ জানে চলে আসে। বাঁশের বাতার ফাঁক দিয়ে জল নিচে চলে যায় এবং মাছ ধরা পড়ে। এতদঞ্চলে বিভিন্ন দহলা জমিতে বর্ষাকালে জান পাতা হত। এই জান অনুসারে মাঠের নামই হত 'জানের মাঠ'।

ঠুসি/ধরকা/ভসকা ঃ

পেশাগত মৎস্যজীবী ছাড়াও বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর কৃষিজীবী শখে এবং নিজেদের খাবার জন্য মাছ শিকার করেন। বর্ষাকালে নদী, পুকুর, খাল, বিল জলে একাকার হয়ে যায়। জল উপচে কৃষিজমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। স্বাভাবিক ভাবে সেই জলে প্রচুর মাছ থাকে। ফলে বর্ষার শুরু থেকে গ্রামাঞ্চলের শখের মৎস্য শিকারীরা তৎপর হয়ে উঠেন। ছোটো ছোট জাল, টেপাই/ট্যাপাই প্রভৃতির সাহায্যে তারা মাছ ধরেন জমিতে। তবে এগুলির পাশাপাশি এতদঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে ঠুসি দিয়ে মাছ ধরার পদ্ধতি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছে।

মূলতঃ বাঁশের তৈরি মাকু আকৃতির ছোট ছোট ঠুসি বসাতে হয় জমির আলে। জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত বর্ষার জলের সঙ্গে খালবিল, পুকুর, নদী থেকে বেরিয়ে আসা মাছ ঠুসিতে একবার আটকে গেলে আর বেরতে পারে না। বর্ষার মুখে তাই ঠুসি তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন অনেকে। মূলতঃ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী পরিবারের সদস্যরা দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে একটু সময় পেলেই ঠুসি তৈরির কাজে হাত দেয়, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র এই তিনমাস তারা ঠুসি দিয়ে মাছ ধরেন। ঠুসিতে সাটি, চ্যাং, ট্যাংরা পুঁটি ছোট ছোট সব ধরনের মাছ ধরা পড়ে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও মাছ এখন মহার্ঘ। তাই বর্ষাকালে ঠুসি, টেপাই প্রভৃতির মাধ্যমে মাছ ধরে রসনা তৃপ্ত করে দরিদ্র কৃষক পরিবারগুলো।[৩৭]

বাঁশের থুরি ঃ

এক ফুট আকারে বাঁশের গোটা অংশ যার দুই মুখ বা একমুখ উন্মুক্ত থাকে তাকে থুরি বলে। বদ্ধ জলাশয়ে, খালে-বিলে জলস্তর হাঁটু মাপের থাকলে তাতে বাঁশের থুরি ফেলে দেওয়া হয় এবং কাদার মধ্যে মিশে থাকা এই থুরির ফাঁকা অংশ দিয়ে মাছ প্রবেশ করে আশ্রয় গ্রহণ করে বেং সময়মত অতি সাবধানে দুই হাতে থুরির দুই খোলা মুখ চেপে ধরে যন্ত্রটিকে ডাঙায় তোলা হয়। এই যন্ত্রটির সাহায্যে চ্যাঙ, ল্যাটা, কই, শিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মাছ ধরা হয়।

বাগা ঃ

দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ ফুট থেকে আট ফুট পর্যন্ত পর্যন্ত হতে পারে; প্রস্তে এক থেকে দেড় ফুট এই

যন্ত্রটি বাঁশের সরু কাঠি দিয়ে তৈরি। আকারে অনেক বড় হওয়ায় এটি কোন নালা বা ছোট নদীতে গুঁজির সাহায্যে বসানো হয়। অনেক সময় এই যন্ত্রটির দু'পাশ দিয়ে যাতে মাছ চলে যেতে না পারে তারজন্য বাঁশের কঞ্চির বা পাঠকাঠির বেড়া দেওয়া হয়। মাছ প্রবেশের জন্য যন্ত্রটিতে উলম্ব ভাবে টিনের ঢেউয়ের মতো গাঁথুনি গভীরভাবে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে ছোট ছোট ফাঁক রাখা হয়। এই ফাঁকগুলো দিয়ে মাছ প্রবেশ করলেও বেরিয়ে আসার সেই রাস্তা আর খুঁজে পায় না। যন্ত্রটির একপাশে মাছ বের করার মুখ থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে মাগুর, কই, শিঙ্গি প্রভৃতি মাছ ধরা যায়। বর্তমানে এই যন্ত্রটি প্রায় বিরল।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে মৎস্য শিকার কর্মটি শুধুমাত্র সৌখিন মৎস শিকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এতদঞ্চলের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গেও যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এখানে বিভিন্ন গ্রাম নামের মধ্যদিয়ে। যেমন - ট্যাংরামারি, পুঁটিমারি, দারিকামারি, ফলিমারি, বোয়ালমারি, টাকিমারি, খট্টিমারি। এমন অজস্র গ্রাম নাম সহজেই এখানকার মৎস শিকার সংস্কৃতিকে উন্মোচিত করে। মাছকে নিয়ে এতদঞ্চলে 'দোতরা ডাঙ্গা' আসরও পাই —

"দীঘিতে সরোবর দীঘির শোভা ফুল
বামনের পৈতা শোভা নারীর শোভা চুল
মাগুর মাছ মাইলানী হয়্যা নিল ফুলের সাজি
চান্দা চাইলন বাতিটা হেলায়ইছে আজি।
কয়্যা মাছটি সন্ধ্যা হয়্যা জ্বালিয়া দিল বাতি।
ছোট পুঁটি ওঠি কয় বড় পুঁটি দিদি
বালিয়া রাজার বিয়াও হচে শনিবারের রাতি।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট, পৃ. ২৮৮ দ্রষ্টব্য)

———

মাটি ঃ

পৃথিবীর স্থলভাগের উপরের স্তরে উদ্ভিদের জন্ম, জীবন ধারণ ও বংশবৃদ্ধি হয়। এই স্তরকে মাটি বলে। প্রকৃতপক্ষে মাটি হচ্ছে একটি মিশ্র পদার্থ যার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে জৈব ও অজৈব পদার্থ ৫০ শতাংশ, বাতাস ২০-৩০ শতাংশ এবং জল ২০-৩০ শতাংশ। এছাড়া নানা ধরনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবাণু এবং জীব মাটির মধ্যে থাকে। আকার অনুযায়ী মাটির সর্বশেষ বিশ্লেষিত পদার্থ কণাগুলিকে বালি কণা, পলিকণা ও কাদাকণা বলে। কোন মাটিতে বালিকণা, পলিকণা ও কাদাকণার আপেক্ষিক অনুপাতের পরিমাণকে মাটির গ্রথন বলে। মাটির প্রকার এরই উপর নির্ণয় করা হয়। মাটির এই প্রকার ভেদকে মাটির গ্রথন অনুযায়ী শ্রেণি বিভাগ বলে। গ্রথন অনুযায়ী মাটিকে বেলে, বেলে দোঁয়াশ, পলি দোঁয়াশ, এটেল দোঁয়াশ, এটেল ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। বেলে ও বেলে দোঁয়াশ মাটিকে হালকা, দোঁয়াশ ও পলি দোঁয়াশকে মাঝারি এবং এটেল ও এটেল দোঁয়াশ মাটিকে ভারি মাটি বলে।[৩৮]

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে মূলতঃ বেলে, বেলে-দোঁয়াশ, পলি দোঁয়াশ এই তিনটি শ্রেণির মাটি দেখা যায়। অন্যতম শ্রেণি হল বেলে দোঁয়াশ। অতএব এ অঞ্চলের মাটি হালকা থেকে মাঝারি ধরনের। তাই এখানকার মাটি মূলতঃ হালকা হওয়ার জন্য জলশোষণ ক্ষমতা বেশি হলেও জলধারণ ক্ষমতা কম। তবে এই মাটিতে জল নিকাশ ও বায়ু চলাচলের কাজ খুব তাড়াতাড়ি ও ভালোভাবে হয়।

জমির শ্রেণি বিভাগ ঃ

যে জমিতে পাট, কলাই ও আউশ ধান হয়, তাকে বলে 'উচা' জমি। যে জমিতে আমন ধান হয় তাকে বলে 'দোলা' বা 'দহলা' জমি। যে জমিতে ঘর বাড়ি প্রস্তুত কিংবা তামাক, আলু, শাকসবজি উৎপন্ন হয় তাকে বলে 'ভাঁট' জমি। খড় হয় যে জমিতে তাকে বলে 'খেড়বাড়ি'। এইরূপ এতদ্‌অঞ্চলের বাঁশ বাগানকে বলে বাঁশ বাড়ি।

বিভিন্ন কৃষিজাত বা বাগিচাজাত ফসলের ওজন প্রথা ঃ

১ দুন/দন	=	১০/১৫ সের (৬০ তোলায় ১ সের)
২০ দুন/দন	=	১ বিশ = ৫ মন (পাঁচ মন), দশ সেরি দনে ১ বিশের ওজন দাঁড়াত ৫ মন।
১৬ বিশ	=	১ পুটি
৪ বিশ	=	১ ধাম

পাট বিক্রি হত এ ভাবে —

৪ আফাল বা মুঠা = ১ বন্দি

৬০-৮০ বন্দি = ১ টুঙ্গী (৬০ তোলা ওজনের সেরের ৩ মন)

পান ও সুপারি বিক্রি হত এভাবে —

১ হালি = ৪ টি

১ ডজন = ৩ হালি

১ গণ্ডা = ১৫ হালি

১ পুন = ২০ হালি

খ) পূজা আরাধনায় ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঃ

রাজবংশী সমাজের বেশির ভাগ মানুষ শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব। এছাড়াও মনসা ইত্যাদি নানা ধরনের মন্দির থাকে। পূজার ঘরে যে সমস্ত জিনিস ব্যবহৃত হয় তা হল —

ক) সলা - বাঁশের তৈরি। ছোট ছোট ৫/৭ টা থাকে।

খ) কুলা - বাঁশের তৈরি। ঠাকুর বরণের জন্য।

গ) সাজি - বাঁশ বা পিতলের তৈরি।

ঘ) ঠগা বা গছা - মাটির বা পিতলের তৈরি।

ঙ) দিয়ারি - মাটি বা পিতলের তৈরি। বাতি জ্বলায়। ছোট বড় দুই ধরনের দিয়ারি থাকে।

চ) ঘট - মাটি বা পিতলের তৈরি।

ছ) বাটা - ছোট, পিতলের তৈরি।

জ) গিলাস - পিতলের তৈরী।

ঝ) লোটা বা ঘটি - পিতল বা কামার বা মাটির তৈরি।

ঞ) ঘড়া বা কলসি - মাটি বা পিতলের তৈরি।

ট) শঙ্খ -

ঠ) ঘন্টা - কাঁসা বা পিতলের তৈরি।

ড) কাঁসি - ঐ

ঢ) ধূপদানী - পিতলের তৈরি।

ণ) ধূপাতি - মাটি বা পিতলের তৈরি।

ত) চন্দন - শ্বেত বা রক্ত চন্দন।

থ) চন্দন পাটা - শিলের চন্দন পাটা।

দ) কোষাকুষি - তামার তৈরি।

গৃহে ব্যবহৃত আসবাব পত্র ঃ

আর্থিক অবস্থার কারণে সব রাজবংশীর ঘর ও ঘরের জিনিসপত্র একরূপ হয় না। অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল মানুষের সাদাসিধা ঘরবাড়ি ধনী লোকের মত হয় না। গরীব মানুষের আলাদা করে গোলা ঘর, ঠাকুর ঘর, ডারিয়া ঘর ইত্যাদি থাকে না। তবে কিছু কিছু আসবাবপত্র প্রায় সকল গৃহে পরিলক্ষিত হয়।

১. বিছানা বা বিচিনা - চকি বা খাট।

২. চাংরা - বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি। বাঁশের খুঁটি মাটিতে পুঁতে উপরে বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি।

৩. তোষক বা খোস্‌লা - ধানের খড় দিয়ে বানানো। চকি বা চাংরায় পাতা হয়। কোথাও কোথাও সুতলি দিয়ে খড়গুলি সেলাই করে নেওয়া হয়। আবার কোথাও কোথাও শিমুল তুলায় তৈরি হয়।

৪. কাঁথা বা কেথা বা দাগিলা - পুরনো কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়। বিছিনায় পাতা ও শীতের সময় বা হালকা শীতে গায় দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

৫. লেপ - তুলা দিয়ে তৈরি।

৬. বালিশ বা সিতান - কাঠোয়া, খড় ও তুলার তৈরি সিতান বা বালিশ প্রচলিত।

৭. মাচা বা গোলা - ধান রাখার জায়গা। ডেলি, ঢোলি মধ্যে নানান শস্য, চাউল ইত্যাদি রাখে।

৮. সেন্দুক/সিন্দুক - লোহার তৈরি, টাকা-পয়সা, সোনা-দানা ইত্যাদি রাখে।

৯. বাক্স বা ঢেস্‌কো - 'খুটা' ও টিনের তৈরি। জামা-কাপড়, গয়না ইত্যাদি এতে রাখা হয়।

১০. শিকে বা শেকিয়া - রাজবংশী গৃহস্থের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, ধনী-গরীব সব রাজবংশী মানুষের মধ্যে শিকের ব্যবহার আছে। পাট দিয়ে শিকে তৈরি হয়। এটা একটা শিল্প। ঘরের চালে, বাতায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কাপড়-চোপড়, এছাড়া বাচ্চা-কাচ্ছা বা বিড়ালের হাত থেকে খাবার জিনিস রক্ষার জন্য দুধ, দৈ, মাছ, শাক ইত্যাদি তুলে রাখা হয়।

শিকা নিয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

১১. জলচকি - বাঁশের বা কাঠের তৈরি ছোট বসার চকি। আগের দিনে চেয়ার বা টোল ছিল না। জল চকিতেই মানুষ বসতে দিত। এছাড়া বাক্স ইত্যাদি জলচকিতে তুলে রাখা হত।

খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত পাত্রাদি ঃ

রান্না ঘরে যে কোনো সমাজের লোকের সব চাইতে বেশি জিনিসপত্র লাগে। আমাদের প্রকল্পধৃত সমাজটিতেও এর অন্যথা হয় না।

১.উনুন বা আখা বা চৌকা - মাটির তৈয়ারি।

২. হাঁড়ি বা হানডি বা ডেচকি - মাটি বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। কোথাও কোথাও পিতলের হাঁড়িও দেখা যায়।

৩. কড়াই বা ডোগা - রান্নার জন্য ব্যবহৃত হয়। কড়াই লোহার তৈরি। আজকাল অবশ্য অ্যালুমিনিয়ামের কড়াই ব্যবহার হয়।

৪. চেলী - গামলার মতন। দুধ গরম করা, পায়েস রান্না ইত্যাদির জন্য ব্যবহার হয়।

৫. টৌ - পিতলের তৈয়ারি। বড় হাঁড়ির মত কিন্তু মুখ পেট সমান। বেশি লোকের রান্নার জন্য বিশেষতঃ ভাত রান্নার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৬. গামলা - এ্যালুমিনিয়ামের আর পিতলের তৈরি। মুখটা চওড়া।

৭. খাদা - মাটির তৈরি গামলাকে খাদা বলে।

৮. হাতা - পিতল বা অ্যালুমিনিয়ামের বড় চামচ। ছোট বড় নানা রকমের হাতা হয়।

৯. ডাবু - পিতলের তৈরি বড় হাতা বিশেষ।

১০. খন্তি - সাধারণতঃ অনুষ্ঠান বাড়িতে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। লোহা বা পিতলের তৈরি। লম্বা হাতল থাকে। একদিকে চ্যাপটা।

১১. ডালকাটা বা ঘুটুনি - পিতলের তৈরি। লম্বা হাতলের একপাশে চারখানা পাত লাগানো থাকে। গরীব মানুষেরা বাঁশ বা পাট কাঠি দিয়ে ডাল কাটা বানিয়ে নেয়। ডাল নরম মত হয়ে এলে এই কাঠির সাহায্যে ডালকে ভালোমত গলিয়ে মিশিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

১২. নাকারি বা নাখারি	-	বাঁশের তৈরি। রান্না ভাত নেড়ে গেঁটে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।
১৩. নুচনি বা নাচুনি	-	রান্না করা হাঁড়ি কড়াই পরিষ্কার রাখার জন্য পাটের তৈরি।
১৪. থালা বা থালি	-	খাবার পরিবেশনের জন্য ছোট বড় নানা আকৃতির থালা ব্যবহৃত হয়। কাঁসা, এ্যালুমিনিয়াম, টিন বা স্টিলের থালা ব্যবহৃত হয়।
১৫. বাটি বা খুড়ি	-	চা-জলপান, দৈ-চিড়ে খাবার জন্য বাটি লাগে। বড় বাটিকে 'জামবাটি' বলে। সাধারণতঃ কাঁসার তৈরি।
১৬. গিলাস/গেলাস	-	জল খায়। কাঁসা, পিতলে বা স্টিলের তৈরি।
১৭. নোটা বা লোটা	-	কাঁসা, পিতলের তৈরি। জল খাবার ও হাত-পা ধোওয়ার জন্য লাগে।
১৮. কলসি বা ঘড়া	-	পিতলের বা মাটির তৈরি। ছোট বড় নানা আকৃতির কলসিতে জল এনে রাখা হয়।
১৯. ঝাড়ি	-	পিতলের তৈরি।
২০. জগ	-	পিতলের তৈরি।
২১. তোরসি বা বাটা	-	ছোট কাঁসা পিতলের পাত্র। গুয়া-পান খাবার জন্য ব্যবহৃত হয়।
২২. পিড়া	-	বাঁশের বা কাঠের তৈরি। বসে ভাত খায়। ভাত খাওয়া ছাড়াও মানুষ এতে বসে বা বসে গল্প করে।
২৩. বান্নি বা বারুণ	-	সাধারণতঃ ছনখড়ের তৈরি। বিভিন্ন ঘরের জন্য বিভিন্ন রকম বান্নি হয়। রান্না ঘরের বান্নি রান্না ঘরের জন্যই ব্যবহৃত হয়।
২৪. বটি/কাটারি	-	মাছ, শাক, সুপারি কাটার জন্য লোহার অস্ত্র বিশেষ।
২৫. ডাবর বা পেইলা	-	মাটির ছোট কলসি।
২৬. দাও	-	লোহার তৈরি। বাঁশ বা লোহার ডান্টি থাকে। বাঁশ, গাছ-গাছালি কাটার জন্য লাগে।
২৭. যাতি বা শত্তা	-	লোহার তৈরি। সুপারি কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়।
২৮. ঝাঁটা	-	বাঁশের কাঠি তুলে শক্ত করে গড়া বান্নির মত।
২৯. শিলপাটা	-	মশলা বাটার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩০. কুপি বা গছা - পিতল বা টিনের বাতি।

৩১. নেথানি বা নেতা - পাট বা কাপড় দিয়ে তৈরি ঘর মোছার জন্য ব্যবহৃত হয়।

গৃহস্থ কর্মে ব্যবহৃত উপকরণাদি ঃ

১. ধান সিদ্ধ কড়াই ঃ

বড় লোহার কড়াই। ১০ থেকে ৪০/৫০ কেজি ধান সিদ্ধ করার জন্য এই কড়াই ব্যবহৃত হয়।

২. মাটির হাঁড়ি/চার ঃ

ধান ভিজানো বা সিজানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. ঢেকি ঃ

কাঠের তৈরি। চাউল ও চিড়ে তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪. ছাম/উরুণ/উরাল ঃ

কাঠের তৈরি। চাউল, চিড়ে তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাড়িতে ভোজের অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন মশলাও তৈরি হয়ে থাকে।

৫. গাইন ঃ

লম্বা কাঠের তৈরি। ছামে গাইন দিয়ে ধান, চিড়ে ভানতে হয়। এছাড়া সিদল তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

৬. কুলা ঃ

বাঁশের তৈরি। ধান, চাউল, চিড়ে ঝাড়তে ব্যবহৃত হয়।

৭. চাইলন বা চালুনি ঃ

ছোটবড় ফুটো থাকা বাঁশের বাতা তুলে তৈরি করা হয়। মুড়ি, খই, চিড়ে ছাকনির কাজে ব্যবহৃত হয়। উৎসব অনুষ্ঠানেও ব্যবহৃত হয়।

৮. ডালা বা চালা বা চেলা ঃ

বাঁশের তৈয়ারি। চাউল, ধান রাখবার ও ঝাড়াইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

৯. ডেলি বা ডালি ঃ

বাঁশের তৈরি। ধান ও অন্যান্য শস্যাদি রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। ছোট বড় নানা রকমের ডালি হয়।

১০. টালা ঃ

বাঁশ বা বেতের তৈরি। ধান ও অন্যান্য শস্যাদি পরিমাপে ব্যবহৃত হয়।

১১. ঢাকি ঃ

বেতের তৈরি একধরনের বড় ডালা, ৫ কেজি ধান ও অন্যান্য শস্যাদি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।

১২. চেল্লো ঃ

মুড়ি, খই, চিড়ে ইত্যাদি ভাঁজার জন্য পাতলা বাঁশ বা বিন্নার বারুণ বা বান্নি।

১৩. ঘাটা ঃ

বাঁশের তৈরি। লম্বা ও চ্যাপ্টা। চিড়ে ভানবার সময় ঘাটার জন্য ব্যবহৃত হয়।

১৪. ঢারি বা তালাই ঃ

বাঁশের তৈরি। ধান বা অন্যান্য শস্যাদি শুকানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

গোলা ঘরে ব্যবহৃত উপকরণাদি ঃ

১. ডোল ঃ

বাঁশের তৈরি বড় ধান রাখার পাত্র বা ভারা। ছোটবড় নানা রকমের হয়। ১ থেকে ১০ কুইন্টাল পর্যন্ত ধান রাখা যায়। ডোলের ভিতর ও বাইরে গোবর ও মাটি দিয়ে লেপা বা মোছা হয়।

২. বড় মাটির হাড়ি ঃ

৫০ কেজি বা ১ কুইন্টাল শস্য ভরে রাখা যায়।

৩. দন বা দোন ঃ

বাঁশ বা বেতের তৈরি। ধান ও অন্যান্য শস্যাদি পরিমাপ করা হয়।

৪. ধেরা ঃ

বাঁশের তৈরি। পাট পচানোর পর পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫. কাচারি বা চাঙ্গারি বা খাচা ঃ

নিচের দিকটা চওড়া বাঁশের তৈরি বিভিন্ন শস্য বা শাক-সবজি জমি থেকে আনার কাজে ব্যবহৃত হয়।

৬. ফাকুড়া, হাতুড়া বা ফাউরি ঃ

কাঠের তৈরি, একফালা চাঁদের মত দেখতে বাঁশের বা কাঠের হাতল থাকে। শস্যাদি ছড়ানো ও গোছানো জন্য ব্যবহৃত হয়।

৭. কাড়াইল বা কাঙারি ঃ

বাঁশের তৈরি তিন/সাড়ে তিন হাত লম্বা মাথাটা বেঁকানো থাকে। খড় বিচুনি নাড়া ঘাটা করতে ব্যবহৃত হয়।

ডারি ঘর বৈঠক খানা ঃ

ডারি ঘরে সাধারণতঃ বাইরের মানুষ এলে বসে বা রাত্রিতে থাকার দরকার হলে থাকে। এই ঘরে বিছানা থাকে। বসার জন্য কাঠের বা বাঁশের বেঞ্চি, জলচকি থাকে। আর থাকে হুকা, ছিলিম, জলের জগ, বদনা ইত্যাদি।

খাদ্যাভাস ঃ

রাজবংশী সমাজে আহার বিহারের মধ্যে ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, শাকসবজি ছাড়াও বিশেষ খাদ্যাভাস হিসেবে শিদল, ছেকা, প্যালকা, পাতাও নামক খাদ্য তালিকা তুলে ধরা যায়।

সিদল ঃ

এতদঞ্চলে নদীর সংখ্যা প্রচুর। বর্ষাকালে মাছের ছড়াছড়ি ছিল। নানা প্রক্রিয়ায় মাছ ধরে তা দিয়ে শুট্‌কি করা হয়। ছোট ছোট মাছের শুট্‌কি ছাম গাইনে গুঁড়ো করে তাতে কালো কচুর ডাঁটা ছুলে

পরিমাণ মত দেওয়া হয়। একটা নরম মণ্ড তৈরি হয়। সর্ষের তেল হাতে মেখে কচু ও শুট্‌কি মাছের নরম মণ্ডটা থেকে ছোট ছোট বলের আকৃতির মণ্ড করা হয়। এই মণ্ডগুলি বিঁচি বা আটিয়া কলার গাছের গোড়া মিহি করে কেটে শুকিয়ে পুড়িয়ে যে ছাই হয় সেই ছাইয়ের তলায় রেখে দেওয়া হয়। এই ছাইয়ের ক্ষারত্ব মণ্ডগুলিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেদ্ধ করে। কচু ও শুট্‌কি গুঁড়ো অদ্ভুত ভাবে মিশে গিয়ে তৈরি হয় 'সিদল'। যাঁরা এইসব বানানোর ওস্তাদ তারাই 'তাক' বোঝে। মাস দুই পর দেখা হয় সিদল হল কিনা। তৈরি হলে সিদল পুড়ে সর্ষের তেল, লঙ্কা, লবণ দিয়ে মেখে খাওয়া হয়। এই সিদলকে নিয়ে রসিক কবি শ্লোক বানিয়েছেন —

"নমস্তে সিদলঃ দেবায়ঃ কৃষ্ণকায়া মৃতঃ প্রভং
পিতে মধুরং নাম মোর যেন চরাচর;
যদাত্মাং মিশ্রিতং ভৌতাং সহান্যে ব্যঞ্জনে চ
কদাচিৎ প্রফুল্লস্বাদ বর্ণিতং না স্বরগামী
অতুলাঞ্চ প্রভাকরম শালগ্রাম রূপং তথা
মহাদেব স্বরূপান্তে দীর্ঘকায়া
শুষ্কমীনং কচ্চিদায় হরিদ্রায় মিশ্রণে
সদর্প তৈলং সংযুক্তংত্বং সিদলং নমাম্যহম্।"

সিদলের মাহাত্ম্য (বাংলা) ঃ

"নমস্কার করি মুই কালা সিদলের পায়
আহা কি মধুর নাম তোমার হইল দুনিয়ায়
ভাত তরকারির সাথে তোমায় মিশাইনু করিলে
এত খুশি হইনু মুই বর্ণিবার কথা নাহি মেলে
ইচ্ছা করি কেহ যদি সিদল খাইতে চায়
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল তার চারগুণা হয়।
পোড়া খাও আওটা খাও মনে শান্তি পাবে
মরুচ কিছু বেশি দিলে সুস্বাদু হইবে,
দুই আঙ্গুলে যদি ফের সিদল খাইবে।
ন্যারফের ড্যারড্যার করি নাকের ঝোল ঝরিবে।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫৭ দ্রষ্টব্য)

ছেকা ও প্যালকা ঃ

আটিয়া কলাগাছের গোড়ার অংশ শক্ত করে কেটে শুকিয়ে পুড়িয়ে যে ছাই হয় তা একটা নারকেলের মালাইয়ের মধ্যে রেখে উপরে জল দেওয়া হয় মালাইয়ের ফুটো দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে অল্প

অল্প করে জল নীচের পাত্রে জমা হয় এটাই ছেকার জল। সরু ডাটা যুক্ত পুঁই শাক কুচি কুচি করে কেটে সম্বর দিয়ে জল দেবার পর পরিমাণ মত ছেকা দিলে পেলকা শাক হয়। পাট শাক দিয়েও প্যালকা হয়। অর্থাৎ এটা খুব পিচ্ছল বা পিছলা হয় বলেই একে পেলকা বলে। একই পদ্ধতি মানকচু, মুখীকচু বা কোন লাবড়াতে ছেকা দিলে সেটাকে ছেকা শাক বলে। অবশ্য তরকারীকে এতদঞ্চলে শাকই বলা হয়। মাসকলাই ডালে ছেকা বেশ উপাদেয়। ছেকার উল্লেখ বহু গানেই আছে —

"ছেকা শাক আন্দোছোন বাপই
ঘিত কুমড়ার পাত।"

পাতাও ঃ

কচি কচি কচুপাতা বোটা ও মোটা শিরসহ কেটে উত্তমরূপে ধুয়ে পর পর সাজিয়ে একটা গোল গদি বানিয়ে তার মধ্যে কাঁচা লঙ্কা, রসুন দিয়ে হলুদ গাছের পাতা দিয়ে মোড়ানো হয়। সেটার উপর আরও কলা পাতা দিয়ে মুড়ে সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। তারপর খড়ে আগুন জ্বালিয়ে পাতাগুলি সিদ্ধ করা হয়। 'তাক' মত তুলে পোড়া যাওয়া কলা পাতা, হলুদ পাতা সযত্নে সরিয়ে তেল লবণ দিয়ে মেখে খাওয়া হয় 'পাতাও'। কোথাও কোথাও সরু মাছ দিয়েও 'পাতাও' বানানো হয়। এই সমাজের ভোজন রসিক তাই বলে থাকে —

"খুঁড়িয়া বতুয়ার আগাল
ডিমার ভাজি, কৈতরের ছাও -
নাওয়ের পাতোত্ করিয়া দে
শিদলের পাতাও।"

অলংকার ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের রাজবংশী সমাজে বিভিন্ন অলংকারের ব্যবহার দেখা যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত রাজবংশী সমাজের রমণীরাও অলংকার পরতে ভালবাসে। আগে রূপার মালা ব্যবহার হত। কালোডুরির মধ্যে গেঁথে রূপার আধুলি, সিকি, কাঁচা টাকার মালা গড়তে দেখা যেত। এগুলিকে শুক্তিমালা বলে। চন্দ্রহার মালা রূপার হলেও অভিজাত বা ধনী পরিবারের মহিলারা পরত। এই মালার শিল্প সুষমা প্রশংসার দাবি রাখে। নাকে পরা হ'ত নোলো বা নোলক কিংবা নাকফুল। এই নোলক সংস্কৃতি নিয়ে বহুল প্রচলিত লোকগান —

"ভাল করিয়া বাজান রে দোতারা
সুন্দরী কমলা নাচে ...।
সুন্দরী কমলা ...।
সুন্দরী কমলার নাকে নোলক

টলমল টলমল করে রে।
ভাল করিয়া বাজান রে দোতারা
সুন্দরী কমলা নাচে।''

কানের উপরে অংশে পরা হ'ত মাছিপাত আর নীচের অংশে পরা হ'ত অন্তি। বর্তমানে মাছিপাতের প্রচলন নেই। অন্তি হচ্ছে কানপাশা বা দুল। দুই বাহুতে এখানকার রমণীরা পরত বাজু, হাতে পরত খাড়ু বা চুড়ি। বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই শাখা ও সিঁদুর ছিল। দুই পায়ের হাঁটুর নীচে প'রত ফেলা খাড়ু আর নলবাগ। পায়ের পাতায় পরত 'নেপুর' (নূপুর)। সিঁথিতে দেখা যেত সীতাপাটি। এদতঞ্চলে সমস্ত অলংকারই প্রধানত রূপার নির্মিত। সোনার প্রচলন প্রায় ছিল না বললেই চলে। সোনা এসেছে পরবর্তীকালে।[৩৯]

বসন ও ব্যসন ঃ

মূলতঃ নাতিশীতোষ্ণ আর কৃষিজীবী বলে রাজবংশী সমাজে স্বল্পবাস চালু ছিল। তবু এদের মধ্যে যারা সম্পন্ন এবং কিছু শিক্ষিত ও শহরাঞ্চলে বাস করত তাদের মধ্যে ধুতি, চাদর, তসরের চাদর, নক্শী কাঁথা, তুলার কম্বল, সুক্ষ্ম পাটের ধোকরার প্রচলন ছিল।

রাজবংশী রমণীরা টাকুরী চালিয়ে এণ্ডির সুতা কাটত। ঢ্যানা ও মাকু দিয়ে মোটা কাপড় তৈরি করত। গামছা, শাড়ী ও ধুতি তৈরি করত। মহিলারা বুকের উপরে শাড়ী পড়ত, এই কাপড় হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকত। এই কাপড়কে বলে 'ফোতা'। 'ফোতা' পড়ে গৃহস্থালী কাজকর্মের সুবিধা হত। পুরুষরা প'রত গামছা বা মার্কিনের কাপড়। এগুলি চাষের বা পরিশ্রমের কার্যে সহায়ক হত। বাইরে গেলে ধুতি লাঠি ছাড়া গামছা ব্যবহার করত। ঘাড়ে গামছা রাখা রাজবংশী সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। এদতঞ্চলে এই গামছাকে নিয়ে লোকগায়ক তাই গান বেঁধেছেন — ''যদি বন্ধু যাবার চান, ঘাড়ের গামছা থুইয়া যানরে।''

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে বেশিরভাগ কৃষকই ছিলেন আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল। থাকা খাওয়ারই যেখানে অভাব সেখানে কাপড়-চোপড়ের বাহুল্য বিলাসিতা-বাতুলতা মাত্র। এ সম্বন্ধে ধনঞ্জয় রায় বলেছেন — ''পুঁথির পাতায় কৃষকদের যে দুর্দশার কাহিনি পড়েছিলাম, বাস্তব জীবনে তার চেহারা দেখে আতঁকে উঠলাম। কৃষকদের বাড়িতে যখন দিন কাটিয়েছি দেখেছি তাদের নিজেদেরই মাথা গুঁজবার স্থান নেই। বাইরের মানুষ এলে জায়গা দেবে কোথায়? তাই হামেশাই গরু-ছাগলের সঙ্গে একই গোয়াল ঘরে রাত কাটাতে হত। দেখেছি উত্তরবঙ্গে প্রবল শীতে তাদের দেহে কোন বস্ত্র নেই। পাট প্রধান অঞ্চলে কোন কোন ভাগ্যবান গরীবচাষী চট গায়ে শীত কাটাত। পরনে তাদের কাপড় জুটত না। মেয়েরা অতি কষ্টে লজ্জা নিবারণ করত 'বুকনি' পরে। বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত এক টুকরো কাপড় জড়ানো। আর পুরুষেরা আক্ষরিক অর্থেই পড়ত লেংটি।''[৪০]

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের বাস্তুভিটা ও তার উপকরণাদি ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের রাজবংশী সমাজের বসতবাটি নির্মাণে উপকরণের ব্যবহার ও কলাকৌশলে প্রাচীনতার ছাপ স্পষ্ট ও বিশিষ্টতার দাবী রাখে। প্রাগ্-ঐতিহাসিক কালে মানুষ ছিল অরণ্যচারী, গুহাবাসী ও শিকারজীবী। গুহা ও শিকারকেন্দ্রিক জীবনধারার পরে মানুষ ঝুম চাষ (Shift Cultivation) শুরু করে। স্বভাবতই অনুভব করে ঘর বাড়ি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা। শুরু হয় বাঁশ কাঠ, খড়, পাতার ঘরবাড়ি নির্মাণ। বলাবাহুল্য, কোনো জনগোষ্ঠীর বাসস্থান নির্মাণে সেই স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, উপাদানের বা উপকরণের প্রাচুর্য্য, আর্থ সামাজিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বসতবাটি নির্মাণে এতদঞ্চলের রাজবংশী সমাজে নানা প্রবাদ প্রবচনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পূবে হাঁস উত্তরে বাঁশ
পশ্চিমে ঘিরে দক্ষিণ ছেড়ে।

...

দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা
পূর্ব দুয়ারী তার প্রজা
পশ্চিম দুয়ারী মুখে ছাই
উত্তর দুয়ারী খাজনা নাই।

দক্ষিণ দুয়ারী বাড়ি যে বিজ্ঞান সম্মত, স্বাস্থ্য সম্মত এবং সর্বজনপ্রিয় তা উপরোক্ত প্রবচনে সুস্পষ্ট। অনুরূপ বাস্তু সম্পর্কে আরও একটি সর্বজন স্বীকৃত লোকপ্রবাদ প্রচলিত আছে এতদঞ্চলে —

"পুবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ
উত্তরে গুয়া দক্ষিণে ধুয়া।"

(হাঁস - পুকুর বা জলাশয় অর্থে, গুয়া - সুপারি অর্থে, ধুয়া - ফাঁকা অর্থে)

এই প্রবাদে একটি আদর্শ রাজবংশী বাড়ির কথা বলা হয়েছে। এরূপ বসতবাটি নির্মাণ কৌশল কতটা স্বাস্থ্য সম্মত ও বিজ্ঞান সম্মত তা প্রবাদটির অন্তর্নিহিত অর্থটি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

বাড়ির পূর্বে হাঁস অর্থাৎ পুকুর থাকবে, সকাল বেলাকার সূর্যালোক গৃহে প্রবেশ করবে যা স্বাস্থ্য সম্মত। আবার পুকুরে হাঁস চারণা করবে যার থেকে ডিম এবং মাংস পাওয়া যাবে যা পুষ্টিকর। পশ্চিমে বাঁশ অর্থাৎ বাঁশঝাড়ের সুশীতল ছায়া গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে ঘরবাড়িকে ঠাণ্ডা রাখবে। সামলাবে পশ্চিমের ঝড়ঝাপটা। এছাড়াও সহজলভ্য এই বাঁশ থেকে গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্র পাওয়া যায়। (বাঁশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। উত্তরে গুয়া অর্থাৎ সুপারি গাছ। উত্তরের হিমেল হাওয়া আটকে দেয়। আবার এই সুপারি গাছে লাগানো হত পান গাছ। পান - সুপারি রাজবংশী জীবনধারায় বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও লোকগানে এই পান - সুপারীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজবংশী বসত বাড়ির দক্ষিণ দিক থাকে ধুয়া ''অর্থাৎ ফাঁকা বা খোলা। আদর্শ রাজবংশী বাড়ির নক্শা।

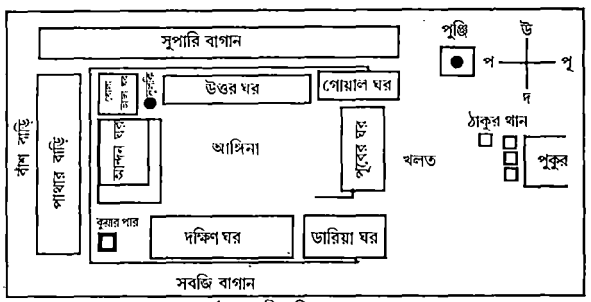

আদর্শ রাজবংশী বাড়ির নক্সা - ১

বাড়ির বিভিন্ন ভিটার ঘরগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এবং নির্মাণ পদ্ধতিও ভিন্ন রীতির ঘর বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে কতগুলি লৌকিক সংস্কার অবশ্য পালনীয় বলে মনে করে। যেমন ভিটাচুকা, গণনা পদ্ধতি।

পাঞ্জিয়ার ও ভিটাচুকা ঃ

নতুন বাড়ি তৈরি বা পুরাতন বাড়ি ঘর স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে নতুন জায়গার মাটি যিনি পরীক্ষা করেন ও বিধান দেন রাজবংশী সমাজে তিনি পাঞ্জিয়ার নামে পরিচিত। পাঞ্জ > পাঞ্জি > পাঞ্জি + আর। এতদঞ্চলে পাঞ্জিয়ারের বিশেষ মর্যাদা আছে। এর কাজ হল জমির ভিটে মাটি পরীক্ষা বা গণনা করে দেখা। অর্থাৎ গৃহস্থ যে জায়গায় ঘর বাড়ি নির্মাণ করবেন সেখানে কোন অমঙ্গল সূচক লক্ষণ আছে কিনা তা গণনা করে দেখাই তাঁর কাজ। এছাড়া কোন্ ভিটায় কোন্ ঘর নির্মাণ করলে মঙ্গলজনক হবে তার বিধান দিয়ে থাকেন তিনি। কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কারের বিধানও দিয়ে থাকেন। জমির শুদ্ধিকরণ বা জমির ভালোমন্দের গণনা করাকে এতদঞ্চলে 'ভিটাচুকা' বলে। 'ভিটাচুকা' রীতির মাধ্যমে মঙ্গল-অমঙ্গল নিরূপণের পর পাঞ্জিয়ার বাড়ি করবার পরামর্শ দিলে গৃহস্থ বাড়ি করার কাজ আরম্ভ করেন।

ভিটাচুকার পদ্ধতি ঃ

কোন এক শুভদিনে পাঞ্জিয়ারকে ডাকা হয়। পাঞ্জিয়ার ও গৃহস্থ জমিতে হাজির হন। প্রয়োজন হয় কিছু উপকরণের। যেমন - কলার পাতা, কলার নিমচপাতা, দুটি পাকা কলা, ১ জোড়া পান

সুপারি, ফুল, দূর্বা, এক গ্লাস জল, মাটির প্রদীপ, দুধ ও ধূপ প্রভৃতি।

পাঞ্জিয়ার কলাপাতার আসনে পূর্বদিকে মুখ করে বসেন। সামনের দিকে একখণ্ড কলাপাতা পেতে তার উপর নিমচপাতা পূর্ব মুখে স্থাপন করেন। এরপর তার উপর দুটি কলা, দুধ নিবেদন করে কলাপাতায় চক্র কেটে নিমচপাতার উপর প্রতিস্থাপন করেন। এরপর একখণ্ড ছোট কলাপাতায় আঙ্গুল দিয়ে সর্ষের তেল মেখে প্রদীপ শিখাতে কাজল করে নিয়ে নিমচপাতায় স্থাপন করে ধূপকাটি জ্বালিয়ে দেন। পরে গ্লাসের জল ছিটিয়ে ফুল ইত্যাদি যোগে মন্ত্রোচ্চারণসহ পূজা করেন। পূজা শেষে পাঞ্জিয়ার কাজল পাতার সৃষ্ট 'প্রতীক' ছবির বর্ণনা করেন। সূর্যলোকের বিপরীতে রেখে 'কাজল-পাতার' ছবি দর্শন করা হয়। ছবি বিশ্লেষণ করে পাঞ্জিয়ার জমির ভালোমন্দ চরিত্রটি জানিয়ে দেন। যেমন - দেবী কালীমূর্তির ছবি যদি কলাপাতায় ভেসে উঠে তবে তা হবে মঙ্গলজনক। অর্থাৎ সেখানে বসতবাটি নির্মাণে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, দেবী মূর্তি মঙ্গলের প্রতীক। এরূপ একটি ক্ষেত্রসমীক্ষায় পাঞ্জিয়ারের রীতি পদ্ধতি শুনবার সুযোগ হয়েছিল শ্রীবিভূতিভূষণ রায়ের (পশ্চিম শালবাড়ি, ধূপগুড়ি) বাড়িতে।

পাঞ্জিয়ার এছাড়া নিম্নোক্ত ছবিগুলির প্রতীক অর্থ বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন নিয়ম পালনের বিধান দেন। যেমন -

বাঘ - কলাপাতায় বাঘের ছবি প্রতীয়মান হলে যে সমস্ত উপকরণ দিয়ে পূজা করার বিধান দেন সেগুলি হ'ল — কলার ঝুকি ১) দুধ, চিনি, ধূপ, লাল শালু ১ হাত, ২ টা পাকা কলা, ফুল, দূর্বা প্রভৃতি।

পাঞ্জিয়ার পূব দিকে মুখ করে বসে পূজা দেন। প্রথমে গণেশ পূজা, ও পরে কালীকে স্মরণ ক'রে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। পূজান্তে মন্ত্রপূতঃ জল সারা বাড়িতে ছিটিয়ে দেন। এভাবে বাড়ি শুদ্ধিকরণ হয় ব'লে বিশ্বাস করা হয়। বলা বাহুল্য, বাঘ (Tiger) এখানে সম্ভবতঃ Totem রূপে চিহ্নিত।'

বক ঃ

বকের ছবি কলাপাতায় দেখা গেলে বাঘের ক্ষেত্রে যে সমস্ত উপকরণ লাগে তার সঙ্গে ৫টি কড়ি ও ঔষধপত্রের (জরিবুটি) যোগ করে পূজায় নিবেদন করা হয়। মন্ত্রোচ্চারণ করা হয় গণেশের উদ্দেশ্যে।

শৃগাল ঃ

জরিবুটি ছাড়া উপরোক্ত আর সবই প্রয়োজন হয়। মন্ত্র বা পূজার পদ্ধতি একই রকম।

সর্প ঃ

উপরোক্ত উপকরণের সঙ্গে সংযোজন হবে দূর্বা ঘাস। এখানে দূর্বাঘাসের বিশেষত্ব হ'ল পুরোনো কুয়োতে বা কোন গর্তের উপর থেকে দূর্বাঘাস নীচের দিকে ঝুলে রয়েছে এরকম দূর্বাঘাস প্রয়োজন হয়। পূজা পদ্ধতি একই। নিবেদন করা হয় তারকনাথের উদ্দেশ্যে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপরের চারটি প্রতীক-ছবি মঙ্গলের দৃষ্টিকোণ থেকে 'দেবী মূর্তি' প্রতীক ভাবনার থেকে গ্রাহ্যতা ক্রমঃ অনুসারে কম। ভিটাচুকা মন্ত্রের দৃষ্টান্ত ঃ

কালী মা, কালী মা
শ্মশান কালী মা
পওয়া কালী মা
ফন্যার ভিটার দোষ দুসি
ঠিক করিয়া নাখবু তুই
তোর মাখ ' * ' মুই
ফন্যার ' * ' ফন্নির।
মুই ফন্যার দিনু বন।[৪১]

(' * ' স্ত্রী জননাঙ্গের উল্লেখ ছিল।)

কলাপাতায় কাজলের ফোটায় কাক, ঘুঘু, প্যাঁচা ও গাছের (শ্যাওরা) প্রতীকী ছবি দেখা দিলে তা ক্রিয়াচারে দোষমুক্ত হয় বলে বিশ্বাস করা হয় এবং ঘর-বাড়ি নির্মাণে কোন অসুবিধা থাকে না বলে ধারণা করা হয়। পাঞ্জিয়ার এ বিষয়ে বিধান দিয়ে থাকেন।

নিয়ম-বিধান ঃ

উপকরণ ঃ

একটা নারকেল, ডাব, সোনা রূপার জল, লাল শালু, তিন নদীর জল, ঘি, মধু, প্রভৃতি। পাঞ্জিয়ার সোনা রূপার জল ও জরিবুটি মন্ত্রপুতঃ ক'রে একটি 'থুরিতে' (বাঁশের চোঙ্) ঢুকিয়ে লাল শালু দিয়ে থুরির মুখ বেঁধে বাড়ির 'হাড়িয়া কোণে' বা উত্তর-পশ্চিম কোণে পুঁতে রাখেন। এছাড়া তিন নদীর জল সংগ্রহ করে মন্ত্রপুতঃ করে বাড়ির চারদিকে ২৪ দিন ধরে (প্রতিদিন শোবার সময়) ছিটিয়ে দিতে বলেন পাঞ্জিয়ার।

চৌহর্দি বন ঃ

জমি শুদ্ধিকরণের কাজ শেষ হ'লে পাঞ্জিয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী গৃহস্থ বাড়ি তৈরির দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ শুরু করেন।

নতুন বাড়ির ক্ষেত্রে বাড়ির জমির চারকোণায় (চৌহর্দি) চারটি লম্বা বাঁশ কঞ্চি-পাতা সহ পুঁতে দেওয়া হয়। বিশ্বাস-বাঁশপাতাগুলি শুকিয়ে না গেলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। একখানা লম্বা পাটের দড়ির সাহায্যে ২০/২৫ ফুট উঁচুতে বাঁশে প্যাঁচ দিয়ে বাঁধা হয়। বাড়ির যে অংশে প্রবেশ পথ হবে সেখানে দড়িতে একটি বিশেষ গিট দেওয়ার নিয়ম আছে।

দড়ি বাঁধার সময় মন্ত্র ঃ

" দোয়া আয়তল কচুরী বন্দর ... করাং
বাইরে ... লয় লাহা ইল্লালোহু
মহম্মদ রচুবুল্লা আল্লাহু ..."[৪২]

বাড়ির চৌহর্দির বাঁশ পোঁতার ও দড়ি বাঁধার সময় মন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে চৌহর্দির মধ্যে 'বন' করে রাখা হয় বলে ধারণা। যাতে কোন অপদেবতা, পেত্তানী বা কোন শত্রু কোন রকম অমঙ্গলজনক কাজ করতে না পারে। চৌহর্দি বনের কয়েকদিনের মধ্যে পাটের দড়ি ছিঁড়ে পড়লো কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। যদি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে তাহলে মনে করা হয় যে, বাড়ির কোন অমঙ্গল সূচিত করে। অর্থাৎ বাড়ির মধ্যে দ্যাও, ভূত, পেত্তানী প্রভৃতি অপদেবতার দৃষ্টি পড়েছে। আবার দড়ি যদি উত্তর-পূর্বে ছিঁড়ে পরে বা দড়ি ছিঁড়ে না পড়লেও দড়িতে যদি মাকড়শা জাল বাঁধে তাহলে কিছু সংস্কারমূলক কাজ করে বাড়ি করা হয়। আর দড়ি যদি দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিঁড়ে পরে তাহলে বাড়ি করা অঙ্গলজনক হবে বলে লোকবিশ্বাস। ফলে সে জমিতে আর বাড়ি করা যাবে না ধরে নেওয়া হয়। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রেও পাঞ্জিয়ার সংস্কার পালনের বিধান দেন এবং বিধি পালনের পর কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়ি করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অবশ্য সম্ভব হ'লে গৃহস্থ অন্যত্র বাড়ি করেন।

বাড়ির জমি শুদ্ধিকরণ বা ভিটাচুকা সম্পর্কে ড. চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর 'দ্য রাজবংশীজ অফ্ নর্থবেঙ্গল' -এ অন্য একটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন — "The 'panjiar' fixes one auspicious day. In the evening four small bamboos poles (dzhati) are fixed vertically on the earth at four corners of the proposed side of the hut and a long pole (mulim poi) is fixed on one side of the place where the door of the hut (mokha) is to be made. A bow and an arrow, some paddy, dub grass, one pair of betel leaves, two green areca nuts in shell and a small mango twig with leaves

are wrapped in a piece of new cloth about a cubit long and half a cubit wide and all are tied at the top of this pole (mulim poi). Some rice or paddy and mustered seeds are placed at the bottom of this pole. A few male members of the family should sleep near the structure in that night. If in the next morning all are found undisturbed, the house building should commence. If any of the sleepers dreams that a house is burning, any animal falling into well, any cow giving birth to a calf, a man has died or if the articles are found disturbed in the morning, the house should not be built there."[৪৩]

রাজবংশীরা গৃহ-নির্মাণের কাজ শুরু করবার সময় সাধারণতঃ প্রথমে ভিটার ঘর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ভিটার চার কোণায় চারটি শক্ত গোঁজ বা বাতা পুঁতে দেওয়া হয়। লাইন সোজা রাখবার জন্য চার গোঁজের সঙ্গে দড়ি বাঁধা হয়। একে 'ঝাটি বাঁধা' বলা হয়। 'ঝাটি বাঁধার' কাজ সম্পন্ন হ'লে প্রথমে 'মুলিম পই' (Mulim poi) পুঁতে দেওয়া হয়। 'দোচালা' ঘরের ক্ষেত্রেই 'মুলিম পই' থাকে। এটি পোঁতানোর সময় কিছু রীতি পালন করা হয়। মন্ত্রের দৃষ্টান্ত —

"ওঁ নমঃ নমঃ শ্রী কৃষ্ণ কালীমায় নমঃ
পঞ্চকালী মায়ের ' * ' করিয়া ভর
গৃহস্থের উপর না করি ভর
কার্ত্তিক গণেশের মাথা খাবু
... ইত্যাদি।"[৪৪] (' * ' স্ত্রী যৌনাঙ্গের উল্লেখ ছিল।)

এরপর ঘরের উত্তর পূর্বের 'কোণা'র খুঁটি পোঁতার নিয়ম। বড় বাঁশের খুঁটির মাথায় 'খাম' কেটে নেওয়া হয়। কোনার খুঁটি পোঁতার সময়ও কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

বিধি পালনের উপকরণ ঃ

যেমন — লাল শালু, মাটির ঘট, সোনা রূপার জল, মধু, ধান, দূর্বা, পান-গুয়া প্রভৃতি। এছাড়াও প্রয়োজন হয় 'থুক্‌রা ধান' বা 'কইন্যা ধান'। 'কইন্যা ধান' আসলে 'বিচন' ক্ষেতের ধান। 'রোয়া' থেকে ধান হয়। 'রোয়া গাড়া'র সময় ক্ষেত থেকে বিচন তুলে নেওয়ার পরেও কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় বিচন ক্ষেত্রে ধার দিয়ে রয়ে যায়। সেই ফেলে রাখা বিচন থেকে যে ধান হয় তাকে 'থুক্‌রা' বা 'কইন্যা' ধান বলে। অবিবাহিত মেয়েদের রাজবংশীরা কইন্যা বলে। অ-রোপিত বিচনকে 'কইন্যা রূপে' কল্পনা করা হয়। উপরোক্ত উপকরণগুলির মধ্যে প্রথমে লাল শালু বাঁধা হয় খুঁটির

মাথায়। এরপর মাটির ঘট বেঁধে তার ভেতর সোনা রূপা ধোয়া জল, আম্র পল্লব, ধান প্রভৃতি দেওয়া হয়। বেঁধে দেওয়া হয় তীর ধনুক। কোণার খুঁটি পোঁতার সময় অর্থাৎ গর্ত খোড়া থেকে খুঁটি পোঁতা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে কৃতকর্ম সংঘটিত হয়।

জমির শুদ্ধিকরণ বা ভিটাচুকা, চৌহর্দি বাঁশ, মুলিম পই ও কোণের খুঁটি পোঁতার নিয়ম-রীতি পালন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হ'লে প্রাথমিক ভাবে পাঞ্জিয়ারের কাজ সমাপ্ত হয়।

রাজবংশী বাড়িকে চারটি অংশে বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন —

১) ভিতর বাড়ি বা ভিতর আঙ্গিনা।

২) খল্‌ত বাড়ি বা বাহির আঙ্গিনা।

৩) পাছিলা বাড়ি বা পাথার বাড়ি। এবং

৪) পাটা-আঙ্গিনা বা পাটাংগিনা।

উল্লেখ্য, পাথার বাড়ি বা পাছিলা বাড়িতে কোন ঘর থাকে না, বাড়ির অংশমাত্র। পাটা-আংঙ্গিনা সাধারণতঃ থাকতো সচ্ছল জমিদার, জোতদারের বাড়িতে। সাধারণের বাড়িতে মূলতঃ ভিতরবাড়ি ও খল্‌ত বাড়ি প্রাধান্য পায়।

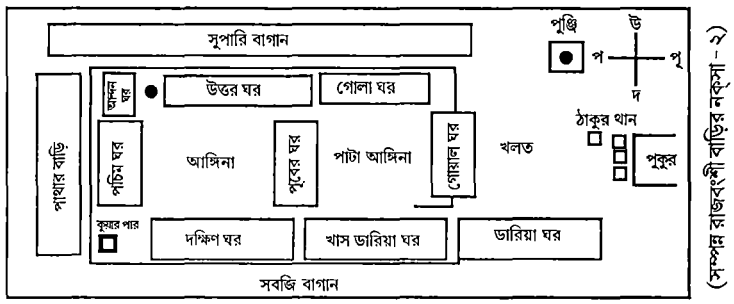

গঠন ও আকার অনুসারে ঘর সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয়। যেমন - চৌয়ারী ঘর, দোচালা ঘর ও খাপরা ঘর। এবং প্রতিটি ভিটার ঘরের আলাদা আলাদা নাম আছে। যেমন - 'বড়ঘর' বা 'বাসরঘর', 'বাস্তুঘর', 'ডারিঘর', 'আন্দনঘর', 'খোলাভাজা ঘর' প্রভৃতি।

ঘর তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম ঃ

- চৌয়ারি ঘর বা চহুরি ঘর নির্মাণে বড় বাঁশ, মাকলা বাঁশ প্রয়োজন হয়। রুয়ার জন্য প্রয়োজন মাক্‌লা বাঁশ।
- বড় বাঁশ দিয়ে ঘরের খুঁটি, ছেচা, কুকুয়া, ডাব ও বৈরাতি তৈরি হয়।
- মাক্‌লা বাঁশ দিয়ে সাধারণতঃ চাটি বসানোর 'খোওয়া' 'ডাব' ও 'বাতা' তৈরি হয়।
- ছিটকানির পাতির জন্য কচি মাক্‌লা বাঁশ বা মাক্‌লা বাঁশের 'ঢ্যামনা' প্রয়োজন হয়।
- চৌয়ারি ঘর তৈরি করতে ছাউনির জন্য মূলতঃ এলুয়া খড় প্রয়োজন। খড়ের দৈর্ঘ্য ১$^{১}/_{২}$ ফুট থেকে ২ ফুট মতো হয়।

- গর্ত খোড়ার জন্য বাঁশের ডাটের লোহার 'খন্তা' প্রয়োজন হয়। বাঁশের তৈরি ' থোরকো' দিয়ে ও গর্তের মাটি তোলা হয়।
- বাঁশ কাটা ও অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজন দাও, বাশিলা ও বাটালি।
- ঘর বাঁধার জন্য দড়ির সুতলি বা 'বাটি'র প্রয়োজন হয়।
- দড়ি বা সুতলি দিয়ে চাল বাঁধার সময় বাঁশের বাতার তৈরি 'ফোঁড়া' দরকার হয়।

চৌয়ারী ঘর ঃ

চারচালা বিশিষ্ট ঘর। মূলতঃ বাঁশ ও খড় দিয়ে নির্মাণ করা হয়। বাড়ির উত্তর দিকের ঘর 'মূলঘর' হিসাবে গণ্য করা হয়। উত্তরদিকের ঘরে একাংশে থাকে 'ধানের গোলা' এবং এই উত্তর ঘরেই থান দেওয়া হয় 'বাস্তু ঠাকুরের'। বাস্তু ঠাকুর বসানোর ক্ষেত্রে বিশেষ আচার অনুষ্ঠান পালন করার প্রচলন আছে। রাজবংশীদের 'ধানের শীষ আনা' লৌকিক ব্রতানুষ্ঠানে উত্তরের দিকের চৌয়ারী ঘরই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। বিবাহানুষ্ঠানে উত্তরের ঘরটি 'বাসরঘর' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একটি আদর্শ চৌয়ারী ঘরের দৈর্ঘ্য হয় ১৮ (আঠারো) হাত লম্বা।

চৌয়ারী ঘরের রুয়া বা উয়া-র হিসাব ঃ

১৮ হাত লম্বা ২টি চালের জন্য ৭ হাত লম্বা রুয়া বা 'উয়া-র প্রয়োজন হয় (১৯ + ১৯) = ৩৮ টি। এক একটি চালের জন্য ১৯টি। চান্দোয়ারির জন্য ১ + ১ = ২ টি সাত হাত লম্বা রুয়ার প্রয়োজন হয়। আর প্রতিটি চালের দুই কিনারে প্রয়োজন দু'টি করে মোট ২ x ৪ (চাল) = ৮টি বড় রুয়া। এগুলির প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৯ হাত হতে হবে, কারণ এগুলি চান্দোয়ারির দিকে থাকে। আর বিভিন্ন মাপের ছোট রুয়া লাগে মোট ১৬ টি (৪ x ৪)। যেগুলির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৬, ৫, ৪, ৩ হাত। সর্বমোট ৬৪টি রুয়ার প্রয়োজন হয়। যার মধ্যে ৭ হাত লম্বা ৩৮ + ২ = ৪০টি, ৯ হাতের ৮টি, আর ৬, ৫, ৪, ৩ হাত লম্বার ৪ x ৪ = ১৬টি উয়া প্রয়োজন হয়।[৪৫]

রুয়া তৈরির পদ্ধতি ঃ

রুয়া-র জন্য মাক্‌লা বাঁশের প্রয়োজন হয়। রুয়ার বাঁশগুলি মূলতঃ সরু ও খাটো হয়। প্রথমে বাঁশগুলি পরিষ্কার করে মাপ মতো কেটে টুকরো করা হয়। এবং ভালো করে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। কাঁচা বাঁশ দিয়ে ঘরের কাজ করলে 'রুয়া' বা 'বাতা'-র বন্ধন আলগা (হোসরপোসর) হয়ে যায় এবং রুয়া ও বাতা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই 'পুরোট' (Matured) মাক্‌লা বাঁশের প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয় ধাপে রুয়ার মাথার দিকে বাটালি দিয়ে ১ ইঞ্চি মাপের ছিদ্র বা খাঁজ কেটে নেওয়া হয়।

এরপর রুয়াগুলি সাজিয়ে প্রতি রুয়ার উপর ও নীচের দিকে একটি করে বাতা দিয়ে 'মুটোন' বা ১৪ ইঞ্চি ফাঁক বরাবর ১ জোড়া বাতাকে প্রত্যেকটি রুয়ার সঙ্গে শক্ত ক'রে বেঁধে দেওয়া হয়। একে 'সারোকবান' বা 'সারোক বাতার বান' বলে। 'সারোকবান' -এর কাজ সম্পন্ন হ'লে রুয়ার উপরদিকে আলাদা বাতা দিয়ে সারিবদ্ধভাবে চার আঙুল মাপের দূরত্বে সারি সারি সাজিয়ে ঘন করে 'কাঁচা ঢ্যামনা বাঁশের পাতি' বা কচি মাক্‌লা বাঁশের (কাঁচা) সরু পাতি দিয়ে উপর নীচ (এফোঁড় ওফোঁড়) করে আটকাতে হবে। একে 'ছিটকানি' করা বলে। এভাবে সবকটি চালের কাজ করাকে 'চালছিট্‌কানি' বলে।

'ঘরছান' বা ছাউনি' ঃ

ঘরছান বা ছাউনি করতে সাধারণতঃ যে 'খ্যাড়' বা 'খড়' ব্যবহৃত হয় তাকে স্থানীয় ভাষায় 'এলুয়া খ্যাড়' বলে। এলুয়া খড় ১/২ হাত লম্বা বিশিষ্ট হয়। ছিটকানির উপর এই খড় বিছিয়ে হাত বা 'ফাউরা' (বাঁশের) দিয়ে চাপড় মেরে ভাল করে বসানো হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে খড়ের উপর বাতা দিয়ে খড়ের নীচের চালের রুয়ার' সঙ্গে বাঁধা হয়। এরূপ খড় ও রুয়ার বন্ধনকে 'ব্যাদর' বলে। এক একটি চালে মোট ৮/১০ টি 'ব্যাদর' এর প্রয়োজন হয়। এরপর চাল খুঁটির উপর তোলা হয়।

প্রসঙ্গতঃ খড় বিছানোর আগে কোন কোন সময় প্রাথমিক ভাবে সমস্ত স্থানে এক প্রস্থ খড় বিছিয়ে পরে আবার খড় বিছানো হয় অর্থাৎ ২টি স্তরে খড় বিছানো হয়। প্রাথমিক স্তরে কাজটিকে 'আন্ধারি মারা' বলে। এতে চাল বাঁধার কাজটি বেশি শক্তপোক্ত হয়। এতে করে অতিবৃষ্টিতেও জল 'ওস্‌রে' বা 'চুইয়ে' পড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

মাড়োল ঃ

'খড়ের চাল' ঘরের খুঁটির উপর তোলার পর প্রত্যেক চালকে ঘরের খুঁটির উপর বসিয়ে 'মাড়োলের' থেকে এক হাত বাইরের দিকে বাড়িয়ে বাঁধা হয়। যে মাক্‌লা বাঁশের ডাব চালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী লাগানো হয় সেটিকে 'মাড়োল' বলে।

সর ঃ

'মাড়োল' দুটিকে আড়াআড়ি ভাবে যে বাঁশের ডাব দ্বারা টানা দিয়ে বাঁধা হয় তাকে 'সর' বলে।

টির ঃ

ঘরে চাল তোলার পর চাল খাড়া করে চালের ভেতর দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়ার জন্য

'টুহির' (টুই) ভেতরে যে বাঁশ (মাক্‌লা) লাগানো হয় তাকে 'টির' বলে।

টুহিমারা ঃ

চাল লাগানো হয়ে গেলে চালের উপর দিয়ে খড় বিছিয়ে দুই চালের জোড়া লাগানো হয়। একে টুহিমারা বা টুইমারা বলে।

খুঁটি ঃ

সাধারণতঃ বড় বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। এক একটি খুঁটির দৈর্ঘ্য ৭/৭১/২ হাত পর্যন্ত হয়। একটা চৌয়ারী ঘরের জন্য মোট ৮ + ৮ + ১ = ১৭ টি খুঁটির প্রয়োজন হয়। ঘরের জন্য ১৬টি আর দুয়ার বা দরজার জন্য একটি আলাদা খুঁটির প্রয়োজন হয়। একটি ঘরে একটিই মূল দরজা থাকে। এক একটি খুঁটি ২ হাত পর্যন্ত মাটির গর্তে পুঁতে দেওয়া হয়। আরও ১/১১/২ হাত উঁচু করে মাটি দিয়ে মেঝে পর্যন্ত 'কাইঞ্চা' বানানো হয়। ফলে ৩/৩১/২ হাত অংশ প্রতিটি খুঁটির মাটির নীচে থাকে। প্রত্যেক খুঁটির মাথার দিকে 'খাম' (খাঁজ) কাটা হয় যাতে 'মাড়োল' সহজে খসে না পড়ে।

ঝাইট ঃ

ঘরের মাপ অনুযায়ী 'বাটি' (পাটের সরু দড়ি) মাপ দিয়ে দড়ির চারকোণায় গিঁট দিয়ে 'খোপ' (ফাঁস) তৈরি করে গোঁজ বা বাতা ঢুকিয়ে দিয়ে মাটিতে পাতানো (setting) করা হয়। পরে মাপ অনুযায়ী গর্ত খুঁড়ে 'পই' (খুঁটি) পুঁততে হয়।

ঝাইট (Maesurement) নেওয়া হ'য়ে গেলে প্রথমে উত্তরপূর্বের কোণার খুঁটি নিয়ম অনুযায়ী পোঁতানোর পর অন্যান্য কোণার খুঁটিগুলি ১১/২ - ২ হাত খাল খুঁড়ে মাপ অনুযায়ী পোঁতানো হয়। এরপর যথাক্রমে 'মাড়োল', 'ধর্‌না' বা 'সড়' প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে বাঁধা হয়। বাতা, রুয়া প্রভৃতি দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে যে 'খাঁচা' তৈরি করা হয় তাকে 'পিঞ্জরা' বলে। চৌয়ারী ঘরের জন্য চারটি অর্থাৎ বড় চাল ২টি, চান্দোয়ারীর ২টি এবং দোচালা ঘরের জন্য ২টি চাল তৈরি করা হয়।

চোপা ও আন্ধারী মারা ঃ

রুয়া, বাতা ইত্যাদি দিয়ে ছিটকানি করে খড় দিয়ে ছান বা ছাউনি করার পূর্বে ছিটকানির উপর লম্বা কাশিয়া খড় দিয়ে 'কাবাড়ির' (structure) উপর 'চ্যালচ্যাল' (হালকা) করে বাতা দিয়ে বাঁধা হয়। যাতে এলুয়াখড় 'ছান' করার সময় নীচ দিয়ে গলে না পড়ে। একে 'আন্ধারী মারা' বলে।

তারপর উপরের দিকে অর্থাৎ টুহির দিকের অংশ বাদ দিয়ে চালের বাকি তিন দিকটায় রুয়া-বাতার গোড়া থেকে আরও ৪/৬ আঙুল মাপ বাড়িয়ে দিয়ে খাটো 'এলুয়া খড়' দিয়ে এক সারি বা

'ব্যাদর বান' দেওয়া হয়। এটাকে 'চোপা বান্ধা' বলা হয়। এরপর সারি সারি 'ব্যাদর' দিয়ে ছান বা ছাউনির কাজ সমাপ্ত করা হয়। খড় দিয়ে পুরো ঘরের চাল বাঁধাকে 'ছান করা' বা 'ঘর ছাউনি' বলে।

ছকরবন ঃ

রাজবংশী সমাজে ঘর-ছাউনির কাজ যারা করে তাদেরকে 'ছকর বন' বলে। একসময় এতদঞ্চলে খুব নামকরা 'ছকরবন' ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘরের কাজে এমন সুদক্ষ ছিলো যে খড়ের ঘর তৈরি কাজ সম্পন্ন হলে ঘরের চালের উপরাংশে (Surface) আগুন লাগিয়ে দিতো। তাতে চালের ছোট ছোট অতিরিক্ত (Extra) খড়গুলি আগুনে পুড়ে যেতো। কিন্তু ঘরে আগুন লাগতো না। এভাবেই সুদক্ষ 'ছকরবন' এর পরীক্ষা করা হ'ত।

নড় ঃ

চৌয়ারীঘরের চারটি চাল পৃথক পৃথক ভাবে তৈরি করে বানানো হয়। তারপরে ছাউনি করে ঘরের খুঁটিতে তোলা হয়। কখনো কখনো খুঁটিতে তুলেও ছাউনি কাজ করা হয়। পরে চারটি চাল জোড়া দেওয়া হয়। চারটি চালের জোড়ার স্থানে ১০''/১২'' প্রস্থ ও চালের রুয়ার মাপের দৈর্ঘ্যের যে অংশটি বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয় তাকে 'নড়' বলে। 'নড়' দু'টি চালকে সংযুক্ত করে।

টুহি ঃ

চালের উপরের অংশ যেখানে দুটি চাল সংযুক্ত হয়েছে তাকে টুই বা টুহি বলা হয়।

বেড়া তৈরির কাজ ঃ

ঘরের ছাউনির কাজ সমাপ্ত হলে বেড়া তৈরি করা হয়। বেড়া বা চটির জন্য প্রয়োজন হয় কুকুয়া, বাতা/কামি ছেচা, ধারা প্রভৃতি।

কুকুয়া ঃ

একটি পরিমাপ মতো বড় বাঁশ কেটে চার টুকরো করে দা দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর 'এক টাকর' বা মাপ মত দূরত্বে পরপর কতগুলি 'কানা' (ছিদ্র) করে নিতে হবে যাতে ছিদ্রের ভেতর দিয়ে একজোড়া করে বাতা বা কামি ঢুকতে পারে। এরপর কুকুয়ার নীচের অংশে 'গোঞ্জা' (সূচালো) করে নিতে হবে যাতে 'খাওয়ার' (খাপ) ভেতর ভালো করে কুকুয়াকে ঢোকানো (setting) যায়। এরপর ছিদ্রের ভেতর দিয়ে কামি ঢোকাতে হবে। এক একটি বাঁশে ৮টি করে কামি হয়। কুকুয়াতে বাতা ঢোকানোর পর ছেচা (বড় বাঁশের) পরপর ঢুকিয়ে বাঁশের 'ডিকালি' বা টুকরো

বাঁশ দিয়ে আঘাত করে চাপানো হয় যাতে চাটি শক্ত হয়। এরপর পই এর সঙ্গে 'বৈরাতি' ও তার উপর 'ডাব' এবং তার উপর 'খাওয়া' বসিয়ে (setting) পই (খুঁটির) সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিয়ে ঘরের চারদিক ঘিরে বেড়া লাগানো হয়।

ঝাপ ঃ

রাজবংশীরা দুয়ারকে 'ঝাপ' বলে। ঝাপ (Door) বাঁশের তৈরি করা হয়। বাঁশের তৈরি ধারা এবং বাঁশের কামি বাতা দিয়ে সুন্দর ও মজবুত দুয়ার তৈরি করা হয়। একটি ঘরে একটিই 'দুয়োর' বা 'ঝাপ' থাকে। সাধারণতঃ এক পাল্লার ঝাপ দেখা যায়। সম্পন্ন গৃহস্থদের কাঠের দরজাও ব্যবহার করতে দেখা যায়। বাঁশের তৈরি 'ঝাপ' লাগানো হয় একটি বাঁশের সঙ্গে। এটি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং একদিকে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা হয়। আবার অন্যরকম পদ্ধতিতেও ঝাঁপ তৈরি করা হয়, সেটি একদিকে খোলা থাকে। ঘরে কোন জানালা রাখা হয় না।

দোচালা ঘর ঃ

একটি ১৬ হাত দোচালা ঘরে ১৯ + ১৯ = ৩৮টি রুয়া লাগে। খুঁটির প্রয়োজন হয় ৭ + ৭=১৪ টি। ৭ হাত লম্বা চান্দোয়ারীর খুঁটি ১+১=২ টি মাঝে ১টি, মোট ৩টি খুঁটি, এগুলিকে মুলিমপই বলে। মুলিম পই ১০/১১ হাত লম্বা হয়। সর্বমোট ১৪+২+১=১৭ টি খুঁটির প্রয়োজন হয়। চান্দোয়ারির কোণা বন্ধ করবার জন্য সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মতো দুদিকে ২ খানা 'ফরফুরি' লাগাতে হয়। খড় দিয়ে ছান বা ছাউনি দেওয়ার কৌশল, ছিটকানী ও গঠন পদ্ধতি চৌয়ারী ঘরের মতো। এছাড়া অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস চৌয়ারী ঘরের মতোই প্রয়োজন হয়।[৪৬]

ডারিয়াঘর বা ডারি ঘর ঃ

ডারিঘর রাজবংশী বাড়ির 'খল্‌তো' বা বাইরের অংশে থাকে। রাজবংশী জীবনাচরণে ডারিঘরের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সারাদিনের ক্লান্তি জুড়িয়ে দেয় এই ডারিঘর। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি বিশ্রামঘর। এর গঠন প্রণালী বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এই ঘরে সর্বদা একটি চাংড়া পাতানো থাকে। সাধারণতঃ বাঁশ দিয়ে 'চাংড়া' তৈরি হয়।

কোন অতিথি বা আগন্তুক গৃহস্থের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলে প্রাথমিক ভাবে ডারিঘরে বসানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং অতিথির প্রাথমিক আপ্যায়ন ও অবসর বিনোদন এই ডারিঘরেই সম্পাদন করা হয়।

ডারিঘর চারচালা ও দোচালা যুক্ত হয়। গৃহস্থের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভর ক'রে নির্মিত হয় ছোট বা বড় আকারের ডারিঘর। ডারিঘর জোতদার, জমিদার ও সাধারণ প্রতিটি

বাড়িতেই নির্মাণ করা হত। এখনও গ্রামাঞ্চলে ডারিঘরের নির্মাণের প্রচলন আছে। তবে কখনো কখনো কয়েকটি পরিবার মিলে একটি যৌথ ডারিঘর নির্মাণ করতে দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যে অতীতে জোতদার, জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ডারিঘরে অবসর বিনোদনের ছলে সৃষ্টি হয়েছে নানা লোকগান, পালাটিয়া, বিষহরাগান, লোকনাটক যা লোকসংস্কৃতির অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছে।

গোলাঘর ঃ

রাজবংশীরা মূলতঃ কৃষিজীবী। তাই শস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় গোলা ঘরের। আদর্শ বাড়িতে গোলাঘর থাকে বাড়ির উত্তরের ঘরের পূর্বাংশে। তবে বাড়ির পশ্চিম দিকের ঘর ছাড়া অন্যান্য ঘরে কদাচিৎ গোলাঘর নির্মাণ করতে দেখা যায়। অতীতে বড় জোতদার, জমিদারের বাড়িতে পৃথক গোলা নির্মাণ করতে দেখা যেত। 'গোলার' আকার নির্ভর করে ধান ও শস্য উৎপাদনের উপর। কৃষক সারা বছরের খাবারের ধান ও বীজধান, কলাই, যব প্রভৃতি সংরক্ষণ করে এই 'গোলাঘরে'। চতুষ্কোণ অবয়ব বিশিষ্ট বাঁশের নির্মিত গোলাঘরের ভেতরের বেড়াতে গোবর মাটি লেপন করা হয়। মাটি থেকে প্রায় ১ - ১$^{১}/_{২}$ হাত উঁচু চাংড়া ক'রে ধানের গোলা নির্মাণ করা হয়। নীচের দিকে খোলা রাখাতে হওয়া চলাচল করতে পারে। ভেতরের দিকে উঁচুতে একটি ছোট্ট আকারের প্রবেশপথ থাকে 'গোলা'য় ঢুকবার জন্য। গোলার উপরের দিক্‌টাও খোলামেলা থাকে। ফলে ধান ও শস্যদানা নষ্ট হয় না। ধানের গোলা নির্মাণ, ধান ও শস্যবীজ সংরক্ষণ এতদঞ্চলের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। তাই এই সমাজের লোকসংস্কার ''ধানের ফুল আনা'' অনুষ্ঠানের পর বড়ঘরের (উত্তরের ঘর) ভেতরে ধানের গোলার পাশে 'বাস্তু ঠাকুরের থানে' ধানের শীষ বেঁধে রাখা হয়। বিশ্বাস, এ ধরনের লোকাচার পালন করলে ও শীষ বেঁধে রাখলে জমিতে ধানের উৎপাদন বেশি হয়, ধানের গোলা ভরা থাকে, সারা বছর সংসারে অভাব-অনটন থাকে না। বলাবাহুল্য, ধানের গোলা নির্মাণে লোকস্থাপত্যের কৌশল রাজবংশী লোকশিল্পের ঐতিহ্যময় প্রকাশ।

ভাড়ার শুদ্ধি ঃ

ফসল ঘরে তোলবার জন্য প্রথমেই ভাড়ার ঘর বা গোলা ঘরকে শুদ্ধি করার অনুষ্ঠান এতদঞ্চলে দেখা যায়। ভাড়ার শুদ্ধি করবার জন্য এতদঞ্চলে যে মন্ত্রটি পাঠ করা হয় তা ভাড়ার শুদ্ধি মন্ত্র নামে খ্যাত —

''বান্ধকোটি লক্ষ্মী তিপান্ন কোটি ধান
ধর্মে দিলেক টান
আংসাং মাং ধরিত্রী ছান্দি বান্ধ গোলা
ছামশুদ্ধি ভাড়ার পূর্ণ শুদ্ধি।''

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট, পৃ. ২৬৯ দ্রষ্টব্য)

পাক্‌ঘর বা আন্দনঘর ঃ

খনার বচনেও রান্নাঘর বাড়ির পশ্চিম দিকে তৈরি করবার কথা উল্লেখ আছে। রাজবংশী সমাজের গৃহনির্মাণের নিয়মানুসারে বাড়ির পশ্চিম দিকে 'পাকঘর' বা 'আন্দনঘর' নির্মাণ করা হয়। খড় ও বাঁশ দিয়েই তৈরি হয় দোচালা ঘর। সাধারণতঃ সামনের দিকে ছোট্ট বারান্দা থাকে। ভেতরের মেঝের অংশ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক দিকে থাকে 'আখা' বা উনুন আর অন্য অংশ খাওয়া-দাওয়া জন্য ব্যবহৃত হয়। 'আখা' সাধারণতঃ দক্ষিণের দিকের অংশে বা উত্তরের দিকের অংশে পূর্ব দিকে মুখ করে তৈরি করার রীতি। তিনটি ঝিক গেড়ে মাটির ছোট্ট টিলার মতন করে 'আখা' তৈরি করা হয়। উনুনের অংশটি বাঁশের 'হাঁদেলার বেড়া' দিয়ে পৃথক করা হয়। রান্নাঘরের এই অংশে যে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নিয়ম আচার মেনে রান্নার কাজ করা হয়। স্নান না করে কোন রমণী দুপুরের খাবার রান্নার জন্য 'আখা' জ্বালানোর কাজ করেন না। এমন্ কি বাইরের কোন কাজ করার পর মহিলারা রান্নাঘরে প্রবেশ করেন না। এই রীতি গ্রামাঞ্চলে এখনো মেনে চলতে দেখা যায়। সকালের খাবার প্রস্তুতের জন্য রান্নাঘরের অন্য অংশে বা বাইরের উনুন ব্যবহার করার নিয়ম। রান্নাঘর লেপে পরিষ্কার করা প্রতিদিনের কাজ। কোন কোন গৃহস্থ বাড়িতে রান্নাঘরের ভেতরের একাংশে বাঁশের খড়ি, 'সিন্ডা' বা পাটকাঠিপ্রভৃতি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। উনুনের বিপরীত অংশকে আংশালী বাড়ি বলে। আংশালি বাড়ির এক কোণে পাকনালী রাখা হ'ত। যাতে ভাতের মাড়, অপ্রয়োজনীয় জল ইত্যাদি পেছনের দিকে গর্তে বের করে দেওয়া যায়। বিষুমার দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন রান্নাঘরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বাঁশের তৈরি 'থোককো' উপর মাটির হাড়িতে 'কান্দির' জল রাখা হয়। লোকবিশ্বাস, বর্ষাকালে যখন আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় এবং বজ্রপাত ঘটে তখন বাড়ির চারদিকে এবং ঘরের চালে 'কান্দির' জল ছিটিয়ে দিলে বাড়িতে বা ঘরের উপর বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে না।

খোলাভাজা ঘর ঃ

বাড়ির চৌহর্দীর ভিতোর বাড়ি বা 'ভিতরা বাড়ি' বা 'ভিতর আগিনায়' কোন একটি সাধারণ অংশে একটি দোচালা ঘর তৈরি করা হয়। এই ঘরটি সাধারণতঃ ছামগাইনে (উদখোল) চিড়া ভাজার বিভিন্ন পর্যায়গুলি সম্পাদন করা হয়। সেজন্য এটি 'খোলাভাজা ঘর' নামে পরিচিত। চিড়াভাজা ছাড়াও এই ঘরে মুড়ি ভাজা, ধান সেদ্ধ, 'বাড়া ভুকা' বা ধান ভানা প্রভৃতি কাজও করা হয়। তবে শীতকালে আঙিনার কোণে পৃথক উনুনে ধান সেদ্ধ করতে দেখা যায়। অতীতে উনুনের আগুনকে কেন্দ্র করে বসতো বাড়ির রমণীদের আড্ডা, চলতো গল্প ও ছিল্‌কা ইত্যাদির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ।

কুয়ো বা পাইট্‌কা বা চুয়া ঃ

সাধারণতঃ বাড়ির দক্ষিণ-পূর্বে কুয়ো দেওয়ার রীতি নেই। লোকবিশ্বাস বাড়ির দক্ষিণ-পূর্বে

কুয়ো দিলে সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। আয়ের তুলনায় ব্যয় হয় বেশি। সাধারণতঃ বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিমে রান্নাঘরের সংলগ্ন কুয়ো দেওয়ার রীতি।

গোয়ালীঘর বা গোয়ালঘর ঃ

গোয়ালীঘর বাড়ির বাইরের অংশে বা খলতো বাড়ির একাংশে নির্মাণ করা হয়। দোচালা যুক্ত খড়ের চাল ও বাঁশের বেড়ার সাহায্যে নির্মাণ করা হয় গোয়ালঘর। ঘরের ভেতরের একাংশে ছোট্ট 'খোপরা' (খাঁচা) তৈরি করা হয় বাছুরগুলিকে পৃথক রাখবার জন্য। গরু, মোষ এক গোয়ালে রাখলেও ভেতরে পৃথক ভাবে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

খড়ের পুঁজি ঃ

খড়ের পুঁজি সাধারণতঃ 'খল্‌ত' বাড়ির উত্তর-পূর্বে থাকে। কখনো মাটি উঁচু করে একটি বাঁশকে ঘিরে খড় বা পোয়াল দিয়ে পুঁজি দেওয়া হয়। কখনো বাঁশের মাচা করে পুঁজি দেওয়া হয়।

সুল্‌কি ঃ

বাড়ির চারদিকের ভিটায় চারটি ঘর নির্মাণ করার ফলে দু'টি ঘরের মাঝখানে যে ফাঁকা অংশ থাকে তাকে 'সুলকি' বলে। এই সুলকির অংশে তৈরি করা হয় হাঁস রাখার ঘর। হাঁসের খাঁচাগুলি বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। এগুলি ৩/ ৩$^{১}/_{২}$ ফুট উচ্চতার গোলাকার বিশিষ্ট হয়। সুলকির উপরাংশে ঘরের চান্দোয়ারীতে 'পায়রার বাসা' বা 'পারোর ভাসা' ঝুলিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। পায়রার খোপ বা খাঁচাগুলি বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। এগুলিকে বলে 'ডগুরা'।

ঠাকুর বাড়ি বা ঠাকুর ঘর ঃ

বাড়ির বাইরের দিকে খল্‌ত বাড়ির আংশিক উত্তর-পূর্বে ছোট ছোট খড়ের ঘরে মাটির 'থাপনায়' ঠাকুরের থান দেওয়া হয়। উত্তরের দিকে দক্ষিণ মুখ করে বসানো হয় কালী ঠাকুরাণী, পূর্বদিকে থাকে মহাদেব ও চণ্ডীর থান। এবং পূর্বদিকেই পশ্চিমে মুখ করে যে ঘর সেটি রাজবংশী লোকায়ত সমাজের অন্যতম দেবী 'মনসার' থান। রাজবংশী জীবনাচরণে দেবী মনসা উচ্চ আসনে বিরাজ করেন। বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে দেবী-মনসা বা বিষহরা ঠাকুর ভক্তি ভরে পূজা দিয়ে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। বিশ্বাস, দেবী মনসা সন্তুষ্ট থাকলে গৃহে সুখ শান্তি বিরাজ করে, ধন-মান বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, বিবাহ বা অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে বিষহরার পালাগান হয়। এই গান কখনো ১ পহরিয়া থেকে শুরু করে ১২ পহরিয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই পালাগান গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও নতুন প্রজন্মের গীদালের অভাবে লোকসংস্কৃতির এই মূল্যবান সম্পদটি হারিয়ে যেতে বসেছে।

পুকুর ঃ

বাড়ির পূর্বদিকে পুকুর কাটা হয়। পুকুরে মাছ চাষ ও হাঁসপালন ছাড়াও পূর্ব দিকে পুকুর থাকা যে স্বাস্থ্যকর তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এতদঞ্চলের লোকেরা অতিথিপরায়ণ হন। হাঁস, পারো (পায়রা) প্রভৃতির মাংস দিয়ে বিশেষ অতিথি সেবা করা হয়। এছাড়াও রয়েছে পুকুরের মাছ। কোন কোন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে অতিথির সমাগম বেশি হয় বলে পুকুরের মাছ এক্ষেত্রে বিশেষ কাজে আসে।

পাথারবাড়ি/পাছিলাবাড়ি ঃ

রাজবংশী বাড়ির অপরিহার্য অংশ পাথারবাড়ি বা পাছিলাবাড়ি। এখানে কোন ঘর থাকে না। পাথারবাড়ির সীমান্তকে ঘিরে রাখে 'পাদ্দলা' (চাপ চেকার) এই পাথার বাড়িতে রাখা হয় খড়-কুটো, লাকড়ি, পাট কাঠি ইত্যাদি। তাছাড়া বাড়িকে বিভিন্ন দিক থেকে আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে পাছিলা বাড়িতে পাদ্দলা দেওয়া হয়। বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে বাঘ এবং অন্যান্য বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই কৌশল বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত। এছাড়া নারীদের দৈনন্দিন জীবনাচরণের ক্ষেত্রে পাছিলাবাড়ির বিশেষ ব্যবহার আছে।

তিস্তা ও তোর্ষাপারের বাঁশ সংস্কৃতি ঃ

এতদঞ্চলের মঙ্গোলীয় (Mongoloid) জনজীবন ধারায় বাঁশ নৃ-গোষ্ঠীয় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। বাঁশের তৈরি আসবারপত্র, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামগ্রী এবং বাঁশ পূজা ও লোকবিশ্বাস লোকায়ত ভাবনাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বোড়ো (Bodo), গারো, হাজং, রাভা, রাজবংশী, ইত্যাদি জাতি জনজাতির মধ্যে বাঁশ আসলে একটি 'চারণা' রূপে চিহ্নিত। যাকে বলতে পারি 'বাঁশ চারণা'। এতদঞ্চলে বাঁশ কখনো দেবতার প্রতীকরূপে চিহ্নিত। আবার কখনো বাঁশ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। লোকবিশ্বাস - বাঁশের ফুল ফুটলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা যায়। বাঁশের প্রতীকে মদনকাম দেবতা রাজবংশী ও হাজংদের মধ্যে প্রচলিত। বাঁশ এখানে উর্বরতাতন্ত্রে (Fertility Cult) -এর প্রতীক। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। বাঁশের গাজা বা কচি বাঁশ রান্না করে খাওয়ার রীতি উত্তর-পূর্বের বোড়ো, হাজং, রাজবংশী লোকজীবনে বহুল প্রচলিত ব্যঞ্জন। তিস্তা ও তোর্ষাপারের বাঁশের তরকারি নিয়ে তাই ধাঁধা পাওয়া যায় —

"চৈতে মাথে টুপি
দ্বাপরে মজাইল গুপি
রাবণ মৈল রামের হাতে
সেই তরকারি আমার পাতে।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট, পৃ. ২৭৬ দ্রষ্টব্য)

ঘর নিয়ে দেহতত্ত্ব বা মনশিক্ষা গানে পাই —

কত আসা করিয়া এ ঘর না বান্দিলুং
সুখেনা থাকিবার বাদে রে বিধি মোর
* সুখেনা থাকিবার বাদে।
মাকেলা বাঁশের চালের বাতা
ছয় হাত করিয়া দিলুং উয়া
বছরো ঘুরিসে নাড়িয়া দেখুনু তায়
তাকো না খাইসে ঘুনেরে
বিধি মোর —
তাকো না খাইসে ঘুনে।
ওই মতো — মানুষের দেহা গাও ঘসোং সাবানো দিয়া
সুন্দর দেহা কালানা পরিসে তাকে না খাইসে রোগে রে
বিধি মোর —
তাকো না খাইসে রোগে।[৪৭]

* ('সুখেনা' সদর্থক অর্থে ব্যবহৃত। সুখে = সুখেনা)

তিস্তা ও তোর্ষাপারের গ্রামীণ লোকায়ত জীবনে বাঁশের তৈরি আসবাবপত্রের প্রচলন তথা ব্যবহার আজও বহুলভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাস্তুশিল্পের কৌশলগত লোকপ্রযুক্তির ধারায় যা বিশেষভাবে মূল্যবান। এতদঞ্চলের সমাজ-জীবনে পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে লোকায়ত শিল্পকলার স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের সর্বোপরি লোকপ্রযুক্তির পরিবর্তন ও রূপান্তর স্বাভাবিক ভাবে ঘটে চলেছে। রাজবংশী সমাজের আদিকালের চৌয়ারী ঘর, দোচালায় রূপান্তরিত। দেশজরীতি ও কলাকৌশল অধিকার করে নিচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা। বাঁশের তৈরি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক যন্ত্র তথা বাস্তুশিল্পের উপকরণ নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী লোকায়ত সমাজে এখনও টিকে আছে। ওঝা, গুণিন, পাঞ্জিয়ারদের লোকায়ত বিচার বিশ্লেষণ বিশ্বায়নের যুগেও ধরে রেখেছে, যা এতদঞ্চলের লোকায়ত জীবন সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

গ) কৃষিজীবন ও লোকায়ত সংস্কৃতির নৈকট্য ঃ

আলোচ্য অঞ্চলে বৈশাখ থেকে শুরু করে চৈত্রমাস পর্যন্ত বৎসরের অধিকাংশ দিনই বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে কৃষি জীবনের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। বেশিরভাগ অনুষ্ঠান নাচ গান ইত্যাদি সহযোগে পালিত হয়। বিভিন্ন ছড়া, গান, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন প্রচলন রয়েছে সেগুলির লোকসাংস্কৃতিক ও লোকসাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট। মাস অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিচয় তুলে ধরা হল।

বৈশাখ মাস ঃ

পয়লা বৈশাখ বিষুয়া পার্বণ। পরিবারের কল্যাণ ও অশুভ শক্তির হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ উৎসব। ধান, চিড়ে, চালের ভুরভুরা, চাল ভাজার জাইয়া, সর্ষের ভাজি, শুকাতির ভাজি, (পাটপাতা), রসুন, পিয়াজ, আদা, হলুদ ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য বাড়ির কর্তা বা গৃহিনী একটি থালায় মেশান। পরিবারের প্রত্যেককে এর কিছু না কিছু খেতে হয়। ঐ দিনই কিছু পিঁয়াজ, আদা, রসুন এবং একুশ (২১) টি কাঁঠাল পাতা একসঙ্গে ঘরের খুঁটিতে বেঁধে দেওয়া হয়। ২০ টি পাতা বিষুয়ার এবং একটি পাতা সাক্ষী। ঐদিন থেকে তুলসীতলায় 'ঝরা' দেওয়া হয়। বিশ্বাস এতে দেবতা খুশি হয়।

তিস্তাবুড়িকে কেন্দ্র করে সারা বৈশাখ মাস লোকায়ত রমণীরা ছাতা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে এক বিশেষ ধরনের গান পরিবেশন করেন। নদী মাহাত্ম্য, বন্যাভীতি, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও বৃষ্টি কামনা তথা ফসল কামনায় এই পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে।

জ্যৈষ্ঠ মাস ঃ

জ্যৈষ্ঠ মাসের বারো তারিখের পর বীজতলার বীজ ধান ছড়ানো হয়। বীজতলায় (জ্যৈষ্ঠের বারো যত বুনতে পারো) বীজ ধান যে ঝুড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে, সে ঝুড়ি গোবর মাটি দিয়ে লেপে তেল সিঁদুর দিয়ে ধান নেওয়া হয়। ঐ ধানের উপর চারটি মাটির ঢেলা রাখা হয়। ধান ছিটানোর আগে এই ঢেলাগুলি গুঁড়ো করে ধানে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ধান বোনা হয়।

মূলতঃ দেশে দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে বৃষ্টির আশায় 'ব্যাঙের বিবাহ' অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিশ্বাস এই অনুষ্ঠান করলে শীঘ্রই পৃথিবীর বুকে বাদলের ধারা নেমে আসবে।

বসতবাড়ির পূর্বে ৫/৭ টি ছোট ছোট চালা বানিয়ে গ্রামঠাকুর বা গারামঠাকুর অধিষ্ঠিত করা হয়। যেকোনো শুভ অনুষ্ঠানের আগে গ্রামঠাকুর বা 'গারাম' ঠাকুর পূজা পেয়ে থাকে। 'গারামঠাকুর'

সন্তুষ্ট হলে রোগ ব্যাধি, বাঁধা বিঘ্ন দূর হয় এবং সমৃদ্ধি আসে।

আষাঢ় মাস ঃ

বৈশাখের শেষ সপ্তাহ থেকে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সময়ের যেকোনো দিন হুদুমদেও পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতদঞ্চলের কৃষিকর্ম প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই প্রকৃতির খামখোয়ালিপনার হাত থেকে কৃষিকর্মকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বৃষ্টি কামনায় এই পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে। বৃষ্টি না হলে গ্রামীণ কৃষক জীবনে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি গটতে পারে তারই আশঙ্কায় এই আচার। নারীকেই এই আচার পালন করতে হবে। কেননা, লোকায়ত বিশ্বাস নারী যেমন উর্বরা, তারই স্পর্শ এবং কামনায় ফসলের জমিও উর্বর হয়ে উঠবে।

আষাঢ় মাসে জল বসন্ত, গুটি বসন্ত রোগের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পাণি মুখারি পাতা ঝুলিয়ে রাখা হত ঘরে ঘরে। নিমপাতা বিছানায় পাতা হ'ত - যাতে করে এই সমস্ত রোগ ব্যাধি না হয়। এছাড়া চালের বাতায়, রুয়ায় পিয়াজ-রসুন প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য বেঁধে বা ঝুলিয়ে রাখা হয় যাতে শিশু-কিশোররা সর্দি-কাশি থেকে নিস্তার পায়।

শ্রাবণ মাস ঃ

একখণ্ড কর্দমাক্ত জমিতে একটি ডাব বা নারকেল নিয়ে লোকায়ত সমাজ এই খেলায় মেতে উঠে। এই খেলাটি কৃষি ও উর্বরতাতন্ত্রের সমার্থক বলে লোকসমাজ বিশ্বাস করে।

ভাদ্র মাস ঃ

বিষহরি ঠাকুর সন্তুষ্ট থাকলে চাষীর ফসল বাড়ে, গবাদি পশুর বৃদ্ধি ঘটে। অসন্তুষ্ট হলে শিশুরা মারা যায়, মানুষ ও গবাদি পশু সাপের কামড়ে মারা যায়। আতপচাল, কলা, দুধ, দই প্রভৃতি উপাচারে পূজা সম্পন্ন হয়। কেউ কেউ ছাগল বলি দেয়।

শস্যের জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টি কামনায় বিষ্টুঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়। দই, আতপচাল, মালভোগ কলা, চুড়া প্রভৃতি উপাচারে এই পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

কৃষিজাত ফসল নিয়ে সামাজিক সংস্কারের অনুষ্ঠান নষ্টচন্দ্র। যেখানে রাখাল বালকেরা অংশগ্রহণ করে।

আশ্বিন মাস ঃ

ভাণ্ডানী পূজার মধ্যদিয়ে ফসলের দেবীকে আবাহন করতে দেখা যায়। চোরচুন্নী ব্রত, যেখানে বাস্তব চোর ও চুন্নীকে নিয়ে এই গানের মহড়া দেওয়া হয়। কৃষিজাত ফসল রক্ষার উদ্দেশ্যে এইসব গৃহস্থকে গানের মাধ্যমে সতর্ক করা হয়। সামাজিক শুদ্ধতা বা সমাজ শোধন করা হয় বলে প্রচলিত লোকবিশ্বাস।

লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন ডিমা বা ডিম পূজা হয়ে থাকে। ডিমে প্রাণ থাকে। তাই বিশ্বাস ডিমা পূজা করলে ধনে বংশে গৃহস্থের সমৃদ্ধি আসে।

আশ্বিন মাসে গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন পালাটিয়া গানের আসর বসে। এই সমস্ত পালাটিয়া বা হোলি গানে সন্তান কামনা ও ফসল কামনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। অর্থাৎ যৌনতার প্রতীক বা Fertility Cult এইসমস্ত গানে দারুণ ভাবে উপজীব্য হয়ে উঠে। বিশেষতঃ এই সময় কালে যখন মাঠে রুপোলি ফসলের সম্ভার দেখা যায় তখন এইগানগুলি মানুষকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে।

যাত্রাপূজা বা হালযাত্রা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এখানে লাঙ্গল-জোয়ালের পূজা, উঠোন চাষ, গরুকে বাখর খাওয়ানো প্রভৃতি নিয়ম পালিত হয়, যাতে করে গরুর সারাবছর কোন রোগব্যাধি না হয়। পাশাপাশি কৃষক তথা কৃষির মঙ্গলকামনাও এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে করা হয়।

কার্ত্তিক মাস ঃ

কার্তিক ঠাকুর ব্রত বা কাতি পূজার মধ্যদিয়ে সন্তান কামনা করা হয়, আবার এইসময় জমির ফসলে ফুল আসে, তাই দেখে কৃষকের মনে ফুর্তি জাগে । আর এসবের মধ্যে সে সংসার গুছানোর দিকে ধ্যান দেয়, আসে সন্তান কামনা, অন্যদিকে জমিতে ফসল কামনা - অর্থাৎ নারী ও ভূমি - এই দুই ভাবনা সমার্থক হয়ে উঠে।

অগ্রহায়ণ মাস ঃ

পূর্বে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই বছর গণনা শুরু হত। মানুষের কাজের চাপ এসময় তুলনামূলক ভাবে কম। তাই বারোমাসের একটা তালিকা প্রস্তুত করা হত এসময়টাতে।

বপনঠাকুর অসন্তুষ্ট হলে ঝড়ঝঞ্ঝা হয়। শিল পড়ে, ফসলের ক্ষতি হয়। ফসল রক্ষার জন্য বপনঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়।

ফসল গোলাজাত করার আগে বুড়াবুড়ি পূজা হয়ে থাকে।

হৈমন্তী ফসল কাটার পর নয়া খাওয়া বা নবান খাওয়ার পার্বণ হয়। নতুন ধান, কলা, দই,ঘি, গুড় দিয়ে পূর্ব-পুরুষদের পূজা করা হয়। একে তর্পণ বলে। কখনো কখনো যজ্ঞও করতে দেখা যায়। জোতদার বাড়িতে পুরোহিত দিয়ে পূজা করেন এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করেন। দরিদ্র রাজবংশী নতুন চাল, দই ইত্যাদি কলাপাতায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

পৌষ মাস ঃ

পৌষ মাসে পিঠে পুলির অনুষ্ঠান যা পুষুনা নামে পরিচিত। পৌষ সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন ধানের পুঞ্জি বা স্তুপে পিঠে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, ধান মাড়াই এর কালে অধিক শস্য প্রাপ্তি ঘটে। এছাড়া পালাটিয়া, কুশান, দোতরাডাঙ্গা প্রভৃতি আসর এতদঞ্চলের লোকায়ত সমাজকে মুখর করে তোলে।

মাঘ মাস ঃ

শুধু তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলেই নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গের জুড়েই একদা ঘন জঙ্গল বেষ্টিত ছিল। পথে যাতে কানা বা ভুলাইয়া না ধরে এবং কোন বাঁধা বিঘ্ন না আসে সেইজন্য বিবাহের রাত্রে পাত্র বা পাত্রীর বাড়িতে ভ্যাড়াই চণ্ডীর পূজা দেওয়ার নিয়ম ছিল। বিশ্বাস, পাত্রপক্ষ যেন নিবিঘ্নে পাত্রীপক্ষের বাড়িতে পৌঁছতে পারে এবং নির্বিঘ্নে বিবাহ কাজটি সুসম্পন্ন করে নববধূকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে পারে।

তথ্যদাতার মতে, এই দেবীর পূজা না করলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই রাস্তায় যাতে ভুলাইয়া না ধরে এই বিশ্বাস থেকে এতদঞ্চলের কৃষিজীবী সমাজ এই পূজার আয়োজন করে থাকে। এই ভুলাই আসলে চণ্ডীরই একটি রূপ। একটি শ্লোকে পাই —

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ।। ৭৪ নমস্তস্যৈ ।। ৭৫ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৭৬"[৪৮]

ফাল্গুন মাস ঃ

ফাল্গুন মাসের তেরো তারিখে রাখাল ঠাকুরের পূজা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ রাখাল বালকেরা এই পূজার আয়োজন করে থাকে। বাড়ির নিকটবর্তী কোন স্থানে উঁচু করে থান তৈরি করে এবং থানে

রাখালের পেন্টি বা লাঠি পুঁতে দিয়ে দুধ, দই, কলা উপাচারে রাখালেরাই পূজা করে থাকে। তার আগে গরু মোষকে ভাল করে স্নান করিয়ে শিঙে তেল মালিশ করে থাকে। লোকবিশ্বাস, এতে পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি আসে এবং গবাদি পশু মড়কের হাত থেকে রক্ষা পায়।

গবাদি পশুকে শীতের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তেপথি বা চৌপথীতে গোবরের মধ্যে গোয়াল ঘরের ঝাড়ু ও দণ্ডকলসের পাতা পুঁতে পূজা সমাপন করা হয়; লোকবিশ্বাস প্রচণ্ড শীতের থেকে আপামর জনসাধারণ ও গবাদি পশুর রক্ষা হবে। ফাল্গুন মাসের তেরো তারিখে পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় বল এই অনুষ্ঠানটির নাম 'তেরেয়া'।

মানুষ ও গবাদি পশুর রোগ ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভের জন্য যখা পূজা হয়ে থাকে।

চৈত্র মাস ঃ

চৈত্র সংক্রান্তিতে গৃহস্থ বাড়িতে বারোখানা কচুপাতা কেটে এনে মেঝেতে পেতে জল দিয়ে রাখা হয়। বারোটা পাতা বারোমাসের নামে পাতা হয়। যে মাসে বেশি জল ধরবে বা বেশিক্ষণ জল থাকবে সেই মাসে বেশি বৃষ্টি হবে বলে একটা লোকায়ত সংস্কার লক্ষ্য করা যায়।

অন্যদিকে, চৈত্র সংক্রান্তিতে কান্দির জল তোলা থাকে। এটা অনেকটা Anti Biotic এর মতো কাজ করে। আগুন নেভানোর জন্য আধুনিক সমাজ হাইড্রোজেন ব্যবহার করে। কিন্তু এই অঞ্চলের কৃষিজীবী সমাজ তথা রাজবংশী সমাজ এই জল দিয়েই আগুন নিভায়। কান্দির জল প্রস্তুতি ও ব্যবহার সম্পর্কে গিরিজাশঙ্কর রায় বলেছেন — "রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের কতক কতক পরিবারে বিষুয়ার রাত্রে 'কান্দিরজল' প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা লইতে দেখা যায়। রাত্রে একটি মাটির পাত্রে ভাত রাখিয়া তাহাতে জল দেওয়া হয় এবং পাত্রটি তুলসী তলায় রাখিয়া দেওয়া হয়। তারপরের দুই দিনে ও রাতে পুরাতন জল বদলাইয়া পাত্রে নূতন জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। তিনরাত্রি তিনবার জল বদল হইলে পর চতুর্থ দিন পাত্রটি পূর্ব বা উত্তর ঘরের স্থানশ্রী ঠাকুরের দণ্ডে বাঁধিয়া রাখা হয়। বজ্রাহত মানুষের চোখে মুখে এই কান্দির জল ছিটাইয়া দিলে তিনি ভালো হইতে পারেন। গ্রামাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস বজ্রাহত মানুষকে লোকে স্পর্শ করিলে আহত মানুষটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া যান। তাই কেহ স্পর্শ করিবার পূর্বেই মুখে কান্দির জল ছিটাইলে তিনি বাঁচিয়া যান।"[৪৯]

ধান ও সংস্কৃতি ঃ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে আদিমতম সমাজ যখন শিকারজীবী অবস্থা থেকে কৃষিজীবী অবস্থায় রূপান্তরিত হল এবং ঝুমচাষের মতো স্থানান্তরিত কৃষি থেকে স্থায়ীভাবে চাষবাস শুরু করল তখনই

ধান সম্পর্কিত নানাতর লোকাচার, লোকবিশ্বাস মানুষের চিন্তা চেতনাকে সঞ্জীবিত করল। সৃষ্টি হল শস্যদেবতা, কৃষিদেবতা ও উর্বরতাতন্ত্রের নানাতর মিথ্ কথা তাই শিব কৃষির দেবতারূপে উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ কৃষি সম্পর্কিত ধ্যান ধারণার সূত্র ধরেই ধান সম্পর্কিত অনুভূতি তৈরি হয় প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থায় স্তরে।[৫০] তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গই কৃষি প্রধান অঞ্চল। এতদঞ্চলে বিশেষতঃ রাজবংশী সমাজে ধান চাষই মুখ্য। ধান চাষ প্রধানতঃ দুই প্রকারের হয়। যথা — 'হেমতি ধান' ও 'ভাদই ধান'। বর্তমানে ভাদই ধান চাষ খুবই কম বা হয় না বললেই চলে। এতদঞ্চলে 'হেমতি ধান' চাষই মুখ্য। আর এই ধান চাষকে কেন্দ্র করে নানা আচার-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আর এই আচার অনুষ্ঠান শুধুমাত্র রাজবংশী সমাজের লোকবিশ্বাস মাত্র নয়, প্রচ্ছন্ন রয়েছে বিজ্ঞান মনস্কতার স্পষ্ট ছাপ। যদিও সরল মনস্ক রাজবংশী সমাজের মানুষের বিশ্বাস 'হাল কৃষি' মা-লক্ষ্মীর কৃপা। তাই দেবীর কৃপা বঞ্চনার ভয়ে এই আচার অনুষ্ঠান যুগ যুগ ধরে আজও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত এবং তার ধারা প্রবহবান। ভয় থেকে যার শুরু বিজ্ঞান তার পরিণতি। রাজবংশী সমাজের 'হেমতি ধান' চাষাবাদের নিয়মনীতিগুলি বর্তমান নিবন্ধে আলোচনা করা হল।

'আমন ধান' তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের প্রধান ফসল যা 'হেমতি ধান' নামে প্রচলিত। হেমন্ত কাল থেকে 'হেমতি' শব্দ প্রচলিত বলে আমাদের মনে হয়। তাছাড়া বর্ষাকালে ধানের চারা রোপণ করে, হেমন্ত কালে সেই ধান কাটা হয় এবং ফসল ঘরে তোলা হয় — সেজন্যও নামকরণ 'হেমতি' হতে পারে। বলাবাহুল্য, 'আমনধান' বা ' হেমতিধান' নির্দিষ্ট কোনো ধানের নাম নয়। কতকগুলি ধানের প্রজাতির সমষ্টিগত নাম। এতদঞ্চলের যে সমস্ত ধান উৎপাদন হয়ে থাকে তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। বর্ষাকাল থেকে হেমন্তকাল পর্যন্ত রোপণ থেকে ছেদন; এই পর্বের ধান চাষকে কেন্দ্র করে কৃষিজীবী রাজবংশী সমাজে চলে নানান আচার-নিয়ম-অনুষ্ঠান। এতদঞ্চলের লোকায়ত সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে —

আষাঢ় আইসে ফাসার ফাসার
শ্রাবণ যায় ধায়া
ভাদোর মাসের তেরদিন গেইলে
চাষা থাকে চায়-য়া।

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট, পৃ. ২৮১ দ্রষ্টব্য)

গোচরগুনা/গচিবুনা ঃ

চাষাবাদের প্রথম রীতি। সাধারণতঃ আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসের রথ যাত্রায় বা ভালো কোনো দিনক্ষণ দেখে এই নিয়ম পালন করা হয়। কৃষি পরিবারের কোনো সদস্য সেদিন উপোস থেকে এই আচারটি পালন করে থাকে। দুপুরের আগে স্নান সেরে ধৌত বস্ত্র পরিধান করে পূজার উপকরণ হিসেবে একটি শিকড়সহ কলা গাছ, একটি পাট গাছ, একটি কালো কচুর গাছ, কাঁচা গো দুগ্ধ, আতপ

চাল, চিনি, কলা, ধূপ, ধুনা, কলাপাতা, কলা গাছের 'ডোঙ্গল' এবং বীজ তলা থেকে একমুঠো 'ন্যালচা বিচন' (বীজতলায় ছিটানো ধান থেকে উৎপন্ন বীজ ধান) সংগ্রহ করে।

এই বিচনের নানাতর পর্ব আছে যেমন - ভুটকা, দোপাতারি, পুরাট, গাইঠা বিচন প্রভৃতি। পুরাট বিচন ধান চাষের উপযুক্ত এবং গাইঠা বিচনে ধানের ফলন কম হয়। এছাড়াও 'পোতা বিচন, জালা বিচন, নেকনেকা বিচন, কাইনা বিচন দিয়েও ধান রোপণ করা যেতে পারে।

'কাদো বাড়ি' (বীজ ধানের চারা লাগানোর জন্য তৈরি জমি) গিয়ে প্রথমে জমির এক কোণে শিকড়সহ কলা গাছ কচু গাছ, পাট গাছ পুঁতে দিয়ে, হাতপা ধুয়ে, দুধ কলা আতপ চালের নৈবেদ্য কলাপাতা ডোঙলে পরিবেশন করে ধূপ ধুনা সহযোগে উৎসর্গ করে। প্রথমে বাম হাতে তিন বার/পাঁচবার/সাতবার ডান থেকে বায়ে এবং পরে ডান হাতে বাম থেকে ডানে ধান চারা রোপণ করবে। তারপর প্রসাদ বিতরণ করে বাড়ি ফিরে দু'চারজনকে ডেকে দুধ-ভাত-কাঁঠাল খেয়ে উপোস ভঙ্গ করে।

'গো-চর-গুনা' শব্দটি 'গো' অর্থাৎ গোরু এবং 'চর' অর্থাৎ চারণ; গোচারণ ভূমি। গরু থেকে গোবর আর গোবর হল উৎকৃষ্ট সার যা ভূমিকে উর্বর করে তোলে। তাই সেই উর্বর জমিতে বা গোচর ভূমিতে মৌসমের প্রথম ধান্যরোপণ অনুষ্ঠান মা-লক্ষ্মীকে বরণ করা ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে।

ধীরে ধীরে ধান গাছ বড় হয়ে উঠলে ধান সম্পর্কিত নানা মিথ্ মানুষের মনকে নাড়া দেয়। রাজবংশী সমাজের বিশ্বাস প্রায় পঞ্চাশ দিন পরে ধান গাছ পূর্ণ যৌবনবতী হয়ে উঠে যা 'ঢেমা ধান' নামে পরিচিত। ধান গাছ ঢেমা অবস্থার পরে ধীরে ধীরে গর্ভবতী হয় তখন শেয়াল বলে - ' ঢেম ঢেম খাটিয়া' তারপর ধীরে ধীরে ধান পাকতে থাকে। তখন আবার ধানের খেতে শেয়াল এসে বলে - 'পাক্ পাক্ মাটিয়া'।[৫১]

পাঁচখেল বাতি ও ভোগা দেওয়া ঃ

'চালতার' পাঁচটি খোল রাজবংশী প্রচলিত কথ্য ভাষায় 'পাঁচখোল' বা পাঁচটি খোলের সমাহার। একটি বাঁশের কঞ্চি ৩/৪ ফুট উচ্চতার একদিক একটু দা দিয়ে ফাটিয়ে অগ্রভাগ সূচালো করে চালতার দুটি খোল সেই সূচালো কঞ্চির অগ্রে প্রতিস্থাপন করে তাতে সর্ষের তেল এবং সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়।

১৯/২০ ইঞ্চি পাট শোলার নিম্ন ভাগে সূচালো করে অগ্রভাগের ৭/৮ ইঞ্চি পাটের আঁশ জড়িয়ে তাতে ঘরে তৈরি ঘি মেখে তৈরি হয় ভোগা।

কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন ভর-সন্ধ্যায় দুধ, কলা, চিনি এবং আতপ চালের নৈবেদ্য তুলসি তলায় নিবেদন করে বাড়ির দরজার সামনে, পিছনের রাস্তা, গোয়ালঘর, ধানের ক্ষেতে ভোগা ও 'পাঁচখেল' বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং চিৎকার করে বলা হয় —

ক) গোয়াল ঘরের সামনে —

সগারে গরু পড়ে আর মরে
আমার গরু উঠিয়া দৌড় মারে।

খ) ধান ক্ষেতের সামনে —

*কাতি গছার নোহার ডাং
ছোটোয় বড়য় একসমান
একসমান।
(*কার্ত্তিক মাসে দেওয়া হয় বলে কাতিগছা, গছা - বাতি)
নাউরা ধানের কাউরা শীষ
একে শীষে বারো বিশ, বারো বিশ।
সগারে ধান আউল ঝাউল
আমার ধান মলিকায় চাউল।

কার্ত্তিক মাসে ধান গাছ থেকে ধানের 'দুধ শীষ' বের হয়। এ সময় ধান ক্ষেতে পোকার খুব উপদ্রব শুরু হয়। নিয়ম নীতির এই 'পাঁচখোল বাতি' ও ' ভোগার' জ্বলন্ত আগুনে কীট পতঙ্গগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা যায়, ফলে কৃষকের ফসল রক্ষা হয়। এটাই এতদঞ্চলের লোকায়ত বিশ্বাস।

আগ নেওয়া ঃ

অগ্রহায়ণ মাসে ধান পেকে স্বর্ণালী রং ধারণ করে। এবার কৃষকের ঘরে ধান তোলার পালা। ধান কাটার শুরুর উৎসব 'আগনেওয়া'। এই 'আগনেওয়া' যেন নবান্নেরই প্রস্তুতি।

একটি ঝক্‌ঝকে কাঁসার থালার উপরে কলাপাতার অগ্রভাগ কেটে বিছানো হয়, তার উপরে একটি পরিষ্কার কাস্তে, একটি 'ষোলটিয়া' কলার কাঁদি, সিঁদুর মাখানো 'কলার থাতি' বসানো হয়। এছাড়া ধূপ, ধুনা, দুধ, কলা, চিনি, বাতাসা, আতপচাল, কলাপাতা, কলার ডোঙল (নৈবেদ্য সাজানোর জন্য), শোলার একজোড়া ভোপল ফুল, দুটি লাল শালুক কাপড়ের নিশান বা ধ্বজা পূজার উপকরণ হিসেবে রাখা হয়।

সামগ্রীগুলো নিয়ে কৃষক পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য ধানক্ষেতে যাবে। ক্ষেতের এককোণে বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম বা উত্তর পূর্ব কোণে 'লাল নিশান' দুটি পুঁতে দিয়ে 'দু'থোপ' ধান গাছ্ শোলার ভোপল ফুল দিয়ে বেঁধে দেবে। দুধ কলা আতপ চালের নৈবেদ্য ভক্তি সহযোগে নিবেদন করে প্রথমে বাঁ হাতে কাস্তে নিয়ে ডান হাতে ভোপল ফুলসহ ধানের শীষ মুষ্টি করে কাটবে এবং কাঁসার থালায় রাখবে। অনুরূপ ভাবে এবার ডান হাতে কাস্তে নিয়ে বাঁ হাতে ধানের 'থোপে'র শীষ কেটে থালায় রাখবে। এরপর প্রণাম করে ধানের শীষের থালা মাথায় নিয়ে বাড়ির পূর্ব কিংবা উত্তরের

গোলা ঘরের সামনে দাঁড়াবে। বাড়ির বৌ-ঝি, মহিলারা ঘরের চালে জল ঢেলে দিবে এবং উলু দিতে থাকবে। চালের জল মাথায় নিয়ে ধানের শীষের থালা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে গোলার সামনে রাখবে এবং প্রণাম করে ঘর থেকে বের হবে।

লাল সিঁদুর, লাল শালুক অর্থাৎ লাল রং উর্বরতার প্রতীক। ধ্বজা বা নিশান - বৌদ্ধ ধর্ম ও বিশ্বাস জাত। যাইহোক, উর্বরতাতন্ত্রের প্রতীক 'আগনেওয়া' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সৃষ্টিকেই যেন আহ্বান করা হয় — "গোলা ভরা ধান — তুমি প্রতি বছর আমার গোলায় এসো।"

ধানে ফুল আসার পর ধীরে ধীরে পেকে যায় এবং কেটে ফেলা হয়। লোকায়ত বিশ্বাস অনুসারে তখন রাত্রে আবার শেয়াল ধান ক্ষেতের মাঠে বেরিয়ে এসে বলে - 'খাটিয়া ঠক্ ঠক্'।[৪৯]

খ্যাত বাড়ানি ধান ঃ

কৃষকের যেদিন মাঠের সমস্ত ধান কাটা শেষ হয়, সেদিন ক্ষেতে ধানের শেষ 'পাই' এর অল্প একটু ধান গাছসহ মাঠে রেখে আসে এবং তা যে বলদ দুটি ধান উৎপাদনে কৃষককে সাহায্য করেছিল সেই হালের গরু দুটিকে খেতে দেওয়া হয়।

ক্ষেতের শেষ ধান গরুকে দিয়ে খাওয়ানোর যে অনুষ্ঠান তাই হল 'খ্যাত বাড়ানি ধান'। এই সংস্কৃতির মধ্যে আমরা খুঁজে পাই কৃষকের মমত্ববোধ। যে হালের গরু কৃষককে হেমতি ধান উৎপাদনে শ্রম দিল, কৃষকের সম্বৎসরের পেটের ভাতের যোগান দিল, তাতে অবলা পশু দুটিরও যে দাবি আছে কৃষক তা যেন স্বীকার করে নেয় — "তোমার অংশ তুমি নাও।"

আগ ধান ঘর নেওয়া ঃ

নতুন ধান মাড়ইয়ের পর গোলায় তোলার যে নিয়ম তাই 'আগ ধান ঘর নেওয়া' অনুষ্ঠান নামে পরিচিত। প্রথম মাড়ইয়ের ধান জড়ো করে গোবর জল দিয়ে চার দিকে গোল করে গণ্ডি কাটা হয়। গোলাকার একটি পাথর কাঁচা গোবর দিয়ে লাড্ডু আকৃতি করে সেই 'ভিতিরা শিল উপুরা ছান' এ নয় টুকরো কাঁচা হলুদ, নয়টি নতুন ধানের চাল (হাতের তালুতে ধান কচ্‌লে তৈরি), নয়টি দূর্বা ঘাস এঁটে দিয়ে ধানের টিবির উপর স্থাপন করে প্রদীপ জ্বালানো হয়। কৃষকের বাড়ির কোনো ৮/১০ বছরের ছেলের কাঁধে একটি লাঠি মাথায় দু'দিকে দুটি 'পোয়ালের ভোতা' (যা খড় দিয়ে বানানো) এবং মাথায় একটি 'ভোতা' দিয়ে ধানের টিবির চারদিকে সাতবার ঘুরবে। প্রতিবার ঘুরবার সময় বাড়ির বৃদ্ধ মানুষটি একটি পাটকাঠি দিয়ে বালকটিকে স্পর্শ করবে। সপ্তম অর্থাৎ শেষবার প্রদক্ষিণ শেষে বালকটি পাটকাঠি স্পর্শ মাত্র দৌড়ে গিয়ে ভোতা তিনটি গোবরের গাদায় রেখে প্রণাম করে ফিরে আসবে।

সেই অবসরে জড়ো করা মারাই থেকে বাড়ির গৃহিনী অর্থাৎ 'গিত্যানি' এক নিকাশে (নিঃশ্বাসে)

এবং এক হ্যাচকায় যতগুলো সম্ভব ধান 'চ্যালা' বা কুলোয় নিয়ে গোলা ঘরে রাখবে।

নয়া খাওয়া ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে রাজবংশী জনসমাজে হেমতি ধান পর্বের শেষ অনুষ্ঠান 'নয়া খাওয়া'। সেদিন প্রথমে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ, প্রচলিত কথায় 'শারাত্' করা হয়; তারপর গৃহদেবতা - তুলসি ধাম, ঠাকুর ঘর, 'থানের ঠাকুর'কে নিবেদন করা হয়।

এরপর গৃহকর্তা 'হালুয়া কামলা', পাড়া-প্রতিবেশি, আত্মীয়-পরিজন সবাইকে নিয়ে নতুন ধানের চাউলের ভাত, নতুন শীত লাউ, মাছ ইত্যাদি সহযোগে বাড়ির উঠোনে 'নয়া খাওয়া' সমাপ্ত করেন।

রাজবংশী কৃষি সমাজে ধান হচ্ছে ধন। তাই লক্ষ্মীর হাতে সোনালী ধানের গোছা, পায়ের কাছে লক্ষ্মী প্যাঁচা যে ইঁদুর খেয়ে কৃষকের ধান-ধন বাঁচায়। প্রাচীন রাজবংশী সমাজ হয়তো বুঝেছিল এইভাবেই বাস্তুতন্ত্র রক্ষা হয়। প্যাঁচা ইঁদুর খেয়ে কৃষকের উপকার করে, ফিঙে, বক ইত্যাদি পাখি পোকা-মাকড় খেয়ে কৃষকের উপকার করে এ ধারণায় এই অঞ্চলের কৃষকেরা ধানের ক্ষেতে পুঁতে দেয় বাঁশের আগা বা 'আগালি'।

কৃষি নির্ভর লোকায়ত সমাজে ধান চাষ অন্যতম প্রক্রিয়া। চাষের জমি তৈরি, বীজবপণ, হলকর্ষণ ইত্যাদি নানা ক্রিয়াচারের মধ্যদিয়ে ধান্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে লোকায়ত ঐতিহ্য সম্পৃক্ত হয়ে আছে। ভারতে বেশিরভাগ জনগোষ্ঠী কৃষিসূত্রে মাতৃতান্ত্রিক ধারার অনুবর্তী হয়ে উঠেছিল। যে জন্য কৃষি অভিজ্ঞানে লোকায়ত মানসে জন্ম নিয়েছে ধান্য উপাসনা। যার সঙ্গে উর্বরতাতন্ত্রের যোগ অত্যন্ত গভীর। ধান কৃষি ফসলরূপে জাদু ক্রিয়াচারে রূপান্তরিত হয়েছে একটি বিশেষ মোটিফ -এ।[৫৩] ব্রত উপাসনায় তার প্রয়োগ লক্ষণীয়। অর্থাৎ ধান শুধুমাত্র কৃষিজাত ফসল নয়, যাইহোক, তিস্তা ও তোর্ষাপারের কৃষিজীবী সমাজে কৃষিজীবনের জন্য প্রচলিত ধান্য উৎপাদন পর্বে এতদঞ্চলের লোকায়ত বিশ্বাস ও ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে, তা বললে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি হয় না।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজ। রাজবংশী সমাজের লোকসংস্কার-লোকবিশ্বাস এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই জনসমাজ নানা ধরনের লোকসংস্কার-লোকবিশ্বাস তাদের প্রাত্যহিক জীবনে মেনে চলে। অন্যদিকে, একটি সংগঠিত জনগোষ্ঠী যখন বিশেষ আচার-আচরণ ও লোকাচারকে কর্তব্য-অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে তখন তাই হয়ে দাঁড়ায় লোকবিশ্বাস। যার সঙ্গে অবশ্যই শুভাশুভ

বোধ জড়িত থাকে। লোকবিশ্বাসের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে কার্ভেথ রীড বলেছেন — 'Superstition' means in common use false beliefs concerning supernatural powers, especially such as are regarded as socially injurious and particulars as leading to obscuranitism or cruelty. 'Superstition', then, is here used merely as a collective term for the subject ... Magic (or the belief in occult forces) and Animism (or the belief in the activity of spirits)[৫৪] ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন — "লোকবিশ্বাস ও সংস্কার হল এক ধরনের প্রত্যয়।"[৫৫] এই প্রত্যয় আসে মানুষের দুর্বল মানসিকতা, অনিশ্চয়তার আশঙ্কা, শুভ-অশুভ বোধ থেকে যা প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে লোক সাধারণ মেনে চলেন।

পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো রাজবংশী সম্প্রদায়েরও কিছু নিজস্ব লোকবিশ্বাস আছে। যা তাদের যাপিত জীবন-প্রণালীর অন্যতম অংশ, তাদের জীবন দর্শনেরও সঙ্গে যুক্ত। রাজবংশী সমাজে জীবনের প্রধান তিনটি পর্বেই (জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ) লোকবিশ্বাস প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। রাজবংশী সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করে বিবাহিতা রমণীদের গর্ভকালীন সময়ে একা বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ। এতে গর্ভবতী রমণীর অমঙ্গল হয়। যদি কোন রমণী এই সময়ে বিশেষ করে শনিবার, মঙ্গলবার কিংবা অমাবস্যার দিন কিংবা দুপুরবেলা ও সন্ধ্যাবেলা বাড়ির বাইরে যান তাহলে বাও-বাতাস, উপড়া-ফাপড়ার (এক্ষেত্রে বুঝতে হবে ভূত-পেত্নী) দোষ ধরতে পারে। ফলে গর্ভের সন্তান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি কোন গর্ভবতী রমণী ঐ সময়ে বাড়ির বাইরে যানও তাহলে গায়ে ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি দেওয়ার নিয়ম এবং সারা গায়ে থুথু ছিটিয়ে দেওয়ার নিয়ম এবং এই পর্ব সমাপ্ত হলে তবেই বাড়ির ভিতর ঢুকতে পারবে।

সন্তান জন্মের পর তার সুরক্ষার জন্য প্রথম পাঁচদিন বাইরে টায়ার পুড়িয়ে (সাইকেলের টায়ার) রাখা হয়। উদ্দেশ্য টায়ারের পোড়া গন্ধে ভূত-পেত্নী পাশে ঘেঁষতে পারবে না। কখনো বা মা ও নবজাতক যে ঘরে থাকে সেই ঘরের দুয়ারে কোন মরা জন্তুর (গরুর) হাড় ঝুলিয়ে রাখা হয় ঐ একই উদ্দেশ্য।

রাজবংশী সমাজের বিবাহ বিষয়ে নানা বিশ্বাস প্রচলিত। মেয়ে বা ছেলে দেখতে গেলে দু-জন বা চারজন অর্থাৎ জোড়া সংখ্যায় যেতে হয়, তিনজন বা পাঁচ জন যাওয়া নিষেধ। তার পর মেয়ে বা ছেলে দেখা হলে তিন দিন শুভাশুভ দেখা হয়। যদি ঐ সময়ে মেয়ে বা ছেলেপক্ষে কোন অশুভ (মৃত্যু, দুর্ঘটনা) ঘটে তবে উভয় পক্ষের কাছেই তা অমঙ্গলের। তাই সেখানে আর বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এছাড়া জন্মবারে বিয়ে যেমন হয় না তেমনি জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়ে হয় না। আবার চৈত্র মাসে বিয়ের রেওয়াজ নেই রাজবংশী সমাজে। বিয়ের পর নতুন বৌকে শ্বশুর বাড়িতে এসে

গোয়াল ঘরের গরুর গোবর পরিষ্কার করতে হয়। বিয়ের গানে পাই "অমুকের বাড়ির বান্দি/ছান ফেলাইতে দেখা যাবে মাথারও চান্দি।" রাজবংশী সমাজে অপর একটি লোকবিশ্বাস হল বিয়ের দিন বৃষ্টি হলে নবদম্পতি সুখে থাকে।

রাজবংশী সমাজে মৃত্যু বিষয়েও নানা বিশ্বাস প্রচলিত আছে। মৃত দেহ শ্মশানে সৎকার শেষে মাটিতে 'ঢেরাদাগ' ('X' চিহ্ন) দিতে হয়। উদ্দেশ্য, সদ্য মৃত মানুষটির প্রেতাত্মা যেন বাড়ির দিকে ফিরে না আসে। তাতে বাড়ির অমঙ্গল হয়। শ্রাদ্ধের দিন রাত্রে কুলোয় বা থালাতে আটা রেখে সেটা ঘরের উত্তর দিকে রাখতে হয়। যদি তাতে ছাপ্ (হাতের বা পায়ের) পড়ে তাহলে মনে করা হয় মৃতের আত্মা স্বর্গে গেছে।

গ্রামীণ রাজবংশী লোকেরা বেশির ভাগই কৃষিজীবী। কৃষি নির্ভর লোকজীবন স্বভাবতই প্রকৃতি নির্ভর। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা খরা ও শিলা বৃষ্টির ফলে কৃষকের জীবনে দুর্দশা নেমে আসে। এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে কৃষিকে রক্ষা করার জন্য তারা নিজেদের বিশ্বাসের জায়গা থেকে নানা সংস্কার পালন করে থাকে। যেমন অতি বৃষ্টি বা বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা বুড়া ঠাকুরের পূজা দেন। অনাবৃষ্টির হাত থেকে ক্ষেত ও শস্যকে রক্ষার জন্য হুদুম গান করা হয়।

সবজীক্ষেতে নজর কাটা (হাঁড়ি-কলসি মূর্তি) দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য হল প্রতিবেশির কুদৃষ্টি থেকে ফসল রক্ষা। এছাড়া আম-কাঁঠাল গাছে প্রচুর ফল ধরলে গাছে ঝাঁটা বা ছেঁড়া জুতো প্রভৃতি পরিয়ে দেওয়া হয়। এতে ফল নষ্ট হয় না বলে তারা বিশ্বাস করে।

রাজবংশী সমাজে ছেলে মেয়ের বিয়ের সময় বিষহরির পূজার প্রচলন আছে। বিয়ের আগের দিন এই পূজা করা হয়। কেউ কেউ আবার বাড়িতে বিষহরা গানেরও আয়োজন করেন। কারণ তারা বিষহরি (মনসা) দেবীকে গান শুনানোর মানত করেন কোন বিশেষ সময়ে। যেমন যদি কারোর পুত্র না হয় কিংবা বড় একটা অসুখ থেকে কেউ সেরে ওঠে তাহলে বাড়ির মহিলারা তখন বিষহরি ঠাকুরকে মানত করে চরণামৃত গ্রহণ করে।

'নিশাঠাকুর' নামে এক বিশেষ দেবতা রাজবংশী সম্প্রদায়ে আছে। বিশ্বাস এই দেবতা অসন্তুষ্ট হলে শিশুগণ রাত্রে ঘুমোতে পারে না। এই অবস্থাকে 'নিশা লাগা' বলা হয়। তখন নিশাঠাকুরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য পাটকাঠির মাথায় 'ইচ্লা' (চিংড়ি) মাছ বেঁধে আগুনে পোড়ানো হয়।

রাজবংশী সমাজের অন্য একটি লোকবিশ্বাস হল গাই বিয়োলে (স্ত্রী গরু বাছুর দিলে) ১০-১১ দিনের মধ্যে 'দই-চিড়া' দিতে হয় 'গ্রামঠাকুরের' উদ্দেশ্যে। গ্রামঠাকুরকে সন্তুষ্ট না করলে সে বাছুর লুকিয়ে রাখে কিংবা গাইটির দুধ লুকিয়ে রাখে বলে বিশ্বাস।

গ্রামীণ রাজবংশী সমাজে এই একবিংশ শতাব্দীতেও চিকিৎসা বিষয়ক নানা লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। আর লোকচিকিৎসকটির নাম কখনো হয় ওঝা কখনো হয় কবিরাজ। জ্বর হলে গ্রামীণ

রাজবংশী সমাজ বিশ্বাস করে জ্বরের কারণ হল 'চমকা' (হঠাৎ বিসদৃশ বীভৎস কিছু দর্শনে আঁত্‌কে উঠা)। এর একমাত্র প্রতিকার হল 'চমকা' বসানো। এতে প্রথমে একটি সামান্য জলভর্তি কাঁসার থালাতে একটা গ্লাস উপুড় করে বসিয়ে সেই গ্লাসের চারদিকে চারটি সলতে দিয়ে সেগুলি জ্বেলে দেওয়া হয়। তারপর আক্রান্ত ব্যক্তির নামে তুলসি পাতা দিয়ে মন্ত্রজপ করা হয়। কিছুক্ষণ পরে গ্লাসের চারিদিকে বুদ্‌বুদ্‌ বের হলে সেখান থেকে ফোঁটা কয়েক জল তুলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে খাওয়ানো হয় আর তাতেই জ্বর সেরে যায় বলে তারা বিশ্বাস করে। কখনো কখনো তেলপোড়াও এক্ষেত্রে ব্যবহার করেন কবিরাজরা।

রাজবংশী সমাজে আরেকটি লোকচিকিৎসা হল ভর ওঠানো বা ভরে পড়া। প্রচলিত বিশ্বাস হল কোনো ব্যক্তির শরীরে কোন দেবতা বা অপদেবতা অধিষ্ঠিত হলে সেই ব্যক্তির মধ্যে যে অস্বাভাবিক কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায় তাকেই বলে ভর হওয়া। এক্ষেত্রে দেখা যায় মহিলা কালী সাধিকা ওঝা, রোজা, দেউরী ভরে পড়েন এবং ভরগ্রস্ত অবস্থায় বিভিন্ন অলৌকিক কথাবার্তা বলেন। এসময় তারা রোগী ঝাড়ান এবং অনুসন্ধিৎসু ও অসহায় মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকবিশ্বাস, চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিলা ঝড় (তাদের কাছে হুলকা বা দুন) এলে বাড়ির শিশুরা নগ্ন হয়ে তুলসি তলা বা মাঝ-উঠোনে কাঠের পিঁড়ি উলটো দিকে বসিয়ে তিস্তা বুড়ির নাম নিয়ে প্রণাম করে নাম করার সময় বলা হয় 'দোহাই তিস্তাবুড়ি ডানে-বাঁয়ে যা'। ঝড় এতে করে থেমে যায়। এছাড়া সর্ষে ছিটিয়ে দিলেও অনুরূপ ফল হয় বলে তারা বিশ্বাস করে।

রাজবংশী সমাজে লোকবিশ্বাস আছে যে নতুন ফসল বাজারে বিক্রি করলে সেই টাকা দিয়ে বাতাসা ও মুড়ি-মুড়কি কিনে 'হরিনুট' দিতে হয়। তাহলে ফসল ভালো হয়। এছাড়া বাড়ির মঙ্গলের জন্যও অধিকারীকে দিয়ে পূজা করে বাড়ি শান্তি করার রীতি রাজবংশী সমাজে প্রচলিত আছে। এতে প্রধান উপাচার হল দুধ, কলা, চিনি, ঘি ইত্যাদি। পূজার পর সন্ধ্যাবেলায় তুলসী ঠাকুরাণীর সামনে বসে হরিনাম কীর্তন করে হরিনুট দেওয়া হয়।

গ্রামীণ রাজবংশী সমাজের নারীদের কিছু কঠোর বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন কোন বাড়ির গৃহবধূ শনিবার বা মঙ্গলবার কিংবা অমাবস্যা পূর্ণিমায় কিংবা 'দোমাসি'তে (মাসের শেষ বা সংক্রান্তি) বাপের বাড়ি গেলে সে বাড়ির অমঙ্গল হয়। তাই এ নিয়ে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত ছড়া হল —

'অমাবস্যা পূর্ণিমা মাসের শ্যাষ।
কভু না যাই বাপ-মার দ্যাশ।'

এছাড়া বাড়ির গৃহ বধূদের মধ্যে সংস্কার আছে স্বামীর নাম কিংবা ভাসুরের নাম, মামা শ্বশুরের নাম উচ্চারণ করা নিষেধ, এমনকি তাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ানো যায় না; তাতে গৃহবধূর অমঙ্গল হয়।

এছাড়া বাড়ির মহিলাদের এলো চুলে বাইরে যাওয়া নিষেধ। এতে ভূত-পেত্নী ভর করতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে।

রাজবংশী সমাজে গরু প্রধান গৃহপালিত পশু। গরুকে রাজবংশীরা গুরু হিসেবেও দেখে। তাই গরুর দড়ি ডিঙানো তারা মনে করে অপরাধ। এছাড়া রবিবার ও বৃহস্পতিবার বাঁশ কাটলে বাঁশ ঝাড় নষ্ট হয়ে যায় বলে তারা বিশ্বাস করে।

রাজবংশী সমাজে কাক অশুভ শক্তির প্রতীক। যাত্রাকালে কাকের ডাক শুনলে যাত্রা ভালো হয় না। আবার রাজবংশী সমাজে এ ধারণাও প্রচলিত যে যাত্রাকালে পেছন থেকে মা ডাকলে ভালো। রাত্রে চুন না বলে দই বলতে হয়, কারণ রাত্রিতে চুন বললে অমঙ্গল হয়। এছাড়া রাত্রিবেলা সূই বা সূচও বলতে নেই, বলতে হয় বিন্দি। সূই বললে বাড়িতে ঝগড়া-ঝাটি হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলে তারা বিশ্বাস করে।

লোকবিশ্বাস এমননিই একটি বিষয় যাতে একটি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জনজাতির গোটা জীবনদর্শনই উঠে আসে। রাজবংশী সমাজে প্রচলিত লোকবিশ্বাসও রাজবংশী জাতির নিজস্ব ধারার একটি সাংস্কৃতিক পরিচয়। যা একদিন তারা নিজেদের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন, সেগুলির সামান্য অমান্যতা তাদের কাম্য নয়।

লোকবিশ্বাসগুলি তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে অবশ্য আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাবে লোকবিশ্বাসগুলি তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে, কিন্তু এখনও গ্রামীণ রাজবংশী সমাজ লোকবিশ্বাসের দ্বারা গভীর ভাবে পরিচালিত।

এতদঞ্চলের রাজবংশী জনজাতির প্রচলিত বিশ্বাস লোকাচারের তুলনায় অনেকটা গৌণ হলেও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় কতকগুলি লোকবিশ্বাস মানসিক দিক থেকে দৃঢ়তার সঙ্গেই মান্য করা হয়। নীচের আলোচনা থেকে তা জানা যায়।

"ভরার চায়া অভরায় ভাল্
পাছোত ডাকায় মায়,
ইয়ার ন্যাকান সাইত বোলে
নাই দুনিয়ায়।"

কর্মক্ষেত্রে যাত্রা করবার সময় পিছন দিকে মা ডাকলে যাত্রা শুভ হয়। জল ভরার জন্য পুত্রবধূ বা মেয়ে কলসি কাঁখে নদী যাত্রা করেছে দেখলেও শুভ। কিন্তু এখানে জলের চেয়ে মায়ের কথাটাই গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রাকালে হাঁচি, ছাগল মাথা ঝাড়া দিলে অশুভ, মুখের ভাত মাটিতে পড়লে শত্রু বৃদ্ধি, উভয়ের কথোপকথন কালে টিকটিকি টিক্ টিক্ করে শব্দ করলে শুভ সঙ্কেত। ভাত খাবার সময় বাঁশী বাজলে অমঙ্গল। এজন্য বাজনা শোনার সময়কালীন থালার নীচে জল ঢেলে দিতে হয়। এভাবে একই বাঁশীওয়ালার বিরুদ্ধে তিনদিন থালার নীচে জল ঢেলে দিলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে বলে বিশ্বাস। এই

নিয়ম প্রথম সন্তানের পোয়াতির ক্ষেত্রে অনিবার্য বলেও বিশ্বাস রয়েছে। ভাত রেঁধে রাঁধুনী বা গৃহবধূর আগে খাবার নিয়ম নেই।

"রাঁধিয়া বাড়িয়া ভাত স্বামীর আগোত খায়
ভরোন কলসির জল ত্বরায়ে শুকায়।"

মৌমাছির চাক উড়ে যাওয়ার সময় গাইন দিয়ে উঠোনে পার দেওয়ার নিয়ম আছে। এ কাজ করলে চাক বাড়ির নিকটস্থ গাছে বসবে বলে বিশ্বাস।

আটকুড়া দেখলে অশুভ।
ডানদিকে শেয়াল গেলে শুভ।
খালি কলস দেখলে — অমঙ্গল।
মাথায় হাত ও গালে হাত —অশুভ লক্ষ্মণ। মাকুন্দার মুখ দেখলে অশুভ।

"নিন্ থাকি উঠিয়া দ্যাকোং
নিদাড়িয়ার মুখ
সারাদিন হন হন শন শন
ভোজনের নাই সুখ।"

যে পোয়াতির সন্তান জন্মের পরেই মারা যায় বা বাঁচে না, এক্ষেত্রে জন্মের মুহূর্তে গোবর ফেলা ডেলি দিয়ে ঢেকে রাখলে পুনর্জীবন পায়। গ্রাম্যজনের ব্যাখ্যায় গোবর ফেলা ডেলিতে গোবর লেগে শুকায় বলে এক প্রকার গ্যাস ও গন্ধ সৃষ্টি হয়। এ রকম গ্যাস ও গন্ধযুক্ত ডেলিতে শ্বাসরুদ্ধ মুমূর্ষু সদ্যোজাতকে ঢেকে রাখলে জাতকটি উজ্জীবিত হয় বলে বিশ্বাস। 'বেটি ছাওয়া' বা বাড়ির মহিলারা দু'পায়ের মাঝখানে ভাতের থালা রেখে ভাত খেলে অশুভ। বয়স্ক লোকের ছায়া পারানো বা মাড়ানো অন্যায়। 'জিটির' (টিকটিকি) ডাক, মরা ডালে কাক, ঝোলায় খুর-কাঁচি সাথে নাউয়া (নাপিত) দেখলে শুভ বলে লোকায়ত বিশ্বাস।

সভ্যতার ক্রমশঃ পরিবর্তন তথা রূপান্তরের ধারায় কৃষি পর্যায় একটি অন্যতম স্তর, যে স্তরের মধ্যদিয়ে কৃষির সঙ্গে উর্বরতাতন্ত্রের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়ে উঠে। সমাজ বিজ্ঞানীরা এই স্তরের নানাতর বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এই অধ্যায়ে কৃষি সম্পর্কিত পূজা-পার্বণ-ব্রতানুষ্ঠান-কৃষি-যন্ত্র সরঞ্জাম রীতিনীতি বিচার বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে কৃষি স্তরকে তুলে ধরবার একটি প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। যা আসলে লুইস হেনরি মর্গান থেকে শুরু করে ফ্রেজার প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী সূত্র ধরে এতদঞ্চলের কৃষি স্তরকে তথা কৃষি স্তরের বিভিন্ন আঙ্গিককে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. H.L. Morgan - Ancient Society, p. 17-18.
২. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ - লোকায়ত দর্শনের অনুবাদ, পৃ. ৩১০।
৩. প্রাগুক্ত - পৃ. ৩০৮।
৪. প্রাগুক্ত - পৃ. ৩১০।
৫. চক্রবর্তী, সুধীর - যৌনতা ও সংস্কৃতি, পৃ. ৩১।
৬. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ - লোকায়ত দর্শনের অনুবাদ, পৃ. ৩১০।
৭. মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত) - উর্বরতার দেবী সরস্বতী, পৃ. ২৯।
৮. মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত) - উর্বরতার দেবী সরস্বতী, পৃ. ৩২।
৯. ভট্টাচার্য, ড. নরেন্দ্রনাথ - ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃ. ৩।
১০. শ্রীমৎস্বামী পরমাত্মানন্দ ভৈরব (গিরি) - তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত, ২০০৫, পৃ. ৯।
১১. মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত) - উর্বরতার দেবী সরস্বতী, পৃ. ৩৪।
১২. বসু, ড. নির্মলকুমার - হিন্দু সমাজের গড়ন, পৃ. ৭৩-৭৪।
১৩. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ - লোকায়ত দর্শন, পৃ. ১১০।
১৪. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ - লোকায়ত দর্শনের অনুবাদ, পৃ. ১১৮।
১৫. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ - লোকায়ত দর্শন, পৃ. ১১৮।
১৬. ঐ, - পৃ. ১১৮।
১৭. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ - লোকায়ত দর্শনের অনুবাদ, পৃ. ১১৯।
১৮. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ - লোকায়ত দর্শনের অনুবাদ, পৃ. ১২০।
১৯. চক্রবর্তী, সুধীর - যৌনতা ও সংস্কৃতি, পৃ. ৩২।
২০. প্রাগুক্ত - পৃ. ৩৬।
২১. প্রাগুক্ত - পৃ. ৩৬।
২২. প্রাগুক্ত - পৃ. ৩৬।
২৩. রায়, গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, পৃ. ১৩২।
২৪. চক্রবর্তী, সুধীর - যৌনতা ও সংস্কৃতি, পৃ. ৩৭।
২৫. প্রাগুক্ত - পৃ. ৩৯।
২৬. প্রাগুক্ত - পৃ. ৩৩।
২৭. দাশ, উপেন্দ্রনাথ - ভারতীয় শক্তি সাধনা, পৃ. ১৯৫।
২৮. রায়, গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির, পূজা-পার্বণ, পৃ. ১৩।
২৯. প্রাগুক্ত - পৃ. ১৪।

৩০. দাশ, উপেন্দ্রনাথ - ভারতীয় শক্তি সাধনা, পৃ. ২১।
৩১. দাশ, উপেন্দ্রনাথ - ভারতীয় শক্তি সাধনা, পৃ. ৮০।
৩২. দাশ, উপেন্দ্রনাথ - ভারতীয় শক্তি সাধনা, পৃ. ২১।
৩৩. রায়, গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির, পূজা-পার্বণ, পৃ. ১৮১।
৩৪. ঐ, - পৃ. ১৮২।
৩৫. রায়, গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, পৃ. ৯৫.
৩৬. কর, অরবিন্দ, সম্পাদক - কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন, পৃ. ২৪৪।
৩৭. উত্তরবঙ্গ সংবাদ, তারিখ - ১৮.৬.২০০৯।
৩৮. তিস্তা পারের কৃষি ২০০৬, সাটসা, জলপাইগুড়ি জেলা শাখা, পৃ. ১৪।
৩৯. কর, অরবিন্দ, সম্পাদক - কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন, পৃ. ২৫৫।
৪০. রায়, ধনঞ্জয় - উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন, পৃ. ১৭।
৪১. রায়, গৌতমগুহ - দ্যোতনা, ২০০৪, পৃ. ২০২।
৪২. ঐ, - পৃ. ২০৩।
৪৩. Sayal, Charu Chandra - The Rajbanshis of North Bengal, p.22-23.
৪৪. রায়, গৌতমগুহ - দ্যোতনা, ২০০৪, পৃ. ২০৩।
৪৫. ঐ, - পৃ. ২০৫।
৪৬. ঐ, - পৃ. ২০৭।
৪৭. ঐ, - পৃ. ২০৭।
৪৮. সরস্বতী, স্বামী অমলানন্দ - শ্রীশ্রী চণ্ডী, পৃ. ১০১।
৪৯. রায়, গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, পৃ. ৯৫।
৫০. চাকী, লীনা (সম্পাদক) - হৃদয়, বিষয় ঃ ধান, জানুয়ারি, ২০১১ (উত্তরবঙ্গের ধান ও লোকায়ত সংস্কৃতি ঃ দীপককুমার রায়, পৃ. ৩৬।
৫১. ঐ, - পৃ. ৩৭।
৫২. ঐ, - পৃ. ৩৬।
৫৩. ঐ, - পৃ. ৪২।
৫৪. চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার - লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, ২০০৩, পৃ. ১৫।
৫৫. চক্রবর্তী, বরুণকুমার - বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ. ৩৯১।

****

তৃতীয় অধ্যায়

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে কৃষি

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলিকে কৃষি সংস্কৃতির নিরিখে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়কে পাঁচটি পর্বে ভাগ করে লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে কৃষি সংস্কৃতি কীভাবে জড়িয়ে আছে তা বিশ্লেষিত হবে।

ক) দৈহিক ক্রিয়াধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি।

খ) শিল্পধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি।

গ) বাগ্‌ধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি।

ঘ) প্রয়োগধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি।

ঙ) বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি।

ক) দৈহিক ক্রিয়াধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি ঃ

ক্রীড়াধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি ঃ

ক্রীড়া মানুষের জীবনের অনুকৃতি। জীবন সংগ্রামের, জীবনচর্চার বিষয়গুলিকে উপাদান হিসেবে নিয়ে কিছুটা কল্পনা, কিছুটা নিছক আনন্দের সংমিশ্রণে আদিকাল থেকে মানুষ সৃষ্টি করে চলেছে নানান ধরনের খেলা। তাই মানুষের কৃষ্টি বা সংস্কৃতির একটি বিষয় খেলাধুলা বা ক্রীড়া। তবে যুগ যুগ ধরে মানুষের জীবনচর্চার মধ্যে যেহেতু খেলাগুলি থেকে গেছে এবং সঞ্চারিত হয়েছে তাই প্রাচীন ক্রীড়া লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত। লোকসংস্কৃতি হল সেই সমস্ত উপকরণ যেগুলো ঐতিহ্যের মাধ্যমে আমাদের হস্তগত হয় এবং লোকপরম্পরায়, মুখে মুখে, আচার ব্যবহারের মাধ্যমে, যা আয়ত্ত করতে হয়। লোকসংস্কৃতির যে বিভিন্ন দিক আছে খেলাধুলা তার একটি পর্যায়। বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ছাড়া বস্তুর বাইরে ভঙ্গীগত এবং লিখনগত সৃষ্টিগুলির মধ্যে সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্যের মত নৃত্য বা অন্য ধরনের শরীর সঞ্চালনও একই পর্যায়ে পড়ে। তাই প্রাচীন খেলাধুলা যা মানুষের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বংশপরম্পরায় চলে আসছে, যা প্রাতিষ্ঠানিক অনমনীয় নিয়মকানুনের মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রসারিত হয় না, মানুষের জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে একযুগ থেকে অন্যযুগে সঞ্চারিত হয়ে যায়, যা জীবনে অনুকৃতির প্রতীকিরূপ এবং যার মধ্যে কল্পনা ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি সেই ক্রীড়াগুলিই লোকক্রীড়া।[১]

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল লোকক্রীড়া, যা এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এই লোকক্রীড়াগুলির বিশেষত্ব হল - এই ক্রীড়াগুলি

লোকায়ত জীবনের সাধারণ উপকরণ যেমন — নুড়ি, কড়ি, পাতা, ডাল, ফল অর্থাৎ গৃহস্থালি বা কৃষিকাজের উপর ভিত্তি করে সংঘটিত হয়। এক্ষণে আমরা এমন কিছু লোকক্রীড়ায় উল্লেখ করব যা কৃষিজীবী সমাজ থেকে উঠে এসেছে এবং কৃষিকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চল ভূ-সাংস্কৃতিক ও নৃ-সাংস্কৃতিক দিক থেকে লোকসংস্কৃতির আকর। কালের বিবর্তনে লোকসংস্কৃতিরও পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তন এবং লুপ্তপ্রায় এতদঞ্চলের লোকক্রীড়াগুলিও। হারিয়ে গেছে নিঃঝুম দুপুর কিংবা বিকেলে শৈশবের অলস সময়গুলি, খোলা মাঠেও আজ বুঝি হাওয়া খেলে বেড়ায় না। তবুও লুপ্তপ্রায় লোকক্রীড়াগুলির কিছু কিছু স্মৃতির পাতাল ঘরের আলোছায়ায় পল্লী বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীর নানা সুর ছন্দে আজও আনমনে ঘুরে বেড়ায়, ছন্নছাড়া জীবনকে আলোড়িত করে।

লোকক্রীড়ার শ্রেণিবিভাগ ঃ

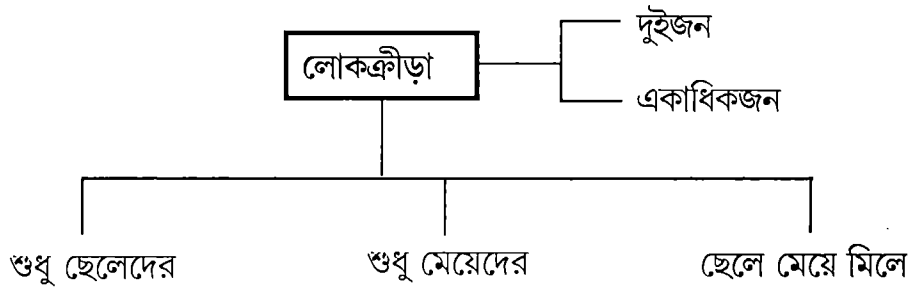

লোকক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য ঃ

ক) ঐতিহ্য ও সমষ্টিগত প্রকাশ,

খ) ভাষাশ্রয়ী হলেও তা মৌখিক এবং অলিখিত,

গ) কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের সৃষ্টি,

ঘ) নমনীয় ও পরিবর্তনশীলতার প্রয়াস এবং

ঙ) সহৃদয় সার্বজনীন সমাজের আস্বাদনীয়।

শুধু ছেলেদের খেলা ঃ

কাদোখেলা ঃ

'কাদা' রাজবংশী সমাজে 'কাদো' নামে পরিচিত। আর এই কাদার মধ্যে বা কর্দমাক্ত পিচ্ছিল ভূমিতে খেলা হয় বলেই নাম কাদোখেলা। অঞ্চল বিশেষে একে 'নারকেল খেলা' বা 'নারিকেল খেলা'ও বলা হয়। কারণ এই খেলায় নারকেল অন্যতম উপকরণের মধ্যে একটি।

সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে কোনো মন্দির চাতালে বা কোন গৃহস্থ বাড়ির উঠোনে,

বা কোনো মুক্তাঙ্গনে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলার উপকরণ বলতে এক খণ্ড কর্দমাক্ত ভূমি, একটি ঝুনো নারকেল, একটি তেল মাখানো ১৫/২০ ফুটের বাঁশ। যা কর্দমাক্ত ভূমির মাঝখানে পুঁতে রাখতে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বাঁশটি হবে পরিষ্কার, চাঁচাছোলা এবং শক্তপোক্ত।

খেলার প্রতিযোগী হবে একাধিক ৫/৭/৮/১০ জন। সবাই কর্দমাক্ত ভূমিতে পুঁতে রাখা বাঁশটিকে কেন্দ্র করে 'কাষ্টিগোজে' (মালকোচা) বৃত্তাকারে দাঁড়াবে। যিনি বিজয়ী নির্বাচন করবেন তাঁর হাতে থাকবে নারকেলটি। তিনি প্রতিযোগিদের মাঝখানে নারকেলটি ছুঁড়ে দিতেই শুরু হয়ে যাবে খেলা। নারকেলের দখল নিতে শুরু হয়ে যায় মল্লযুদ্ধ। পিচ্ছিল ভূমিতে নারকেল দখলের লড়াইয়ে যে প্রতিযোগী নারকেল নিয়ে তৈলাক্ত বাঁশে উঠবে তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করা এই খেলার রীতি।

কাদোখেলার উপকরণ থেকেই স্পষ্ট যে খেলাটি আধুনিক হোলি খেলার আদিমরূপ। কেননা কর্দমাক্ত ভূমি, ঝুনো নারকেল এবং বাঁশ এগুলি সবই কৃষি ও উর্বরতাতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন — "এতথ্য অনেকটা পরিষ্কার যে আদিতে হোলি ছিল কৃষি সমাজের পূজা; সু-শস্য উৎপাদন কামনায় নরবলি ও যৌন লীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার প্রধান অঙ্গ। তারপরের স্তরে কোন সময়ে নরবলির স্থান লইল পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ ইহার অঙ্গীভূত হইল।[২] অতএব বলতে সংশয় নেই যে কাদোখেলাই হোলি খেলার আদিমতম রূপ যা তিস্তা ও তোর্ষা পারে আজও বহমান।

চিলামাছ ঃ

'চিল' স্থানীয় ভাষায় 'চিলা'। পুকুর বা জলাশয় থেকে চিল যেভাবে মাছ শিকার করে, খেলাটি অনুরূপ বলেই এর নাম চিলামাছ খেলা হতে পারে।

একটি আবদ্ধ জলাশয়ে যেমন অনেক মাছ থাকে, ঠিক তেমনি একটি গণ্ডীবদ্ধ এলাকায় অনেক ছেলে থাকবে। আর গণ্ডীর বাইরে ২, ৩ বা ৪ জন খেলোয়াড় চিলের ভূমিকা পালন করবে। খেলা শুরু হলে গণ্ডীবদ্ধ এলাকার ভেতর থেকে চিলের ছোঁ মারার মতন চিল অর্থাৎ বাইরের খেলোয়াড় গণ্ডীবদ্ধ এলাকা থেকে একজনকে গণ্ডীর বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। বাইরে 'চিলদের' এবং ভিতরে 'মাছদের' মধ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস দেখা যাবে নিজের দলের খেলোয়াড়কে বাঁচানোর। টানাটানি, হ্যাঁচড়া-হ্যাঁচড়ির মধ্যে যদি চিলেরা সফল হয় তবে গণ্ডীর বাইরে 'মাছ' অর্থাৎ খেলোয়াড়কে চিলেরা সমবেত ভাবে ইচ্ছেমতন 'চিপ' (জুলফি) রগড়ে দেবে। আবার উল্টে টাও হতে পারে অর্থাৎ খোলা আকাশের চিলকে যদি মাছেরা জলাশয়ে (গণ্ডীবদ্ধ নির্দিষ্ট এলাকায়) নিতে পারে তারও অবস্থা তথৈবচ হবে।

চিল সাধারণতঃ লক্ষ্যে অব্যর্থ। অর্থাৎ চিলের মতো মনোসংযোগ সাংসারিক জীবনে

কাম্য। সেদিক থেকে চিল শুভদ্যোতক। মাছও শুভ দ্যোতনার প্রতীক। একটি মাছে অসংখ্য ডিম থাকে। সুতরাং বংশবৃদ্ধি বা উৎপাদনাত্মক ভাবনাটি অলক্ষ্যে এতদঞ্চলের শিশু-কিশোরের লোকক্রীড়ায় মধ্যে সংগুপ্ত আছে বলে মনে করা যায়। আবার নিজেদের এলাকা থেকে একদমে বিপক্ষ এলাকায় গিয়ে হানা দিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসার প্রক্রিয়াটির মধ্যে পশু শিকার, ফসল বা ফলমূল ছিনিয়ে আনার বিষয়টি সূচিত করে।[৩]

রেখাঙ্কিত পর্যায় ঃ

সাধারণতঃ পল্লীবাংলার সব বয়সী পুরুষরাই এই পর্যায়ের লোকক্রীড়াগুলির খেলুড়ে। মাটিতে দাগ কেটে বা গর্ত খুঁড়ে ছক প্রস্তুত করার পর এই পর্বের লোকক্রীড়াগুলি সংঘটিত হয়। সব খেলার 'কড়ি' বা গুটি হিসেবে সাদা ও কালো কচুর 'ভারার'র ব্যবহার হয়। তবে অনেক সময় দুই রঙের পাথর দিয়েও খেলা হয়।

এই পর্বের লোকক্রীড়াগুলি দুইজনের মধ্যে খেলতে দেখা যায়, কিন্তু অনেক সময় নিপাট বিনোদনের জন্য একাধিক ব্যক্তি দুই দলে বিভক্ত হয়েও খেলতে পারে। তবে দুই পক্ষের বা দুইজনের মধ্যে সংঘটিত সব খেলার কড়ি বা গুটি সব সময় সমান নাও থাকতে পারে। যেমন - চকরচাল, ষোলোপাইত, বারোপাইত, নয়পাইতা, ষোলগুটি, উড়ুন গাইন, ঘুরানি ও পক্তা প্রভৃতি খেলাগুলিতে দুইপক্ষের সমান কড়ি বা গুটি থাকে। আবার 'বাগ্‌ছাগোল', 'পুক্তিমোঞ্জা' খেলায় দুই দলের গুটি সমান থাকে না। তবে এই পর্বে একক বিনোদনের জন্য 'নাকের গুসা' খেলা উল্লেখযোগ্য এবং এতে ৯টি গুটি বা কড়ি প্রয়োজন। একবারে সব গুটি বিভিন্ন দিক থেকে খেতে পারাতেই লোকক্রীড়াটির সফলতা ধরা হয়।

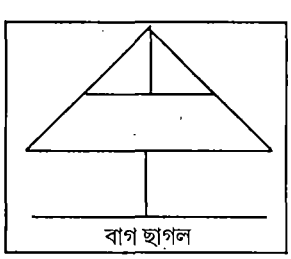
বাগ ছাগল

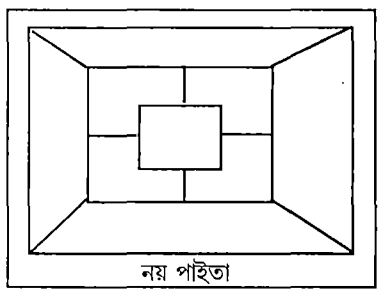
নয় পাইতা

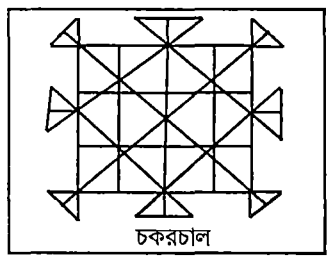
চকরচাল

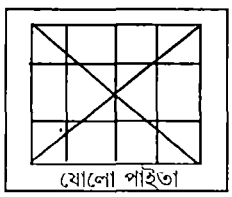
ষোলো পাইতা

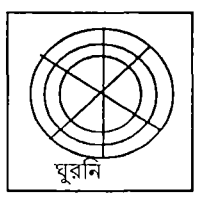
ঘুরনি

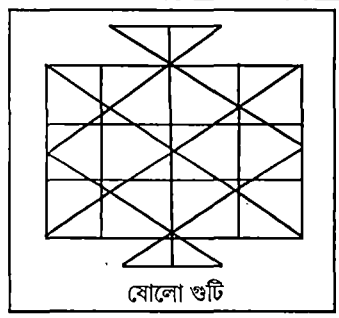
ষোলো গুটি

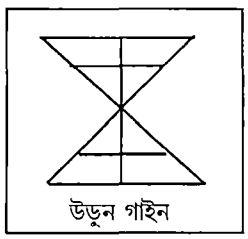
উড়ুন গাইন

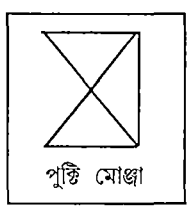
পুক্তি মোঞ্জা

নাকের ঘুসা

ষোলগুটি / ষোলঘরি ঃ

দু'জনের খেলা। স্থান বিশেষে এই ক্রীড়াটি 'ষোলগুঠি' নামে পরিচিত। প্রত্যেকের ষোলটি ঘরে ষোলটি করে 'গুটি' (ঘুঁটি) থাকে। রঙ, আকার বা আয়তন - দু'জনের গুটির পার্থক্য নির্ণয়ের সহায়ক। সাধারণতঃ, সাদা ও কালো কচুগাছ কেটে কিংবা ছোট বড় আকারের পাথরকুচি কিংবা ছোট বড় আয়তনের পাটকাঠির টুকরো ঘুঁটি বা গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খেলার ছকটি মাটির উপর কাঠি দিয়ে আঁকা হয়। খেলার নিয়ম অনেকটা দাবারই মতো তবে দাবার রাজা, মন্ত্রী, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি মর্যাদাপূর্ণ গুটি নয়। ষোলঘরিতে সব গুটিরই একই গুরুত্ব এবং এর চাল একঘর থেকে একঘর ডিঙিয়ে বিপক্ষের গুটি খাওয়া। ছকে মিললে এক গুটিতে একাধিক গুটি খাওয়া যেতে পারে।

রেখাঙ্কিত ও ছড়াযুক্ত ঃ

এই পর্যায়ের লোকক্রীড়ায় মাটিতে 'ঘাইন' দিয়ে ছক কেটে ছড়া বলতে বলতে খেলা হয় বিশেষ পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে মাটির গোল 'খাপরা' লাগে।

ছড়া — ১) কিত্ কিত্ কিত্ কিত্ কিত্ থা, কিত্ কিত্ কিত্ থা।

২) ছু-উ, উউ--উ-উ-উ-উ।

রেখাঙ্কিত পর্যায়ের ক্রীড়াগুলিতে বিভিন্ন আকারের ছকগুলি অর্থাৎ ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, আয়তক্ষেত্র, বৃত্তাকার ইত্যাদি অবয়বগুলি আদিমজীবনের জমি দখলের লড়াই বলে ধারণা করা যায়। এই লোকক্রীড়াগুলিতে কৃষিই প্রধান উপজীব্য বিষয়। কেননা, কৃষিভিত্তিক সমাজে চাষের জমিই উৎপাদনের প্রধান উপকরণ। কৃষির প্রথম পর্যায়ে জনসংখ্যা কম ছিল তাই তখন জমি নিয়ে মালিকানায় মালিকানায় দ্বন্দ্ব সংঘাত কম হত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমির দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত বাড়তে থাকে। প্রয়োজন হয় জমির বিভাজন রেখা বা আলের। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন — ''জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বাড়ে, বিশেষ ভাবে কৃষি প্রধান দেশে, ইহা তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু না থাকিলেও এই অনুমান কিছু কঠিন নয় যে, প্রাচীন বাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বাড়িতেছিল। যে সময় হইতে লিপি প্রমাণ আমরা পাইতেছি, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে ইহার কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।... দেখা যাইতেছে ক্রেতার প্রয়োজনীয় সমগ্র পরিমাণ ভূমি একই ভূ-খণ্ডে পাওয়া যাইতেছে না; ক্রয়যোগ্য খিলভূমি যদিও একই গ্রামে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা একসঙ্গে একই ভূখণ্ডে পাওয়া যাইতেছে না, যাইতেছে পাঁচটি পৃথক ভূ-খণ্ডে।... এই সব সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে সহজেই জনসাধারণের মধ্যে ভূমির চাহিদার পরিমাণ অনুমান করিতে পারা যায়।''[৪] কাজেই পৃথক ভূ-খণ্ডে জমির থাকার দরুন নিজ জমির সীমানা নির্ধারণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রেখাঙ্কিত

পর্যায়ের এই লোকক্রীড়াগুলিতে বিভিন্ন ছকে বিভাজন রেখাগুলি আল দ্বারা বিভক্ত ভূমি পরিমাণকেই সূচিত করে।[৫] অপরদিকে জমির অধিকার নিয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, ট্রাইবে ট্রাইবে, ক্ল্যানে ক্ল্যানে লড়াই[৬] বাঘছাগল, পুক্তিমোঞ্জা, ষোলঘরি, চকরচাইল, বারোপাইতা, নয়পাইতা ইত্যাদি লোকক্রীড়ায় প্রকাশ ঘটেছে।

শুধু মেয়েদের খেলা ঃ

ফুলোনো খেলা ঃ

দুইজন বালিকা ২/৩ হাত ফাঁকে মুখোমুখি বসবে এবং সেই ফাঁকা স্থানটি হবে অবশ্যই পরিষ্কার তক্‌তকে উঠোনের মতো। খেলার সামগ্রী সামান্য পাঁচটি প্রায় একই আয়তনের ছোট পাথরকুচি। আর এই খেলার ছড়াটি হল —

"ফুলোনো ফুলোমাটি
একোটে দোলোনোটি
তেলোনোটি
ঝামোনোটি
একটি পয়সা তেলের দাম
মনোরঞ্জন বামন
পদ্মফুলের সদ্য বাশি
হে সূর্য তোমার সাক্ষী
ষাড়ের গলায় পাঁচ পট্টি
তোল ঝাট্টি।" (সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫৯ দ্রষ্টব্য)

যে প্রথম 'দান' (কথ্য ভাষায় 'দাইন') চালবে সে পাঁচটি পাথর ডান হাতে মুঠো করে ধরে আলতো ভাবে দু'জনের মাঝে ছড়িয়ে দেবে। ছড়ানো পাঁচটি পাথরের মধ্যে একটিকে আলতো ভাবে তুলে নেবে, যাতে তুলতে গিয়ে অন্য কোন পাথরে স্পর্শ না লাগে। এরপর উপরোক্ত ছড়াটির তালে তাল মিলিয়ে হাতের পাথরটি উপরে ছুঁড়ে দিয়ে 'একোটে' বলার সাথে সাথে মাটি থেকে একটি পাথর তুলে নিয়েই উপরে ছুঁড়ে দেওয়া পাথরটি ধরবে। এবার 'দোলোনোটি' বলার সাথে সাথে হাতের দুটি পাথরকে উপরে ছুঁড়েই মাটি থেকে অনুরূপ ভাবে একটি পাথর তুলে নিয়েই উপরে ছুঁড়ে দেওয়া পাথর দুটিকে ধরবে। অনুরূপ ভাবে 'তেলোনোটি' ও খেলতে হবে। 'ঝামোনোটি' বলার সাথে সাথে একই ভাবে পাঁচটি পাথরকেই এক জায়গায় (মাটিতে) জমা করতে হবে।

এবার খেলার দ্বিতীয় এবং আকর্ষণীয় পর্ব। "একটি পয়সা তেলের দাম ..." ছড়াটির

তালে তালে মাটিতে জড়ো করা পাথর পাঁচটি মাটি থেকে একবারে তুলে নিয়ে দু'হাতের করতল প্রসারিত করে উপরে সমস্ত পাথর ছুঁড়ে দিয়ে ''ষাড়ের গলায় ... তোল ঝাট্টি'' বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতের উলটো পিঠে পাথর ধরেই আবার ছুঁড়ে দিয়ে করতলগত করলেই খেলায় জয়। গোটা প্রক্রিয়াটিতে কোনো স্থানে আটকে গেলেই 'মরা' অর্থাৎ হার এবং দ্বিতীয় জনের খেলার সুযোগ ঘটে।

ছেলে-মেয়ে মিলে খেলা ঃ

লাট্টু খেলা ঃ

এই খেলাটির জন্য চাই ভাঙ্গা টালি, বা ভাঙ্গা মাটির হাড়ি কিংবা ভাঙ্গা কলসের ছোট 'গোল চাকতি' আকৃতির টুকরো। আর একটি টেনিস বলের মতো রাবার বা ওই জাতীয় বল, কোথাও কোথাও 'জাম্বুড়া ফল' বল হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

একটির উপরে একটি থরে থরে গোলাকার সাতটি 'চাকতি' সাজানো হয়। ৫/৬ ফুট ব্যাসার্ধের ব্যবধানে একটি গণ্ডি কাটা হয়। সেই গণ্ডির বাইরে থেকে বল দিয়ে তাক করে গোলাকার চাকতিগুলিকে কোন একজন ছড়িয়ে দেবে। ক্রিকেট খেলার মতো বাকি খেলোয়াড়রা ফিল্ডিং দেবে। যে বল করবে বল দিয়ে এক ঢিলে চাক্তিগুলি ছড়িয়ে দিয়েই দৌড়ে এসে সেই চাকতিগুলি থরে থরে পূর্ববৎ সাজাবে এবং সেই অবসরে যারা ফিল্ডিং দিচ্ছে তারা সেই বলটি ছুঁড়ে যদি তাকে লাগাতে পারে (স্ট্যাম্প এর মতো) তাহলে সে মরা (out) , আর বল লাগানোর আগে গণ্ডীর মধ্যে ফিরে আসলেই জয়। এভাবেই খেলাটি চলতে থাকে। এই লোকক্রীড়াটি 'সাতচড়া' খেলার অনুরূপ। স্পষ্টতই আদিম জীবনে দুই কৌমগোষ্ঠীর সংঘাত এই খেলার অন্তঃকাঠামোর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।[৭]

পাখি খেলা ঃ

বাংলায় যা 'পাখি' এতদঞ্চলে সেটাই 'পখি' অর্থাৎ প্রচলিত বাংলায় বলা যায় পাখি খেলা।

খেলাটিতে ৩, ৫, ৭, ৯ ... জনের। খেলোয়াড় সংখ্যা অনুসারে অর্থাৎ ৩ জন খেলোয়াড় হলে ২ টি, ৫ জন খেলোয়াড় হলে ৪ টি, ৭ জন হলে ৬ টি বর্গাকার ঘরের দাগ মাটিতে কাটা হয়। প্রতিটি বর্গাকার ঘরের মাঝে একটি সমান্তরাল দাগ থাকে। এবং সেই দাগের উপর একজন খেলোয়াড় থাকবে, সেই খেলোয়াড় জনই 'পখি' বা 'পাখি'। ঘর বদলে বদলে বাসার পাখিগুলি দৌড়োদৌড়ি করবে এবং 'ঘর ছাড়া' পাখিটি থাকবে ঘর দখলের অপেক্ষায়। যদি ঘর দখলে সক্ষম হয় তাহলে যার ঘরে সে প্রবেশ করেছে সে হবে পরের পাখি। এ ভাবে খেলাটি চলতে

থাকবে।

এই লোকক্রীড়াটির মধ্যে কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস অনুকৃত হয়েছে। গোলা উপচিয়ে ধান পড়লে যেমন পাখিরা এসে সেগুলি খুঁটে খায় তেমনি পাখি বা পাখি ক্রীড়া সংঘটিত হলে বাস্তবেও অনুরূপ ঘটবে। অর্থাৎ সমৃদ্ধি এতই হবে যে গোলা উপচিয়ে ধান পড়বে এবং পাখিরা তা খাবে।[৮] অপরদিকে ঘর বদলের মধ্যদিয়ে জমির দখলের লড়াইটিও বুঝতে অসুবিধা হয় না; সবমিলিয়ে জমিদখলের ভাবনাটির পাশাপাশি উর্বরতাভিত্তিক ধর্মধারার সম্পর্কজনিত আদিম বিশ্বাস এই লোকক্রীড়ায় অনুকৃত হয়েছে।

ভাত ভাত শাক শাক ঃ

"গুদু গুদু মানার পাত
জল আনিতে হইল ভাত
অয় খাউক অয় খাউক
করুক কুক করুক কুক
আতি পোহাইলে তুরুক।
ভাত গিলা কায় খাইল?
ভন্দা বিলাই
এ্যাও মারু বেও মারু
কুনঠে গেল ভন্দা বিলাই
কুতকুতায় মারু।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৬০ দ্রষ্টব্য)

লোকক্রীড়াটিতে বয়স্ক খেলোয়াড়েরা ছড়া আবৃত্তির মাধ্যমে ছোটদের হাস্যকৌতুক দান করে। শিশুদের হাতের পাতা দুটি একহাতে ধরে অন্য হাত দিয়ে তাতে রান্নার মত নাড়তে থাকে এবং ছড়া আবৃত্তি করে। চারচরণ আবৃত্তির পর বয়স্ক ব্যক্তি শিশুটিকে জিজ্ঞেস করে "ভাত গিলা কিসে খাইল?" (ভাতগুলি কে খেয়েছে) তার উত্তরে শিশুটি বলবে "ভন্দা বিলাই" (হুলো বিড়াল)। তারপর বয়স্ক খেলুড়ে ছড়ার শেষ অংশ আবৃত্তি করে শিশুর হাত মাপবে এবং 'কুত কুতায় মারু' বলার পর শিশুর কাক্‌তালীত্ অর্থাৎ বগলতলায় কুত্‌কুতি দিয়ে হাসাবে।

এই লোকক্রীড়াটিতে কৃষিজীবী সমাজের দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনের ভাবনাটি মূর্ত হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে নির্মল হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে।

কানা মাছি ঃ

সমবেত খেলুড়েরা গাছের পাতা দিয়ে, আবার অনেক সময় মাটিতে দাগ কেটে 'কানা' নির্বাচন করে। তারপর গামছা বা রুমাল দিয়ে কানার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। অন্য খেলুড়েরা কানাকে উত্যক্ত করতে থাকে বিভিন্ন ভাবে। কানা যদি চোখ না খুলে কাউকে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে তার কানাদশা থেকে মুক্তি ঘটে। যাকে ছোঁয় সে আবার নতুন করে কানা নির্ধারিত হয় এবং ঠিক একই ভাবে তারও 'কানামুক্তি' ঘটে।

খাটি ঘুষা খেলা ঃ

'খাটি' এবং 'ঘুষা' শব্দদুটি তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের প্রচলিত কথ্যভাষার শব্দ, যার বাংলা প্রতিশব্দ 'কাঠি' এবং 'লুকোনো'; কাঠি লুকোনো অর্থাৎ খাঁটিঘুষা খেলা।

একসঙ্গে একাধিক বালিকা একখণ্ড তৃণাবৃত্ত ভূমিকে কেন্দ্র করে গোলাকার ভাবে বসবে। খেলার সামগ্রী বলতে সরু ছোট একটি কাঠি। কে প্রথম খেলবে তা সবাই মিলে ঠিক করবে। যে খেলবে সে কাঠিটি ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনীতে চেপে ধরে বাম হাতের করতল দিয়ে আড়াল করে লুকোচুরি খেলার মতো হাত ঘাসের উপর চালনা করতে করতে কাঠিটি ঘাসের শিকড়ের নিচে লুকিয়ে রাখবে। তারপর দ্বিতীয় একজন সেই কাঠিটি খুঁজে বের করার প্রয়াস নেবে। যদি খুঁজে না পায় তবে যে কাঠিটি লুকিয়েছে তাকেই খুঁজে বের করতে হয়; খুঁজে পেলেই জয় নয়তো পরাজয়। এভাবে পালাক্রমে খেলাটি চলতে থাকে।

ইচন বিচন ঃ

লোকক্রীড়াটির খেলুড়েরা সাধারণতঃ শিশু-কিশোর। চারপাঁচজন খেলুড়ে গোলাকার হয়ে বসে হাতের তালু উপুড় করে মুক্ত রাখবে। একজন খেলুড়ে ছড়াটি আবৃত্তি করার সাথে সাথে প্রত্যেক খেলুড়ের হাতের পিঠ স্পর্শ করবে। যে খেলুড়ের হাতের কাছে গিয়ে 'কাট' শব্দটি উচ্চারিত হবে সে 'পাক্কা' হবে এবং গোলাকার স্থান থেকে বেরিয়ে যাবে। ছড়াটি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে লোকক্রীড়াটি চলবে। সর্বশেষ খেলুড়ে চোর হবে। 'পাক্কা' খেলুড়েরা চোরকে নানা প্রশ্ন করবে যার উত্তর চোরকে অবশ্যই দিতে হবে। এটাই লোকক্রীড়ার আনন্দ ও কৌতুক।

ছড়া ঃ

'ইচন বিচন ধাউরি বিচন
তাতে আছে মঙ্গলকাঁটা।
মঙ্গলকাঁটা নড়েচড়ে

কথান্তর ঃ

'ইচন বিচন ধাপুরি বিচন
তাতে আছে মদন কাঁটা
মদনকাটা নড়েচড়ে

আইকুমারি ডাক পাড়ে,	আই কুমারি ডাক পারে।
এলেরে বেলেরে	অ্যালেরে ব্যালেরে
ফুলতুলিবার গেলেরে	ফুল তুলিবার গেলোরে
ফুলের মানডালা পাত	ফুলের ধাপুরা পাত
ছিরি আংটি হাত কাট।"	ছিরি আংটি হাত কাট।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫৯ দ্রষ্টব্য)

ডোম্না-ডুম্নি ঃ

এই খেলায় পাঁচ-সাত জন কিশোর-কিশোরী গোলাকৃত অবস্থায় বসে হাতগুলিকে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় সামনের দিকে প্রসারিত করে খেলে। একজন খেলুড়ে ছোট্ট একটি পাথর (শিল) বা 'কুটা' নিয়ে ছড়াটি আবৃত্তি করতে করতে মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলির একটির ভিতরে লুকিয়ে রাখে। তারপর সবার উদ্দেশ্যে শেষের দুই চরণে সাবধানবাণী প্রচার করে। এরপর আবৃত্তিকার খেলুড়ে কাউকে পাথরটি কোথায় আছে জিজ্ঞেস করবে। সে যদি সঠিক বলতে না পারে তবে সে হবে ডোমনা। এবার পরবর্তী পর্যায়ের খেলাতে যতক্ষণ সে পাথর কার কাছে আছে সঠিকভাবে বলতে না পারবে ততক্ষণ তার ডোম্না অবস্থা থেকে মুক্তি ঘটবে না। যদি ডোমনা সঠিক বলতে পারে তবে যার হাতে পাথর থাকবে সে পরবর্তী ডোমনা হবে। এভাবে লোকক্রীড়াটি এগিয়ে যাবে।

ছড়া ঃ	কথান্তর ঃ
"ডোম্নারে ডুম্নী	"ডমনারে ডুমুনি
নিচা মাছের ঘুমনী	সরা মাছের ঘুমুনি
শাক খায় শুকাতি খায়	সর খায় শুকাতি খায়
ডোমনা ব্যাটা কুঠে নুকায়?	ডমনার বেটা কুনঠে নুকায়?
চুপচুপ্ নিচ্চুপ	ঢাপঢুপ নিশ্চুপ কানাকুকুরী ভুচ্চুলুৎ
(ঢাপঢুপ নিচচুপ)	কান্দে কাউয়া কুন্ঠে?
কানাকুকুরী ভুটুলুস।"	হাগি দ্যাও তোর ঠোঁটে।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৬০ দ্রষ্টব্য)

মাটি চাটি ঃ

এই লোকক্রীড়ায় সাধারণতঃ কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে। দলে দুইজন করে মুখোমুখি পা ছড়িয়ে বসার পর বিপক্ষ পায়ে না লাগিয়ে পায়ের স্থান পরিবর্তন করে লাফিয়ে খেলে। খেলার সময় বিপক্ষের পায়ে লাগালে 'মরা' হয়। লাফানোর সময় আবৃত্তি করে —

মাটিরে মাটি
চাটিরে চাটি
কাঁচা কাঁঠাল মোকা তোলা দ্যায়
রাজার বেটির বেহা হবে।
লম্বা লম্বা শাড়ি পিন্দেছে
শাড়ির উপুরা গহমা সাপ
চম্‌কি উঠিল কইনার বাপ
কইনার বাপের নাম কি?
থাপুরি দিয়া উঠিল কি?" (সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৬১ দ্রষ্টব্য)

কানামাছি লোকক্রীড়ার মধ্যে আদিম সংস্কার বিচিত্র ভাবে প্রছন্ন হয়ে আছে। অন্ধ যদি কাউকে স্পর্শ করে ফেলে তাহলে সেও দৃষ্টি শক্তি হারাবে এমনই একটি স্পর্শমূলক জাদু সংস্কার আরণ্যক যুগের মানুষের মনে দানা বেঁধেছিল। সেই ভীতির বশেই অন্ধকে না-ছোঁয়ার যে একটি প্রয়াস তাদের মনে ক্রিয়াশীল ছিল, সেই আদিমতম সংস্কারটি শিশু-কিশোরের লোকক্রীড়ার অনুকৃত হয়েছে। অন্যদিকে আরণ্যক জীবনে খাদ্যের সন্ধানে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছি তাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতাও এর পিছনে মিলেমিশে আছে বলে প্রতীতি হয়। সংস্কার ও জীবিকান্বেষণ এই দুই উপলক্ষ একত্রে এই খেলাটির মূল পরিকাঠামোকে গড়ে তুলেছে।[৯]

খাটিঘুষা, ইচনবিচন, ডোমনা-ডুমনি লোকক্রীড়ায় কানামাছির মতোই আদিম আরণ্যক জীবনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এইসব লোকক্রীড়াগুলি চোর চোর, কুমীর কুমীর বা লুকোচুরি খেলার রূপান্তর মাত্র। 'চোর' কাউকে স্পর্শ করলেই সে বনে যায় চোর। স্পর্শ জাদুর সংস্কারটি এখানে অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে।[১০] বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে ক্ষেতের ফসলকে রক্ষা করবার লড়াইটিই বিভিন্ন লুকোচুরি খেলায় অনুকৃত হয়েছে বলে মনে হয়।[১১] ফলে কৃষিকেন্দ্রিক জাদু ভাবনা থেকেই যে এইসব ক্রীড়াগুলি উৎপত্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। আবার 'মাটি চাটি' খেলায় 'শাড়ির উপর গহমা সাপ' কথাটির মধ্যে যে উর্বরাতান্ত্রিক কর্মধারার ইঙ্গিত লক্ষিত হয় তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। সাপ নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

অস্‌কস্‌ / বস্‌কস্‌ ঃ

ছড়া ঃ **কথান্তর ঃ**

"অস্‌কস্‌ সিন্‌জা বুলবুলি মস্তকস্‌।" "রসকষ সিঙড়া বুলবুলি মস্তক।

লোকক্রীড়াটির খেলুড়ে শিশু কিশোর। চার পাঁচজন খেলুড়ে গোলাকৃতি অবস্থায় বসে সমবেত ভাবে ছড়াটি আবৃত্তির মাধ্যমে দুই হাতের আঙ্গুলগুলি বিস্তৃতভাবে মাটিতে পেতে রাখে।

'গনাইয়া' খেলুড়ে হাত বিস্তৃত করে ছড়াটি আবৃত্তির মাধ্যমে প্রত্যেকের আঙ্গুল গুনতে থাকে। যার যে আঙ্গুলে ছড়াটি শেষ হয়; সে উঠে যায় বা পাক্কা হয়, সবার আঙ্গুল গোনার পর আবার দ্বিতীয়বার খেলার সময় পাক্কা আঙ্গুলগুলি বাদ দিয়ে খেলুড়েরা আঙ্গুল বিস্তৃত করে। এভাবে যা সর্বশেষ আঙ্গুল থাকে সে 'চোর' হয়। লোকক্রীড়াটিতে চোরকে শাস্তির বিধান স্বরূপ 'পাক্কা' খেলুড়েরা মারবে। মারার নিয়ম শুধুমাত্র হাতে। চোর নিজের হাতকে বিশেষ মুদ্রা করে আঙ্গুলগুলি মাটিতে স্পর্শ করে রাখবে। এবার 'পাক্কা' খেলুড়েরা মারবার সময় চোর যদি কৌশলে হাতটি সরিয়ে নেয় তবে সেই খেলুড়ের মার থেকে মুক্তি পায়। সবার কাছে মুক্ত হবার পর আবার গোড়া থেকে একই ভাবে খেলাটি শুরু হবে।

বুড়িভুসা খেলা ঃ

সমবেত খেলুড়েরা দুই দলে বিভক্ত হয়। টসের মাধ্যমে কোন দল আগে খেলবে তা নির্ধারিত হবে। যে দল খেলবে তারা বুড়ির গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। 'দমাইয়া' 'ছু-উ-ই' দম দিয়ে প্রতিপক্ষকে ছোঁয়ার চেষ্টা করবে, ছুঁতে পারলে মারা পড়ে। কিন্তু যদি বুড়ির কাছে ফেরার আগে তার দম ফুরিয়ে যায় এবং বিপক্ষ দল তাকে ছুঁয়ে দেয় তবে সে মারা পড়ে। এভাবে ফাঁকি বুঝে বুড়ি যদি পাক্কা সীমানা অতিক্রম করে তবে পাট্টি হয়। খেলাটি প্রথম থেকে আবার চালু হয়।

এই লোকক্রীড়াটি বাংলার বুড়ি-বসান্তি বা বৌ বসান্তি খেলার অনুরূপ। নারী হরণ করে বিবাহ রীতি প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল এবং সেটাই এই লোকক্রীড়ায় অনুকৃত হয়েছে। নারী ও জমি এ দুটিই হল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মুখ্য দুই চিরকালীন উপলক্ষ্য।[১২] আবার আদিম জনচেতনায় নারী ও ভূমি সমার্থক, কেননা, নারী সন্তান জন্ম দেয়, জমি ফসল ফলায়। প্রাচীন উর্বরাতান্ত্রিক মানসিকতা এই লোকক্রীড়ায় প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেছে বলে আমাদের ধরে নিতে অসুবিধা হয় না।

ডাংগুলি / চুঙ্গিলাঠি / ডাংনরি ঃ

ডাংগুলি খেলার আঞ্চলিক নাম চুঙ্গি লাঠি খেলা। কে আগে খেলার সুযোগ পাবে তার জন্য খেলোয়াড়রা চুঙ্গিকে লাঠি দিয়ে 'ভলে' অর্থাৎ চুঙ্গিকে লাঠি দিয়ে হাওয়াতে ছুঁড়ে যে বেশিবার 'ভলবে' বা বেশিবার লাঠি দিয়ে ছুঁতে পারবে সে প্রথম খেলার সুযোগ পাবে ক্রমে যারা দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি হবে তারা সেভাবে খেলার সুযোগ পাবে। লাঠির সাহায্যে মাটিতে খোড়া একটি লম্বাটে গর্ত থেকে চুঙ্গিকে রেখে দূরে লাঠি দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। মাটিতে পড়ার আগে বিপক্ষের কেউ চুঙ্গিটিকে ক্যাচ বা লুফে নিতে পারলে লাঠিধারীর দান চলে যায়। চুঙ্গিটি গিয়ে যেখানে পড়ে সেখান থেকে বিপক্ষ দলের ছেলেদের মধ্যে যে কোন একজন লাঠিকে লক্ষ্য করে চুঙ্গিটি ছুঁড়ে মারে। চুঙ্গি লাঠিতে না লাগলে লাঠিধারী চুঙ্গিকে লম্বা গর্তের মধ্যে রেখে

আঘাত করে দূরে পাঠাতে চেষ্টা করে এবং এর সঙ্গে মাটি থেকে উপরে তুলে একবার হাওয়াতে চুঙ্গিকে আঘাত করলে সিঙ্গাল, দু'বার হাওয়াতে আঘাত করলে ডাবলিং, তিনবার আঘাত করলে ট্রিপলিং এই ভাবে যতবার লাঠি দিয়ে শূন্যে চুঙ্গিকে আঘাত করতে পারবে এবং চুঙ্গিকে দূরে পাঠাতে পারবে ততই তার পয়েন্ট বেশি হবে। দূরস্থিত চুঙ্গি থেকে গর্ত পর্যন্ত লাঠি দিয়ে মেপে যত সংখ্যা হবে সেটা হবে লাঠি ধারীর পয়েন্ট। এই পয়েন্ট গোনা হয় 'সিঙ্গল' হল এক লাঠিই একশ, 'ডাবলিং' হলে এক লাঠিই দুইশ বা অর্ধেক লাঠিই একশত। 'ট্রিপলিং' হলে এক চুঙ্গিতে এক শত ধরা হয়। খেলার সময় একটা পয়েন্ট নির্দিষ্ট থাকে যেমন — দশ হাজার বা পাঁচ হাজার। যে আগে দশ হাজার বা পাঁচ হাজার পয়েন্ট করবে সে আগে উঠবে অর্থাৎ সে আর খেলবে না। এই ভাবে এক এক করে সবাই উঠতে থাকবে এবং শেষে যে থাকবে তাকে সবাই মিলে খাটাবে। এর পর আগের মতোই লাঠি দিয়ে চুঙ্গি 'ভলবে' অর্থাৎ হাওয়াতে ছুঁড়ে এক, দুই ইত্যাদি করে স্পর্শ করবে এবং যতবার স্পর্শ করবে (ভলবে) ততবার সে চুঙ্গিটিকে লাঠি দিয়ে ছুঁড়ে দিবে এবং শেষ স্থান অধিকারীকে ততবার এক পায়ে খাটতে হবে। এই ভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, স্থানাধিকারী খেলোয়াড়রা শেষ স্থানাধিকারীকে খাটাবে। এই খেলাটি সম্বন্ধে লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষে বলা হয়েছে — ''খেলাটি চীনেও প্রচলিত এমনকি একটু ভিন্ন প্রথায় রাশিয়াতে 'চিঝিক' নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ এর মধ্যে প্রাচীন কোন উর্বরাতান্ত্রিক জাদু মুখ লুকিয়ে আছে। ডাং হচ্ছে পিতৃ অঙ্গ, মাটির গর্তটি মাতৃ অঙ্গ আর গুলিটি হচ্ছে সন্তান।''[১৩] মানব শিশু জন্মের এই সরল এবং স্বাভাবিক অনুকৃতির উদ্দেশ্য হল ধরণীর মৃত্তিকাকে উর্বরতর করা এবং প্রচুর ফসল সম্পর্কে জাদু প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিঃসন্দিহান হওয়া।[১৪]

গর্ত খুঁড়ে ডাং দিয়ে খুঁচিয়ে গুলিটাকে বহুদূরে পাঠানোর তাৎপর্য একাধিক। গর্তে ডাং দিয়ে খোঁচানো জুম্-চাষের অনুকৃতি অবশ্যই। গুলিটা যতদূরে ছিট্‌কে যায়, ততটা জমিই একপক্ষের অধিকারে যে আসে, সেটা অস্ত্র নিক্ষেপের সাহায্যে শত্রুকে ঘায়েল করে হঠানো স্মৃতির অনুষঙ্গ বাহী। এগুলিকে শস্য প্রতীক হিসেবেও গণ্য হতে পারে। যতদূর অবধি গুলিটা গেল ততদূর পর্যন্ত শস্য ফলবে এটাই সংস্কার ছিল গোড়ায়। ডাং দিয়ে গর্তের মধ্যে গুলি খোঁচানোকে এক অর্থে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্ম ধারার প্রতীক বলে ভাবতে পারি। চাষের জমিতে নর-নারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের 'রিচ্যুয়াল' বিশ্বের বহু সংস্কৃতি বলয়েই প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। গর্তে ডাং খোঁচানো সেই সংরাগ-ক্রিয়ারই অনুকৃতি বলেও ধার্য করলে ভুল হবে না হয়তো।[১৫]

এই খেলাটিকে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এর শরীরচর্চা গত দিকটাও দেখতে পাব। এই খেলাটি হাতের পেশীশক্তি, হাত ও চোখের সমন্বয়, অনুমান শক্তি ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া নির্ভর। লাঠি দিয়ে চুঙ্গিকে জোরে আঘাত করে দূরে পাঠানোর ক্ষেত্রে হাতের পেশীশক্তির বিশেষ প্রয়োজন। লাঠি দিয়ে চুঙ্গিটিকে গর্ত থেকে তোলার ক্ষেত্রে, হাত ও চোখের সমন্বয়ও প্রয়োজন হয়, তাছাড়া

লাঠি দিয়ে চুঙ্গিকে আঘাত করার সময় ঠিক কোন জায়গায় আঘাত করলে চুঙ্গিটি অনেক দূরে যাবে সেই অনুমান ক্ষমতা ও লাঠি দিয়ে চুঙ্গিটিকে ছোঁড়ার পর বিপক্ষ খেলোয়াড়দের চুঙ্গিটি ধরার প্রতিবর্ত ক্রিয়াও এই খেলায় উল্লেখযোগ্য ভাবে চোখে পড়ে।[১৬]

কটিলাল / টিকানাল ঃ

কটিলাল খেলাটি একটি শাস্তিমূলক খেলা। কোন একজনকে 'চোর' বানিয়ে মাটিতে বৃত্ত আঁকা একটি ঘরে চোরকে ঢুকিয়ে দিয়ে অন্যান্য খেলোয়াড় তাঁর কোমরের নীচে (পাছায়) হাত দিয়ে মারতে থাকে এবং চোর সেই বৃত্ত থেকে বাইরে বেরোতে পারবে না, তাকে অন্যান্য খেলোয়াড়দের পা দিয়ে স্পর্শ করতে হবে। যাকে স্পর্শ করবে সে চোর হয় এবং তাকেও একই ভাবে মারা হয়। বৃত্তের বাইরে চোর আসলে বা কেউ যদি তাকে জোর করে বৃত্তের বাইরে নিয়ে আসে তাহলে পা দিয়ে স্পর্শ করলেও তারা আউট হয় না। অন্যান্য খেলোয়াড়রা সেই সুযোগ তাকে কোমরের নীচে মারতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় ঘরে ঢোকার জন্য। এই খেলাটিতে যতক্ষণ না চোর হার মানে ততক্ষণ খেলা চলে।

কটিলাল খেলাটি আমরা যদি বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এখানে বৃত্তটি হল ইংরেজদের কুটির বা মহাজনদের খামার। আর 'চোর' হল তৎকালীন সাধারণ কৃষক বা শ্রমিক। এই খেলায় অন্যান্য খেলোয়াড়রা হল ইংরেজদের বা মহাজনদের অধীনস্ত কর্মচারী যারা সাধারণ কৃষক ও মানুষের উপর অত্যাচার চালাতো। সাধারণ মানুষের উপর এই অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনি অনুকৃত হয়েছে এই খেলায়।

এই খেলাটির দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পারব যে এই খেলায় হাতে ও পায়ের পেশী শক্তি, ভারসাম্য ও সহ্যশক্তি নির্ভর। চোরকে তার বৃত্ত থেকে বের করে এনে মারা, চোরের মার সহ্য করা এবং 'চোর' তার পা এর সাহায্যে বাকি খেলোয়াড়দের ছোঁয়ার চেষ্টার ক্ষেত্রে তা লক্ষণীয়।

পিট্টু ঃ

পিট্টু খেলার দুটি দলের নাম ড. অসীম দাস দিয়েছেন 'পুরন্দর' এবং 'দস্যু'। কোন দল আগে বল 'ছোঁড়ার সুযোগ পাবে তার জন্য টস করা হয়। এই খেলার পদ্ধতি হল — গড় বা মন্দির ভাঙার জন্য টসে বিজয়ীদের নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে প্রত্যেককে তিনবার করে বল ছোঁড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। বল ধরার জন্য অপর দলের ছেলেরা 'গড়' বা মন্দিরের পিছনে থাকে। বল মারার পর যদি এক ড্রপে অপর দল বলটি ক্যাচ ধরতে পারে তাহলে যে বল ছুঁড়ে সে আউট হয়। পরের জনও একই ভাবে বল ছুঁড়ে পাথরের মন্দিরটি যদি ভেঙ্গে দিতে পারে এবং অপর দল যদি

মন্দির ভাঙ্গার পর বলটিকে মাটিতে পরার আগে ধরতে পারে তাহলে অপর দলের সবাই আউট হয়। এরপর অপর দল একই ভাবে খেলবে এবং যদি ধরতে না পারে তাহলে মন্দিরের চ্যাপ্টা পাথর গুলি দিয়ে মন্দির তৈরি করার জন্য তারা চেষ্টা করবে। অপর দল বল দিয়ে তাদেরকে ছুঁড়ে মারবে যদি কাউকে স্পর্শ করে তাহলে আউট হয়। যদি কাউকে স্পর্শ করার আগে মন্দিরটি কেউ তৈরি করতে পারে এবং গড় তৈরি করে তিনবার দুই হাতের দুই আঙ্গুল দিয়ে মন্দিরটির চারপাশে তিনবার বৃত্তাকার দাগ দিয়ে যদি তিনবার পিট্টু বলতে পারে তাহলে তাদের এক পিট্টু হয়। কোন কারণে সেই সময় যদি পাথর পড়ে যায় তাহলে পিট্টু হবে না। আউট করতে পারলে অপর দল একই ভাবে খেলবে। পিট্টু ওরফে 'সাতচড়া' খেলার উৎস এবং স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে পল্লব সেন গুপ্ত তার 'লোকসংস্কৃতি সীমানা ও স্বরূপ' গ্রন্থে ড. অসীম দাসকে অনুসরণ করে বলেছেন — ''ঋগ্বেদে বর্ণনা আছে ইন্দ্র ওরফে পুরন্দরের নেতৃত্বে দেব বাহিনী এসে দাস তথা দস্যুদের 'অশ্বময়ী সপ্তপুরী' কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। পুরন্দরের অর্থ হল নগর বা দুর্গ ধ্বংসকারী, অশ্মময়ী পুরী অর্থ সঠিক ভাবেই মার্শাল করেছেন কাঁচা ইটের বাড়ি বা তৈরি শহর। দাস এবং দস্যু মূলে ছিল জাতির নাম। ... যারা সাত খোলামকুচিতে সাজানো 'গড়' আক্রমণ করে তাদের বলা হয় 'পুরন্দর' এবং 'গড়' যারা রক্ষা করে তাদের নাম এই খেলাতে দস্যু। অসীমের মতে সাতটি খোলাম কুচি হচ্ছে অশ্মময়ী সপ্তপুরীর প্রতীক।''[১৭]

এই খেলাটিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব এই খেলা হাতের ও পায়ের পেশী শক্তি, অনুমান ক্ষমতা , ভারসাম্যতা, ক্ষিপ্রতা ও গতি নির্ভর। এখানে চ্যাপ্টা পাথরের মন্দির লক্ষ্য করে বল ছোঁড়া মন্দির ভাঙার ক্ষেত্রে হাতের পেশী শক্তি ও অনুমান ক্ষমতা দরকার হয়। ছোটাছুটি করা বিপক্ষের দলকে ফাঁকি দিয়ে মন্দির সাজানো, বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা যারা পিট্টু করবে তাদেরকে লক্ষ্য করে বল ছুঁড়ে মারা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পায়ের পেশী শক্তি, হাতের পেশী শক্তি ও অনুমান ক্ষমতার দরকার হয়।

হাইস্প্রিং ঃ

হাইস্প্রিং খেলায় ''আবু দশ কুড়ি ...'' ইত্যাদি ছড়ার মাধ্যমে যে কোন একজনকে 'চোর' সাব্যস্ত করা হয়। যে 'চোর' হয় তাকে হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালিতে ধরে থাকতে হয় অনেক ইংরেজি উল্টো 'ইউ' (∩) এর মতো করে। অন্যান্য মেয়েরা তার পিটে হাত দিয়ে তাকে ডিঙিয়ে এদিক থেকে ওদিকে যায়। চোর এর উপর দিয়ে ডিঙানোর সময় যদি পা (যে ডিঙাবে তার পা) চোরের কোন অঙ্গে স্পর্শ হয় তাহলে সে আউট হয় এবং তাকে তখন চোর হতে হয়।

হাইস্প্রিং খেলায় চোর হওয়ার একটি ছড়া আছে প্রথমে খেলোয়াড় বা সবাই গোল করে দাঁড়ায় এবং ছড়াটি একজন বলে —

"আবু দশ কুড়ি নাড়ি ভুরি
চিংড়ি মাছের চরচরি
কে নিবে কত আনা
বলে দেও না।"

যার শেষে 'না' শব্দটি হবে তাকে যে ছড়াটি কাটে সে জিজ্ঞাসা করবে কত আনা, যাকে জিজ্ঞাসা করবে সে ৫, ১০, ১৫, ১৬ ইত্যাদি যে কোন একটি ছোট সংখ্যা বলে এবং যার শেষে এই সংখ্যা গণনা শেষ হয় সে 'উঠবে' অর্থাৎ সে আর চোর হবে না। আবার একই ভাবে গণনা চলবে এবং শেষ পর্যন্ত যে পড়ে থাকবে সেই হয় চোর। চোরকে ডিঙানোর সময় মেয়েরা খেলার বিভিন্ন স্তরে ছড়া কাটে।

প্রথমবার ডিঙানোর সময় বলে —
'হাইস্প্রিং'
দ্বিতীয়বার ডিঙানোর সময় বলে —
'ক্লাস থ্রি'
তৃতীয়বার ডিঙানোর সময় বলে —
'একতালা বাই (ভাই) বল্টু।'
চতুর্থবার ডিঙানোর সময় বলে —
'ডবল ডবল দুই তালা।'
পঞ্চমবার ডিঙানোর সময় বলে —
'আপনা মনি সপনা কাটে।'
ষষ্ঠবার ডিঙানোর সময় বলে —
'বাদল কি বট্‌কে
কানের দুল চট্‌কে
বাদলকি বট্‌কে।'
সপ্তমবার ডিঙানোর সময় সুর করে বলে —
'কেড়েণ্ডার ফুল
কানের দুল
কেড়েণ্ডার ফুল।'
অষ্টমবার ডিঙানোর সময় বলে —
'ঐ যে হর
তলির বর

তলির তলে
চিকন মাটি
ডাডুম ডাডুম বাজে।'

নবমবার ডিঙানোর সময় সুর করে বলে —

'খটু বাড়ি যাব না
কাটা মাছ খাব না
কাটা মাছের গন্দ
হাই স্কুল বন্দ।'

দশমবার ডিঙানোর সময় বলে —

'রঞ্জনা সরকার
গাছে ওটা দরকার
গাছ থেকে পড়ে গেলে
ওষুধের দরকার
ওষুধ নাই ঘরে
টাকা চুরি করে
সাতদিন পরে
জেল খেটে মরে।'

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৬২ দ্রষ্টব্য)

ছড়া কাটার সময় এক নিঃশ্বাসে (দমে) ছড়াগুলি বলতে বলতে 'চোরের' উপর দিয়ে ডিঙাতে হয়। দম ছাড়লে আউট হয়। শেষ বারে এক পা দিয়ে ডিঙাতে বা পার হতে হয়। তারপর 'চোর' বলবে পাতা আনতে এবং পাতা এনে চোরকে ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি পশু বানিয়ে বলে 'এই ঘোড়া/ছাগল তোর ঘাস তুই খা।' ছড়াগুলি দিকে তাকালে একটি লক্ষণীয় বিষয় চোখে পড়ে যে ছড়াগুলি ধাপে ধাপে ছোট থেকে বড় হয়েছে। ছড়া গুলি প্রথম দিকে কেন ইংরাজিতে এবং পরে কেন বাংলাতে হল, খেলার নাম কেন হাইস্প্রিং হল এই তথ্য পাওয়া যায় নি। আমাদের মনে হয় হাই অর্থাৎ 'উঁচু' স্প্রিং এর মতো লাফ দেয় তাই এমন নামকরণ।

এই খেলার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে খেলাটি পেশীশক্তি, ভারসাম্য, ও শ্বাস ধারণ ক্ষমতা নির্ভর। চোরকে ডিঙানোর সময় ছড়া কাটতে কাটতে চোরের এপার থেকে ওপার যাওয়ার ক্ষেত্রে, হাতের ও পায়ের পেশী শক্তি, খেলোয়াড়ের শ্বাসধারণ ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়।

আতাপাতা ঃ

ছেলে মেয়েরা হঠাৎ করে আতাপাতা খেলার কথা বলে সবাই একটি করে জায়গা দখল করে। সেই জায়গাটি একটি গাছ, বড় পাথর, মাটি উপরে অঙ্কিত বৃত্ত ইত্যাদি হতে পারে। যে সবার শেষে জায়গা দখল করে সে হয় চোর। তারা আগেই ঠিক করে নেয় যে কত পাতার খেলা হবে এক্ষেত্রে ৫, ৭, ১১ যে কোন সংখ্যার হতে পারে। যে চোর হয় সে অন্যান্য খেলোয়াড়দের পাতাগুলি আনার নির্দেশ দেয়। অন্যান্য খেলোয়াড়রা বিভিন্ন রকমের ছড়া কাটে যেমন — 'কিৎ কিৎ', 'চু-উ-উ' ইত্যাদি বলতে বলতে এক নিঃশ্বাসে বা দমে পাতা ঘরে নিয়ে আসে। ছড়া কাটা মাঝ পথে থেমে গেলে বা শেষ হলে যে নিঃশ্বাস ছাড়ে তাকে চোর ছুঁলে সে আউট হয়ে যায় এবং তাকে চোরের ভূমিকা পালন করতে হয়। এভাবে নির্দেশ মতো পাতা আনা শেষ হলে নির্দেশকের চোখ বন্ধ করে সবার পাতাগুলিকে একত্রিত করে বলের মতো গোল বানিয়ে তার হাত দিয়ে এক পাক ঘুরিয়ে একটু দূরবর্তী স্থানে গোলাটিকে লুকিয়ে রাখা হয়। অন্যান্য খেলোয়াড়রা চোরকে গোলাটি খুঁজতে বলে এবং গোলাটি খুঁজে না পেলে তাকে দেখিয়ে দেয় এবং চোর তখন সেই পাতা নিয়ে অন্য খেলোয়াড়দের ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে এবং যার গায়ে ঢিল লাগবে সে চোরের দলে হয় যায় এবং সেও তাদেরকে কিছু পাতা নিয়ে ছুঁড়ে মারে এই ভাবে সবাই আউট হলে আবার নতুন করে খেলা শুরু করা হয়।

কৃষির প্রথম পর্যায়ে জমির প্রয়োজন ছিল শিকার সংগ্রহের জন্য, ফলমূল, লতা গুল্মের জোগাড়ের কারণে এবং পশুচারণ ও চাষবাসের উপলক্ষে।[১৮] এই খেলাটির মধ্য দিয়ে মানুষের সঞ্চয় প্রবৃত্তি অনুকৃত হয়েছে। এখানে গাছ বা বৃত্ত হল গৃহ যেখানে মানুষ বিভিন্ন স্থান থেকে ধন সম্পদ এনে সঞ্চয় করে।

শরীরচর্চাগত দিক থেকে এই খেলাটিকে দেখলে দেখা যাবে যে, এই খেলায় হাত ও পায়ের পেশী শক্তি, পাতা সনাক্তকরণ করার ক্ষমতা, শ্বাসধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। আবৃত্তি করে পাতা আনতে যাওয়া, পাতা সনাক্তকরণ করা, গাছ থেকে পাতা পেরে আবার গৃহে ফিরে আসার মধ্যেই তা লক্ষ্য করা যায়।

মাথা লাঠি ঃ

মাথা লাঠি খেলায় প্রথমে সবাই বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে একজন সবার লাঠিগুলি নিয়ে আগের অঙ্কিত বৃত্তের মধ্যে খাড়াভাবে ফেলবে এবং যার লাঠি সবার নিচে থাকবে সে হবে 'চোর'। চোর বাছাই এর পর ভূমিতে আঁকা একটি বৃত্তের মধ্যে চোর নিজের লাঠিটিকে মাথার উপর ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে দাঁড়িপাল্লার মত ধরে থাকবে। অন্য খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন তার লাঠি দিয়ে চোরের মাথার লাঠিটিকে আঘাত করে যথাসম্ভব দূরে নিক্ষেপ করে। লাঠিবিহীন চোর

লাঠিধারীদের ছুঁয়ে দিতে চেষ্টা করে। লাঠিধারী খেলোয়াড় যদি কোন পাথর বা ইঁটের উপর নিজের লাঠিটি স্পর্শ করে রাখে তাহলে আর তাকে ছোঁয়া যাবে না। পাথর বা ইঁটে যদি লাঠি স্পর্শ না থাকে তাহলে চোর তাকে ছুঁতে পারবে। ছুঁয়ে দিতে পারলে পৃষ্ট ব্যক্তি চোর সাব্যস্ত হয়। এই ভাবে চোর লাঠিধারীকে ছুঁতে চেষ্টা করে এবং লাঠিধারীরা তার (চোর) লাঠিকে তাদের লাঠির সাহায্যে আরও দূরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। লাঠিধারী যদি পাথর ছুঁয়ে না থাকে এবং সেই সময় যদি চোর তাকে ছুঁয়ে দেয় তাহলে সে আউট হয়। যে আউট হয় তাকে একই ভাবে মাথার উপর লাঠি ধরতে হয়। যে চোর ছিল তাকে ঐ লাঠিটিকে মাথায় করে আনতে হয় এবং লাঠিটি যদি পড়ে যায় তাহলে আবার অন্যান্য খেলোয়াড়রা তার লাঠিকে বৃত্ত থেকে আরও দূরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সে যদি বৃত্তের কাছে নিয়ে আসতে পারে এবং বৃত্তের ঠিক মাঝখানে বা বৃত্তের মধ্যে লাঠিকে ফেলতে পারে তাহলে যাকে স্পর্শ করেছে সে আউট হয়। আর যদি বৃত্তের দাগের উপরে পড়ে তাহলে আবার একই ভাবে লাঠিটিকে বৃত্ত থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই খেলাটি 'লাল লাঠি' খেলার একটি পরিবর্তিত রূপ।

অক্ষর জ্ঞান শূন্য কৃষক ও শ্রমিকদের উপর ইংরেজ ও মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনি এই খেলার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। 'বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস' গ্রন্থে ড. অসীম দাস বলেছেন — "শুধুমাত্র সিঁদুর মাখানো পাথরের সাহায্যেই নয় দাঁড়িপাল্লাতেও কারচুপি ছিল। হাটে বাজারে সাঁওতালদের ঠকাইবার জন্য ভুয়া দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হত। লাল লাঠি চোর বৃত্তের মধ্যে একটি লাঠিকে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে মাথার উপর রেখে দেয় তা ঐ ভুয়া দাঁড়িপাল্লারই চিত্র। চোর নিজেই হল সেই দণ্ড যার সাহায্যে দাঁড়িপাল্লাকে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং মাথার উপরে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল লাঠিটিই হল দাঁড়িপাল্লার কাটা। ঐ লাঠি রূপী কাটার দুই পাশে দিয়ে দুটি কাল্পনিক পাল্লা ঝুলিয়ে দিলেই পাল্লার চিত্রটি পরিষ্কার হবে। এই দাঁড়িপাল্লার অধিকারীকে লাল-লাঠি ক্রীড়ায় 'চোর' হিসাবে সাব্যস্ত করার মধ্যে যে তাৎপর্য আছে তা এখন অস্পষ্ট নয়। ... মাথার উপর লাঠি রাখা চোরই হল ভুয়া দাঁড়িপাল্লার প্রতীক। এখানে যে খেলোয়াড়রা চোরের মাথা থেকে লাঠি ফেলে দেয় তারাই হল বিদ্রোহী সাঁওতাল।"[১৯] ড. অসীম দাস আরও বলেছেন — "যে বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে চোর মাথায় লাঠি ধারণ করে সেই বৃত্তটি হল মহাজনের খামার এলাকার চিত্র। ঐ খামার বাড়িতেই কৃষকদের ফসল ওজন করা হতো এবং ওজনে সাঁওতাল কৃষকজনকে প্রবঞ্চনা করা হত।"[২০] তারই চিত্র এই খেলাতে ফুটে উঠেছে।

শরীরচর্চা গত দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে এই খেলা হাতের পেশী শক্তি, ক্ষিপ্রতা নির্ভর। চোরের হাত থেকে লাঠিটিকে ছোঁড়া এবং ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের উপর লাঠি রাখার সময় হাতের পেশী শক্তি ও ক্ষিপ্রতা দেখা যায়।

ক্রীড়ার মাধ্যমে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন যেমন হয় তেমনি তাতে পাওয়া যায়

বিশুদ্ধ আনন্দ। তাই ক্রীড়ায় শরীরের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটে। একই সঙ্গে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই লোকক্রীড়াগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন — 'আতাপাতা', 'হাইস্প্রিং' খেলায় বালক বালিকারা পাতার নাম ও পাতা সনাক্তকরণ করার শিক্ষা লাভ করে। এছাড়া 'আতাপাতা', 'হাইস্প্রিং' ইত্যাদি ছড়ার খেলাগুলি ছন্দ মিল ও সুরবোধ তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। লোকক্রীড়ায় ব্যবহৃত যে সংখ্যা বাচক শব্দ 'চুঙ্গি লাঠি', 'পিট্টু' ও 'হাইস্প্রিং' ইত্যাদি খেলায় যথাক্রমে একশত, দুইশত করে দশ হাজার পর্যন্ত গোন্তি শেখে যোগ অঙ্কও শেখে। লাট্টু বা পিট্টু খেলায় মন্দিরের সাতটি পাথর থেকে তারা সাত পর্যন্ত গোন্তি করতে শেখে। হাইস্প্রিং খেলায় দশ, কুড়ি ইত্যাদি গণিত সংখ্যা শেখে। সমাজের প্রচলিত শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা 'কটিলাল', 'মাথালাঠি' লোকক্রীড়ায় মাধ্যমে স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। এই সব ক্ষেত্রে লোকক্রীড়াগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

গুল্লাছুট ঃ

বিশেষতঃ শীতকালের পড়ন্ত বেলায় ফসল উঠার পর ফাঁকা জমিতে এই ক্রীড়াটি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। প্রথমে দুইদল খেলোয়াড়ের মধ্যে গুল্লা নির্বাচন করে খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়। এই লোকক্রীড়ায় খেলোয়াড়ের কোন নির্দিষ্ট সীমা সংখ্যা নেই। গ্রামের বা পাড়ার সমস্ত খেলোয়াড়ই সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারে তা ৫/৭/১০/১১ যেমন জন সমাগম হবে তেমন সংখ্যাতেই খেলা হবে। এতে কোন দল প্রথমে ছুট বা দৌড় দিয়ে মাঠের লাইন অতিক্রম করে 'পাক্কা' হবে তা নির্ধারণ হবে টসের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, এখানে 'পাক্কা' হবার লাইনটি কোন দাগ কেটে বা রং দিয়ে করা হয় না, জমির আলকেই এখানে সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কাজেই একথা বলতে বোধ হয় আর সংকোচ নেই যে কৃষকের ঘরে ছেলেমেয়েরা কৃষিজমিকে ব্যবহার করেই শীতের অপরাহ্ন বেলায় খেলাটি সংঘটিত করে। ফলে এই লোকক্রীড়াটিতে কৃষির উপকরণই শেষ কথা তার জন্য বাজার থেকে কোন জিনিসের কেনবার প্রয়োজন হয় না। এই ভাবে লোকক্রীড়াটি কৃষিজীবী সমাজের ছেলেমেয়েদের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে চলে এসেছে।

এখানে যে দল প্রথমে ছুট দিয়ে 'পাক্কা' হবার জন্য মাঠের নির্দিষ্ট আলকে অতিক্রম করবে সেটা অতি সহজ কাজ নয়। এতে দৈহিক দক্ষতার প্রয়োজন। কেননা অপর দল সারি সারি ভাবে দাঁড়িয়ে 'পাক্কা' হতে আটকাবে। যদি অপর দল ওই দলের কাউকে ছুঁয়ে ফেলে তাহলে তৎক্ষণাৎ সে আউট হয়ে যাবে। আবার ছুটের দল যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় অপর দলের কাউকে ছুঁয়ে ফেলে তবে অনুরূপভাবে সেই খেলোয়াড়টিও আউট হয়ে যাবে। এভাবেই একদল আরেক দলকে গেম দিবে।

এই লোকক্রীড়ায় বৃত্তাকারে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ঘোরাঘুরি করতে করতে হঠাৎ ছুট লাগিয়ে পাকা হওয়ার মধ্যে ড. অসীম দাস গুপ্ত শস্য চূর্ণ করবার আদিম নাগরিক ব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন বৃত্তাকার স্থানে দাঁড়িয়ে নগ্নপদ দাস শ্রমিকেরা ফসলচূর্ণ করত।[২১] এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি উত্তরবঙ্গের কৃষিজীবী সমাজ ধান, গম বা ডাল জাতীয় শস্য ঝাড়াই বাছাইয়ের জন্য 'মারা' বা 'মলন' দিয়ে থাকে। তাতে উঠোনে বা খামারে কতকগুলি গরুকে একসঙ্গে বেঁধে বৃত্তাকারে ধান, গমের মধ্যে ঘুরানো হয় এবং তাতে ফসল চূর্ণ হয়। এই মারাই এর কর্ম পদ্ধতিটি উক্ত লোকক্রীড়ায় যে অনুকৃত হয়েছে এ কল্পনা কষ্টসাধ্য নয়।

মারবেল বা গুলিখেলা ঃ

কাচের গুলি দিয়ে দুই বা ততোধিক কিশোরেরা মিলে এই খেলা করে থাকে। প্রথমে একটি ছোট গর্ত করে হাত দশেক দূরে থেকে সবাই মিলে গর্তের দিকে গুলি ছুঁড়ে মারে। যার গুলি গর্তের কাছাকাছি থাকে সে প্রথম হয় এবং এরপর গর্তের কাছাকাছি থাকা গুলি দ্বিতীয়, তৃতীয় ... এই ভাবে নির্বাচিত হয়। প্রথম স্থান পাওয়া বালক গর্তে গুলি ফেলে এবং অন্যান্য গুলিতে তাক করে নিজের গুটিটি স্পর্শ করে দশ পর্যন্ত গুণে সে 'পাক্কা' হয়। এই ভাবে শেষে যে পড়ে থাকে সে 'চোর' বা 'মরা' হয়। এবার তাকে অর্থাৎ চোরকে সবাই মিলে গর্ত থেকে হাতের বিশেষ মুদ্রায় তার গুলিটিকে লাগাতে থাকে এবং প্রত্যেকবার লাগানোর সঙ্গে নিচের কথাগুলি বলে থাকে।

"একে ইন্দুর / দুইয়ে দাঁত
তিনে তেল্লি / চারে চোর
পাঁচে প্যাঁচা / ছয়ে ছুচ্চোর
সাতে শালিক / আটে আঁটি
নয়ে নাপিত / দশে ধোপা
এগারোয় অধিবাস / বারোয় বিয়া
তেরোয় বৌভাত / চোদ্দয় ( ) [সহবাস]
পনেরোয় পোয়াতি / ষোলোয় সাধ
সতের একছাওয়ার মাও / আঠারোয় দুই ছাওয়ার মাও
উনিশে অন্নপ্রাশন / কুড়িতে বুড়ি ইত্যাদি।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৬২ দ্রষ্টব্য)

এখানে মাটিতে খোঁড়া গর্তটি নারী যোনির প্রতীক হিসেবে ধরে নিতে অসুবিধা হয় না। 'ডাংগুলি' খেলার আলোচনা থেকেই এটা বোঝা যায়। খেলোয়াড় নিজের গুলিটিকে ঐ গর্তের

মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করার অর্থ হল নারী যোনিতে বীজ স্থাপনের চেষ্টা।[২২] এবং এর ফলেই ফসল উৎপাদন সম্ভব। কেননা জমি ও ভূমি সমার্থক ইতি পূর্বেই তা দেখানো হয়েছে। সুতরাং উর্বরাতান্ত্রিক ধর্ম ধারা অর্থাৎ ফসল উৎপাদন বা উৎপাদনাত্মক জাদু ভাবনাই যে এই লোকক্রীড়ায় অনুকৃত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকক্রীড়াগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক লড়াই, জমিদখল, কৃষিকর্মের বিলিব্যবস্থা এবং শিকার করা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়। চকরচাইল, ষোলপাইত, ষোলগুটি খেলার মধ্যে বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করায় বিষয়টি লুকিয়ে আছে। বৃষ্টি যা কিনা কৃষিকর্মের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত অর্থাৎ এই খেলাগুলিকে আমরা সহজেই কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। আবার রেখাঙ্কিত ছড়াযুক্ত খেলাগুলিকে প্রাচীন উর্বরভূমি দখলের লড়াই হিসেবে দেখতে পাই।

লোকক্রীড়াগুলির খেলুড়েরা শ্রমজীবী তথা কৃষিজীবী পরিবারের সদস্য। অবসর বিনোদনের জন্যই মুখ্যত খেলা হয় বলে, খেলুড়েরা নির্দিষ্ট কোন পোষাক ব্যবহার করে না। প্রায় প্রতিটি লোকক্রীড়া সফল ও অসফল খেলোয়াড় থাকে। ক্রীড়া সরঞ্জামের চেয়ে পেশি সঞ্চালন, উল্লম্ফন, শ্বাসবায়ু সংরক্ষণ ও নির্গমনের উপর জোর দেওয়া হয়। বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ লোকক্রীড়াগুলি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সব বয়সের পুরুষ মহিলা আলোচ্য লোকক্রীড়াগুলির মধ্যে রয়েছে।

নৃত্যধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি ঃ

কাতি পূজা ঃ

কার্তিক এর অপভ্রংশ কাতি। লোকসমাজে কার্তিক শস্য দেবতাদের মধ্যে অন্যতম। কার্তিক মাসের সংক্রান্তির আগে এই কৃষি দেবতার পূজা হয়। সাধারণতঃ বিবাহিতা বন্ধ্যা নারীরাই কাতি পূজা করে 'ছাওয়া' বা সন্তান লাভের আশায়। সন্তান লাভের আশায় যারা পূজা করে তাঁদেরকে বলে 'কাতির বর নেওয়া'। মহিলারা কাতি ঠাকুরের নিকট মানত করে ''কাতি মা তুই যদি মোক ছাওয়া দিস, ধন দিস তাহলে মুই তোক জোড়া পাঁঠা, ঢাকের বাজনা, দশ আইমাক ড্যাকেয়া পূজা দিম।'' আবার এই ব্রতের সঙ্গে কৃষি অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের দিকটিও জড়িয়ে আছে। ব্রতিনীরা একটি ঘটের চারিদিকে আলপনা দিয়ে নানা আচার পালন করে। সারারাত ধরে গান গাওয়া হয়। ফসলের শত্রু কীট এবং জীবজন্তু তাড়িয়ে দেওয়াই গানের বিষয়। কৃষি দেবতার মূর্তিটি বিসর্জন দেওয়া হয় না। শস্যক্ষেত্রে রেখে দেওয়া হয় শস্য রক্ষাকর্তা হিসেবে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন দেবসেনাপতি কার্তিক ও শস্য রক্ষার লৌকিক দেবতা কার্তিক সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ উভয় দেবতার চরিত্র বৈশিষ্ট্য ভিন্ন - 'কার্তিক ব্রত প্রকৃতপক্ষে কৃষিব্রত ; অতএব ইহার সঙ্গীতগুলিও কৃষি সঙ্গীতের অন্তর্গত হওয়াই সঙ্গত ছিল, কিন্তু এইসকল সঙ্গীত কৃষিকর্মোপলক্ষ্যে গীত হয় না; বরং বৎসরের নির্দিষ্ট দিবসে ব্রতোপলক্ষ্যেই গীত হয়'।[২৩] কিন্তু শস্যদেবতা কার্তিকের সম্পর্কে যে গানগুলি লোকায়ত সমাজে প্রচলিত তাতে কার্তিকের যে দেহ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা পাই, মনে হয় ইনিই সেই চিরসুন্দর দেবতা। আমাদের মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে আসলে তিনি বৃত্তি পাল্টে মানব প্রজনন থেকে উদ্ভিদ প্রজনন তথা ফসল উৎপাদনের দায়িত্ব নিয়েছেন।[২৪] একটি বিষয় এ ব্যাপারে স্মরণীয় রাঢ়বঙ্গে কোন কোন স্থানে নবান্ন উৎসবে কার্তিক পূজা হয়। এই কার্তিক 'নবানে কার্তিক'। নবীন ধান্যে নবান্ন হয়। নবান্ন একটি কৃষিকেন্দ্রিক লোকোৎসব। ফলে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের কাতি পূজাতেও যে সন্তান উৎপাদন ও শস্য উৎপাদনের ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে এ ব্যাপারে আমাদের আর সংশয় থাকে না।

হুদুমদেও পূজা ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের হুদুমদেও এর পূজা এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতির অন্যতম অলংকার। এখানকার কৃষিকর্ম প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তাই কখনো অনাবৃষ্টি কখনো অতিদীর্ঘ খরা আমন চাষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্তির জন্য রাজবংশী রমণীগণ আকাশ থেকে বসুমতীর শুকনো বুকে বর্ষণ নামানোর জন্য যে দেবতাকে পূজা আরাধনায় তুষ্ট করার চেষ্টা করে সেই লৌকিক দেবতার নাম হুদুমদেও।

সাধারণতঃ বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত কৃষ্ণপক্ষে

বিশেষ করে অমাবস্যার রাতে 'হুদুমদেও' এর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই দেবতার পূজার সময় অংশগ্রহণকারী রমণীগণ প্রত্যেকেই বিবস্ত্রা হয়ে অনুষ্ঠানের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে। পূজার স্থানে পুরুষদের উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলাদের একজন মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যদিয়ে হুদুমদেও এর পূজার কাজ সম্পন্ন করে। এই সময় সমবেত মহিলাগণ সংশ্লিষ্ট দেবতাকে কেন্দ্র করে রচিত গান গাইতে থাকে যেমন —

'সিল সিলাইছে কমড়টা মোর
শির শিরাইছে মোর গাও
কুণ্ঠে কেনা গেইলে এলা
হুদমার দেখা পাও।
পাটানিখান পড়িছে খসিয়া
আইসেক রে হুদুমা দেও
তোর বাদে মুই আছোরে বসিয়া
ডিংশালি ডিংশালি কমড়টা
তাতে নাই মোর ভাতারটা
কর কি মুই কায় বা কয়
কোনটে গেইলে দেখা হয়
দেখা হোলে দেহাটা জুড়ায়।'

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৮৩ দ্রষ্টব্য)

এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান। দুইজন রমণী বিবস্ত্রা হয়ে হাঁটুজুড়ে বসে কৃত্রিম বলদ সাজে। একজন কাঁধের উপর জোয়াল দিয়ে লাঙ্গল জুড়ে চাষ করে। সেই চাষ করা জমিতে শস্যের বীজ ছড়ানো হয়। কোথাও কোথাও কল্পিত ধানগাছের চারা লাগানো হয়। এরপর হুদুমদেও পূজার দলটি গানের তালে তালে নৃত্য করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায় সেই সময় গ্রামের কোন পুরুষই ঘর থেকে বের হবে না। কোনো বাড়িতে আলো জ্বালানো থাকলে হুদুমদেও খেলার দলটি বাড়িতে প্রবেশ করবার পূর্বে আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, বিবস্ত্রা অবস্থায় হুদুমদেও খেলার দলটিকে প্রত্যক্ষ করলে দৃষ্টিশক্তি চিরতরে হারিয়ে যাবে কিংবা দেবতার অভিশাপে বংশ নাশ হবে।

হুদুমদেও পূজার অন্যসব লৌকিক দেবদেবীর উপকরণ ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। যেমন, একটি কলাগাছ বা কলাগাছের পরিবর্তে বাঁশ, চিল, ফিঙে বা ঘুঘুর বাসা, গাঁয়ের সাত বাড়ি থেকে কুঁয়োর (তুষ) সংগ্রহ করে ছাম গাইনের সাহায্যে কুমারী মেয়ের দ্বারা তুষ কুটানো হয়। সেই কুটা তুষের পিঠা তৈরি করে হুদুমদেও প্রতীক হিসেবে কলাগাছকে

উৎসর্গ করা হয়। তারপর চুলের বেণী খুলে বিবস্ত্রা অবস্থায় বাদ্য বাজনাসহ নাচগানে মেতে উঠে।

হুদুমদেও পূজা সম্পর্কে W.W. Hunter এর মন্তব্য —" A singular relic of old superstition is the worship of the God Hudum Deo. The women of a villege assemble together in some distance and solitary place, no male being allowed to be present at the site of which is always performed at night, a paintain or young bamboo is struck in the ground and women, throwing of their garments, dance round the mystic tree, singing old song and charms.This rite is more especially performed when their is no rain, and the crops are suffering from drought."[২৫]

গ্রীসদেশেও এই রকম জাদুকৃত্য লক্ষ্য করা যায়। সে দেশের নাগরিকগণ দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে খরার প্রকোপ দেখা দিলে শিশুদের নিয়ে মিছিল করে। সেই মিছিলের পুরোভাগে একটি মেয়েকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দাঁড় করানো হয়। মিছিলটি বৃষ্টির দেবতার প্রতি প্রার্থনামূলক গান গেয়ে চলতে শুরু করলে মেয়েটি গানের তালে নাচতে থাকে। ঐ অবস্থাতেই মাঝে মাঝে জল ঢেলে মেয়েটিকে স্নান করানো হয়। এছাড়া পৃথিবীর বহুদেশের অধিবাসীগণ সংস্কার ও বিশ্বাসের জোরে অনাবৃষ্টি দূর করতে সংশ্লিষ্ট দেবতার সন্তুষ্টির জন্য আজও মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে নৃত্যগীত পরিবেশন করে থাকে। জর্জিয়া ককেশিয়ায় খরার কবল থেকে মুক্তির জন্য সে দেশের বিবাহযোগ্য মেয়েরাও উলঙ্গ হয়ে নৃত্যগীতের মাধ্যমে অনুরূপ অনুষ্ঠান করে থাকে। এই সময় মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় নিজেদের বলদ ও লাঙ্গল জোয়ালের কল্পনা করে গান ও নৃত্য করতে করতে কোনো বিল বা কোনো নদীর তীরে গিয়ে বৃষ্টির জন্য আবেদন জানায়। সুমাত্রায় গ্রামের সমস্ত মহিলারা মিলে অর্ধনগ্ন হয়ে নদীতে যায় এবং নদীতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা জল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। এবং সঙ্গে নিয়ে আসা একটি কালো রং এর বিড়ালকে জলে ফেলে দিয়ে তাকে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটিয়ে থাকে। বিশ্বাস, এতে বৃষ্টি নামবে।[২৬]

চোরচুন্নী ঃ

কোথাও তিনি বাও কালী, কোথাও হাওয়া কালী আবার কোথাও ভদ্রকালী। তিস্তা ও তোর্ষাপারের রাজবংশী সমাজে এই দেবীরা সম্পর্কে বোন। দীপাবলীর রাতে বোনদের পূজা ছাড়াও গ্রামের চাষী পরিবার মেতে উঠবে 'গছা দেওয়া' ও 'হকাহকি' উৎসবে; শুরু হবে চোরখেলা এবং চোরচুন্নীর গান মেলা। রাজবংশী সমাজে দীপাবলী উৎসব পরিচিত 'গছা' দেওয়া নামে। 'গছা' অর্থে প্রদীপ। প্রদীপ জ্বালানোর উৎসবের জন্য বাস্তুদেবতার থানে বা থানছিরির পাশে চারটি কলাগাছ পুঁতে তৈরি হয় ছোট মণ্ডপ। ঘরের দরজার সামনে দেওয়া হবে দুটি কলাগাছ।

গৃহবধুরা গোটা বাড়ি গোবর জল দিয়ে লেপে পরিষ্কার করে। সন্ধ্যায় পুরোহিত এসে প্রথমে নিকানো উঠোনে তুলসী থানে পূজা করে, তারপর পূজা হয় কলাগাছের তৈরি মণ্ডপে, এরপর দেওয়া হয় বাতি।

দীপাবলির রাতে ওই পূজারি রাজবংশী সমাজে 'অধিকারী' নামে পরিচিত। মণ্ডপে প্রদীপ জ্বালানো হয়ে গেলে গৃহবধূরা বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় মাটির প্রদীপ জ্বেলে দেয়। রাতভর এই প্রদীপ জ্বলে। অমাবস্যা লগ্নে এই উৎসবের শুরু ও শেষ। তাই রাত পোহালেই মণ্ডপের কলাগাছ তুলে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। রাজবংশী সমাজের অনেকেই দীপাবলীতে 'গছা' দেওয়া উৎসবের পরিবর্তে 'হকাহকি' অনুষ্ঠানে মেতে উঠে। এটাও আলোর উৎসব। তবে তার শুরু রাতে কালীপূজো শেষ হওয়ার পর থেকে। তথ্য দাতার মতে - অমাবস্যার অন্ধকারে গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলে ও মেয়েরা পাটকাঠির গোছায় আগুন নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রদক্ষিণ করে। এটাই হকাহকি। পূর্ব-পুরুষদের আশীর্বাদ কামনায় এই অনুষ্ঠান করা হয়।[২৭] গছা দেওয়া বা হকাহকি উৎসবের পাশাপাশি তিস্তা ও তোর্ষাপারের গ্রাম মেতে উঠে কালীর আরাধনায়। মহাশক্তির দেবী এখানে 'কালী ঠাকুরানি' নামে পরিচিত। গ্রামঠাকুরের থানের পাশে তার অবস্থান। তবে এই দেবীর কোন মূর্তি পাওয়া যায় না। আজকাল অবশ্য অনেক এলাকাতে পাথরের বদলে মূর্তির প্রচলন হয়েছে। গ্রামঠাকুরের থানের পূজা ছাড়াও রাজবংশী সমাজে আছে কাঁচা কালী, বুড়িকালী, পাগলি কালী। বছরভর তাদের পূজা হয়। গ্রামে ওলাওঠা বা কলেরার প্রকোপ দেখা দিলে সাধারণতঃ এই কালী ঠাকুরানিদের পূজা হয়ে থাকে। তবে দীপাবলির আগের দিন থেকেই উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় ঘরে ঘরে। চাষীপরিবারের কর্তা গোয়ালের গরুবাছুরকে স্নান করানোর পরে শিংয়ে তেল মেখে দেন। গরুকে বাখর খাওয়ানো হয়।

আর ঠিক এই অমাবস্যাতেই ঘরের ছেলেমেয়েরা মেতে উঠে চোর খেলায়। বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে গান গেয়ে তারা ভিক্ষে শুরু করে দেয়। এই নাচগানে কিছু এলাকায় মুখোশের ব্যবহার এখনও দেখা যায়। বাড়ির বড়রা চোর খেলায় খুব একটা অংশগ্রহণ করে না। তারা মেতে উঠে চোরচুন্নী গানে। ছোট ছেলেদের মতো তারাও বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে গান গেয়ে বেড়ায়। কালীপূজোর দিন থেকে একাদশী পর্যন্ত চলে এই খেলা।

'এলা হঠাৎ করিয়া আও করিছি
কোন্‌ঠে তোমার বাড়িঘর
আরে চেনাজানা দিয়া আগে
করেক আলাপন।'

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৯০ দ্রষ্টব্য)

আবার চোরচুন্নী খেলার পিছনে একটি মিথ্ আছে বলে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক মনে

করেন তিনি বলেন — " মৈযালি, বিরুয়া প্রভৃতির মতো চোরচুন্নী গানও কোনো নির্দিষ্ট বৃত্তি বা পেশাভিত্তিক। সে বৃত্তি হল — চৌর্য বৃত্তি। গোটা উত্তর ভারত জুড়েই চোরদের বৃত্তি নিয়ে নানা ও মিথ্ চলিত আছে। ... কোনো গৃহস্থ বাড়ি থেকে কিছু চুরি করে এনে, দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন সেই গৃহস্থের গৃহে গৃহস্থের অজ্ঞাতেই তা ফেরত দিয়ে আসতে পারলে চোর গোটা একবছর নির্বিঘ্নে সফলতার সঙ্গে চুরি করতে পারবে। চোরের সফলতা মানেই গৃহস্থের ক্ষতি। এই জন্য সে রাত্রে গৃহস্থেরা খুব সজাগ থাকে, যাতে চোর চুরি করা কোনো দ্রব্য ফেরত দিয়ে যেতে না পারে। গ্রামের কিশোররাও সারারাত 'চোর ডে চোরচোর' বলে ছড়া কেটে গৃহস্থকে সজাগ করে দেয়।"[২৮] ছড়াটি এইরকম —

'চোর ডে চোর
চোরের দাড়ি পাক্কা
চোর খাইল ধাক্কা।'

তিস্তা বুড়ি পূজা ও মেছেনী ব্রত ঃ

তিস্তা ও তোর্ষাপারের লোকসংস্কৃতিতে তিস্তাবুড়ি নামটি বিশেষভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত। তিস্তাবুড়ি দেবীকে কেন্দ্র করে সারা বৈশাখ মাস ধরে লোকায়ত রমণীরা ছাতা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে এক বিশেষ ধরনের গান পরিবেশন করেন এই গানকে বলে মেছেনী গান বা মেছেনী খেলা। তিস্তার পশ্চিমপারে এই গানকে বলা হয় ভেদৈখেলী। 'খেলী' বা 'খেলা' এখানে ব্রতচারণার একটি পর্ব। এই ব্রত অনুষ্ঠানে মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন নারীরা। মেছেনী শোভাযাত্রায় অগ্রে যে নারী থাকে তাকে বলে 'মাড়েয়ানী'। 'মাড়েয়ানী' ছাতার তলায় দেবী তিস্তার প্রতীক রূপে কিছু তিস্তার মাটি নিয়ে শোভাযাত্রার কালে এগিয়ে চলেন এবং মিছিলের অন্যান্য নারী কোঁচড় থেকে দই মাখা আতপচাল ছাতার ওপরে ছড়িয়ে দেয়। বৈশাখ মাস বছরের প্রথম মাস; প্রচুর শস্য কামনায় দেবী তিস্তার আরাধনা করা হয়। যাতে তিনি প্রচুর জল দিয়ে ধানি জমিকে সুজলা সুফলা করে রাখেন।

মেছেনী গান হল 'কৃষিব্রতমূলক লোকসঙ্গীত। তবে গানগুলির বিভিন্ন পর্বের মাঝে লৌকিক জীবনের ঘটনাকেন্দ্রিক গানও পরিবেশিত হয়।

আসিয়া লখমি মাও
মোর দুয়ারে দিলেক পাও
আগবাড়ি শুদ্ধ কর ...।

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৮৪ দ্রষ্টব্য)

মেছেনী খেলার মধ্য দিয়ে এখানে তিস্তা বুড়ির প্রশস্তি বা মাহাত্ম্য কীর্তন করার কারণ

হিসেবে আমরা বলতে পারি 'নদীর পারে বাস ভাবনা বার মাস'। কেননা নদী তার অফুরন্ত জলরাশি দিয়ে কখন তার দুই তীরকে প্লাবিত করে ধনজনের ক্ষতি করবে তা নদী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আবার কৃষিভিত্তিক গ্রামজীবনে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিতে নদীর পলিমিশ্রিত জলধারার অবদান অনস্বীকার্য, সব মিলিয়ে এমন ভরাভয় মূর্তি নিয়ে মানবজীবনে নদীর আবির্ভাব যে, তাকে পূজা না করে মানবকূল পরিতৃপ্ত হয় না। তাই হিন্দুদের প্রধান দেবতা শিবের সহধর্মিনীরূপে তিস্তাবুড়ির কল্পনা করে পূজিত হয়। ''আসলে তিস্তাবুড়ি পূজা একটি কৃষি কৃত্যবিশেষ। বিভিন্নকালে তিস্তানদীর যে তিনটি বিশিষ্ট ধারা বিভিন্ন অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত সেই স্থানগুলির নাম হইতেও বোঝা যায় যে, একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া ইহার অববাহিকা ছিল। তিস্তা তাহার দুই তীরের অববাহিকার জনপদগুলিতে কর্দমাক্ত জলের পলি ফেলাইয়া ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়তা করিত এবং তাহাতেই অধিক উৎপাদনের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইত। ... তিস্তাবুড়ির পূজার মূলে বন্যাভীতিও একটি অন্যতম কারণ ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অন্যদিকে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির বাসনা, প্লাবনের প্রবণতারোধের কামনা, রোগাদি দূরীকরণের ধারণা প্রভৃতির মধ্যে যে বিষয়টি অত্যন্ত গোপনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহা হইল কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস, এমনকি তিস্তাবুড়ি পূজার অঙ্গানুষ্ঠান মেছেনী খেলার মধ্যেও তাই জাদুবিশ্বাসের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। নৃত্যকালে তিস্তা নদীর প্রতীক কামনাটিকে একটি ছাতা দিয়া আবৃত করিয়া রাখা হয়। রৌদ্র নদীজলকে শুষ্ক করিয়া তাহাকে পীড়িত করে। এই বিশ্বাস হইতেই তাহাকে ছায়া করিয়া রাখা হয়।''[২৯] তিস্তা বুড়ি পূজা যে কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস সে বিষয়ে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন— অনেক সময় মিথের সঙ্গে ম্যাজিক জড়িয়ে থাকে। ... তিস্তাবুড়িরা পাঁচ বোন গুছিলক্ষ্মী, ডাকলক্ষ্মী, অঘনলক্ষ্মী ও পৌষলক্ষ্মী (তুলনীয় 'Five sister cult'), কিংবা হুদ্‌মারা সাত ভাই, এবং তাদের বোনের নাম 'ঝলঝলী' ইত্যাদি হল মিথের দিক। কিন্তু তিস্তার পাঁচ বোন যখন ধান গাছের পাঁচটি স্তরের প্রতীক হয়, এবং তিস্তার জল যখন সেই ধান চাষের সহায়ক হয়, তখন সেই মিথের সঙ্গে ম্যাজিক এসে পড়ে।[৩০] কাজেই একথা বলতে অসুবিধা নেই যে তিস্তাবুড়ি পূজা ও আনুষঙ্গিক মেছেনী বা ভেদৈখেলা ব্রত কৃষিজীবী মানুষের দ্বারা সৃষ্ট একটি কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি।

আকশোর হাকা/ভোগা দেওয়া ঃ

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন পোকা-মাকড়ের হাত থেকে সোনার ক্ষেতকে রক্ষা করার জন্য এই অঞ্চলের রাজবংশী কৃষকেরা নিজ হাতে বানানো পোকা তাড়ানোর দেশোয়ালী উপায় অবলম্বন করে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানটির নাম আকশোর হাকা বা ভোগা দেওয়া। এই লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস এর মাধ্যমে পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ দূর হবে এবং চমৎকার ফসল হবে।

জমিদারি যুগে জমিদার বাড়ির উঠোনে লক্ষ্মীদেবীর পূজার জন্য অস্থায়ীভাবে একটি ঘর বানিয়ে নিয়ে স্থানীয় অধিকারী বা পূজারীর দ্বারা লক্ষ্মীর ঘট পূজো করে একটি হাঁস বলি দেওয়া হত। পূজোর আগেই জমি থেকে একটি ধান গাছ মাটি সমেত বরণ করে আনা হত। বলির পর হাঁসের মাথাটি ঐ ধানগাছের গোড়ায় রেখে দেওয়া হত। এই কাজটি প্রজারাই করত। সেদিন সমস্ত প্রজারা জমিদার গৃহে হাঁসের মাংস দিয়ে ভুরিভোজন করত। বিকেলে সব প্রজারা জমিদার বাড়িতে প্রস্তুত পোকা তাড়ানোর ছাই ভস্ম ও খইল একটি ডালিতে নিয়ে প্রতিটি ধান ক্ষেত্রে অন্ততঃ একটি কোণে ছড়িয়ে দিত। এই ছাই তৈরি হয় 'জামুরী' (একপ্রকার বাতাবী) পাতা ও মুচি মাটি দিয়ে। এছাড়া প্রতিটি ধানক্ষেতের একটি কোণে কলার 'ডোকুনা' (পত্র মেরুদণ্ড) ও পাটকাঠির সাহায্যে তৈরি করে একপ্রকার পিলসুজ জ্বালানো হয়। ছাই ছড়াতে এক বিশেষ সুরে ধ্বনি দেওয়া হয়।

সগারে ধান আউল বাউল
হামার ধান সিদায় চাউল।

সগারে ধান টোনামোনা
হামার ধান কাইঞ্চা সোনা

আশ্বিন কার্তিক ভোগার ডাং
নাড়া ফাটি বিরাক ধান

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫৮ দ্রষ্টব্য)

'ভোগা দেওয়া' রাজবংশী জনজাতির লৌকিক প্রথা হলেও 'ভোগা' পদটি বাংলা ভাষাভাষি মাত্রই পরিচিত। ভোগা দেওয়া অর্থাৎ যন্ত্রণা দেওয়া। ভোগা হল শস্যের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ গুলিকে মেরে ফেলার প্রক্রিয়া। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কৃষিজীবী সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষকেরাই এসমস্ত অনুষ্ঠান করে থাকে। কাজেই একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে তিস্তা ও তোর্ষাপারের লোকসংস্কৃতির একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে কৃষি ও তার আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড।

গোরক্ষনাথের পূজা ও হাইচাও খেলা ঃ

তিস্তা ও তোর্ষাপারের প্রচলিত ধারণা গোরক্ষনাথ পূজা করলে গবাদি পশু রোগ মুক্ত থাকে। এতদঞ্চলের রাজবংশী জনগোষ্ঠী এই পর্বে শ্রীকৃষ্ণকে গোপালক হিসেবে পূজিত করেছে। আসরে বসে একজন মূল গায়ক গোরক্ষনাথের পাঁচালী পড়েন এবং শেষে আসর বন্দনা করে গোরক্ষনাথের গান করে এবং সমবেত দুয়ারিরা পিছনে ধুয়ো দেন। গোরক্ষনাথ ঠাকুর সন্তুষ্ট থাকলে গবাদি পশুর মড়ক লাগে না। ব্যাঘ্র জাতীয় হিংস্র জন্তুর এদের কোনোরূপ ক্ষতি করতে পারে না এবং গিরি ও গবাদি পশু দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হতে থাকে।[৩১]

আরে সত্যঠাকুর গোরক্ষনাথ গার্হস্থ্য দেও মোক বর
ধনে বংশে বাড়ুক গিরি চন্দ্র দিবাঙ্কর
মানুষ গরুর রোগ ব্যারাধি যাউক দক্ষিণ ভিতি
ও মোর বিধাতা গো ও মোর গোরক্ষনাথ'

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ৩০৯ দ্রষ্টব্য)

শ্রদ্ধেয় ড. চারুচন্দ্র সান্যাল বলেছেন যে জন্তু ও তস্করের হাত থেকে ধান ফসল রক্ষা করবার জন্যই এই পূজা।[৩২] এই পূজাটি কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে নির্ধারিত হলেও ধান, চাল, নগদ টাকা সংগ্রহের সুবিধার্থে আমন ধানের মরশুমে আট/দশজনের এক একটি রাখাল বালকের দল পৌষের শীতের সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে দক্ষিণা মাগন করে। শুধু দলবদ্ধ ভাবে গেলেই ধান চাল পাওয়া যাবে না তাদের গাইতে হবে 'হাইচাও' গান। এটাই হাইচাও খেলা নামে পরিচিত। একটি হাইচাও গানের নমুনা —

বল ভাই শুভে
ভাইরে ঘর থাকিয়া বিড়াইল হুলু
মাথায় নাগিল চাল
কাইসাও বাঙ্কা নিয়া হুলুর খ্যাড় কাটি বেড়ায়
খ্যাড় কাটি ইলুয়া কাটি
আরো কাটে কাশিয়া
- - - - - - - - - -
ওহে ঠাকুর গোর্খনাথ তুমি ভাল কর
গোর্খনাথের ধ্বনি দেবে উপরে সিঁদুর
তাহলে কৃপা করবে গোর্খনাথ ঠাকুর
বল ভাই শুভে।

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৯৬ দ্রষ্টব্য)

উচ্চস্বরে কিছু বলাকে 'হাইচাও' বলা যেতে পারে। সম্মিলিত রাখাল বালকরা প্রথমে সম্বোধন সূচক শব্দে শুভে উচ্চারণ করে, অতপর ছন্দোবদ্ধ করার গীত গায়। দলে একজন মূল গায়ক থাকে। সে এক একটি লাইন সুর করে বলবে তারপর সঙ্গীরা সেই সুরে গলা মেলাবে। হাঁ হচ্ছে মুখ ব্যাদান। এই মুখ ব্যাদানে উচ্চারিত গানগুলি 'হাইচাও' -এ আখ্যাত হয়েছে।[৩৩] বৃন্দাবনের রাখাল শ্রীকৃষ্ণকে গরুর পালনকর্তা বলা হয়। এই ধারণা থেকে এখানে শ্রীকৃষ্ণপ্রতিম গোরক্ষনাথ। একদল গাভীকে সামনে রেখে পূজার সামগ্রী নিয়ে বাদ্যযন্ত্রসহ পূজার আয়োজন চলে। গবাদি পশুদের রোগমুক্ত ও তাদের সার্বিক কল্যাণার্থে গোরক্ষনাথের প্রতি রাখাল বালকদের আবেদন গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। এই গানকে 'গাভী সিজ্জন' গান বলে।[৩৪] 'গাভী সিজ্জন' হল গাভীকে পুনরুজ্জীবিত করা। 'গাভী সিজ্জন' গানের খণ্ডাংশ —

উত্তর হতে আসিল পীর মুখে ঝম্পোদাড়ি
দই দুধ মাঙ্গিতে গেলাম নন গোয়ালের বাড়ি
গোয়ালা বলে আছেরে গোয়ালিনী বলে নাই
গোটোত পড়িয়া মৈল সাতশোয়া গাই
সাতশোয়া গাইরে তার নয়শোয়া বাছা
গাভীর বদলে ক্যান না মৈল মোর ব্যাটা।[৩৫]

এক্ষণে আমাদের বলবার বিষয় হল গবাদি পশু যেহেতু কৃষিকর্মের একটি অন্যতম উপাদান। তাই কৃষি সম্পর্কিত গৃহস্থ এবং গরুকে নিয়ে অনুষ্ঠানটিকে আমরা 'কৃষিকৃত্যক' বলে অভিহিত করতে পারি।

———

খ) শিল্পধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি

লোকশিল্প সম্বন্ধে সাধারণ ধারণাটি হল —গ্রামীণ কারিগরের হাতের কাজ। যাকে ইংরেজিতে বলে 'Folk-Art'। এইসব হাতের কাজের মধ্যে রয়েছে জন সমাজের সাধারণ ব্যবহার্য্য বস্ত্র, অলঙ্কার মাটির ও ধাতব বাসনপত্র, পাটের ও সুতোর তৈরি জিনিসপত্র, যানবাহন ইত্যাদি।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে যেহেতু কৃষিই রাজবংশী সমাজের জীবন ও জীবিকা তাই কৃষিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত শিল্পকর্ম গড়ে উঠেছে তা নিচের ছকটিতে দেখানো হল —

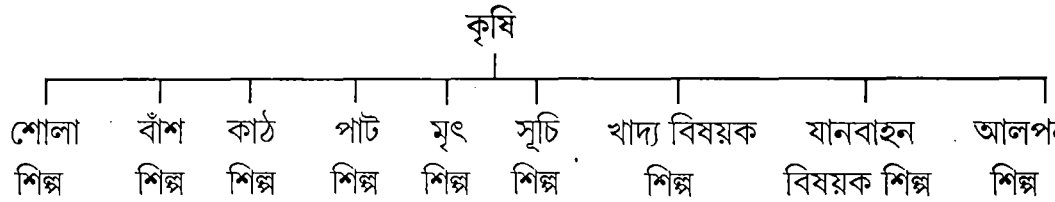

শোলাশিল্প ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে বা জীবনচর্যায় শোলাশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী ছাড়াও নাথ, গেননাই, তেলি, আদিবাসী সমাজ এবং মুসলিম সমাজেও শোলাশিল্পের ব্যবহার বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, রীতিনীতি, লোকাচার, লোকবিশ্বাসে শোলার কাজ নানাভাবে জড়িয়ে আছে, যা সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

শোলা একটি জলজ উদ্ভিদ। যার উদ্ভিদ বিজ্ঞান নাম হাল 'Aeschyomere Aspera'। বিল বা জলা-জঙ্গলে শোলা জন্মাতে দেখা যায়। বীজ থেকে শোলা গাছের জন্ম। বর্ষার শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে থাকা শোলার বীজ থেকে শোলা গাছে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চার-পাঁচ মাসের মধ্যে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের মধ্যেই শোলা গাছ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। সাধারণতঃ শোলা গাছ চার থেকে ছয় ফুট হয়ে থাকে, ছোট ছোট পাতা এবং মূল কাণ্ডটি ধূসর রঙের; এই রঙের ভিতরে থাকে ধবধবে সাদা অংশ যা শোলা শিল্পের মূল উপাদান। তিস্তা ও তোর্ষা পারে সাধারণতঃ তিন ধরনের শোলাগাছ দেখা যায়। — ১. জাতি শোলা (ভোত্‌লা), ২. কাঠুয়া শোলা এবং ৩. ভাত শোলা। জাতি শোলা বেশ নরম এবং মোটা, কাঠুয়া শোলা জাতি শোলার তুলনায় শক্ত।

এতদঞ্চলের শোলা শিল্পে মূলতঃ কৃষিভিত্তিক সমাজের নানাতর সাংস্কৃতিক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। নানা দেবদেবী, পূজাপার্বণ, কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচার, লোকবিশ্বাস, ব্রতকথা,

লোকনাট্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোলা নির্মিত শিল্পকলার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন - দুর্গা, বিষ্ণু, কালী ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্তি ও মুখোশ নির্মাণ, লৌকিক দেবদেবীর পূজার ক্ষেত্রে যেমন - তিস্তাবুড়ি, বিষহরি বা মনসা, যখা, মাশান, সত্যপীর, যাত্রাপূজা ইত্যাদি। শিশু ও কিশোরের খেলনা, বিবাহ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত, ব্রতচারকেন্দ্রিক, লোকাচারকেন্দ্রিক ক্ষেত্রেও শোলার ব্যবহার লক্ষ্য করবার মতন। নিম্নে শোলাশিল্পকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে[৩৬], যেমন —

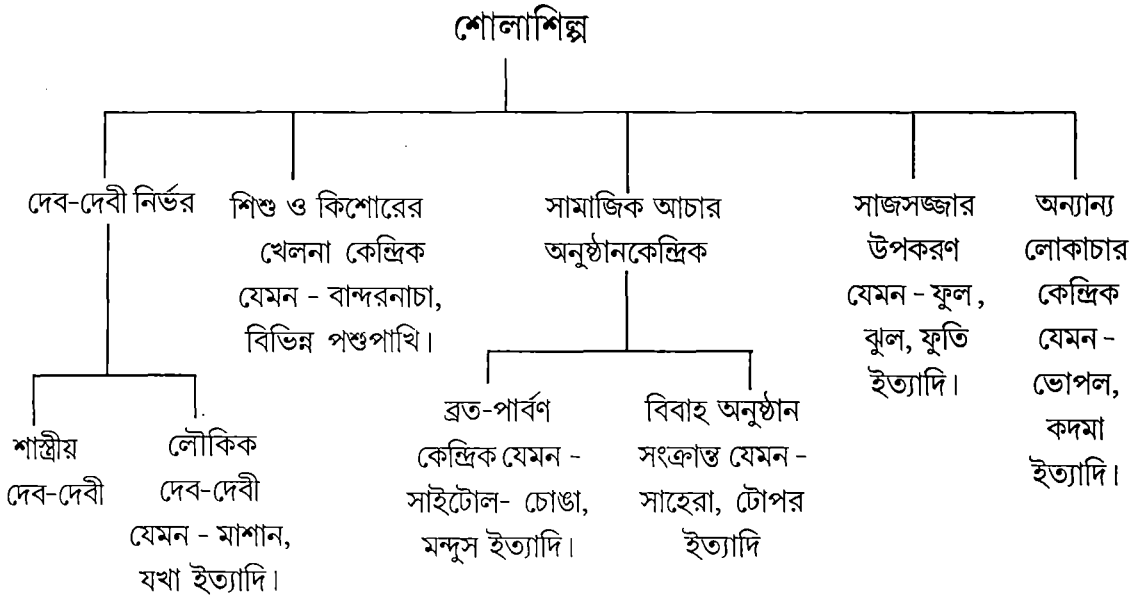

বাঁশশিল্প ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ উৎপাদন হয়। এখানকার লোকায়ত জীবনের বাঁশের গুরুত্ব অসীম এবং বাঁশশিল্প যথেষ্ট উন্নত। বসবাসের ঘরের খুঁটি থেকে শুরু করে চালের কাঠামো তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার। এই কাঠামোটি বাঁশশিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। লোকগানে পাই —

'ঘর খানি তোর চৌচালা
ঘন বাঁশের রুয়ারে।''

এতদঞ্চলের কৃষিজীবী সমাজ বাঁশঝাড় বা বাঁশবাড়িকে বিশেষ অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে লালন পালন করে থাকে। কারণ বাঁশ ছাড়া এখানকার লোকায়ত সমাজ অর্থহীন এবং দুর্বল। বাঁশ দিয়ে লোকশিল্পীরা সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র তৈরি করে। যেমন, বাঁশের খাট, বাঁশের চেয়ার, টেবিল, আলমারি, টুল, আলনা ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে খড়ের ঘরের একপাল্লার দরজা, কপাট, জানলা ইত্যাদি। নিত্য ব্যবহৃত সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফুলের সাজি, ঝাকা বা টুকরি, খেলনা গাড়ি, লবণ রাখার পাত্র, বাসনপত্র রাখার খোলা আলমারি, বিভিন্ন আকৃতির ঝুড়ি, গরুর মুখোশ বা টোনা, দোলনা, ডুলি, কুলা, চালন, কলমদানি, দাড়িপাল্লা, জমি থেকে ফসল ইত্যাদি আনার জন্য বাংকুয়া, গৃহপালিত পশু বাধবার জন্য খুটা ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্যের শিল্প নৈপুণ্য বাঁশ শিল্পীদের

কারিগরী দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বাঁশ দিয়ে তৈরি মাছ ধরবার বিভিন্ন উপকরণ (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)। এছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের মুখোশ ও মূর্তি এবং এই অঞ্চলের বিখ্যাত লোকবাদ্য বাঁশের বাঁশি। বাঁশ শিল্পের প্রধান উপকরণ মাকলা বাঁশ। এই বাঁশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এতে ঘুণ ধরে না। শুধু লোকশিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, এতদঞ্চলের সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যেই লৌকিক পূজাপার্বণ থেকে শুরু করে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত পর্যন্ত বাঁশের বহুল ব্যবহার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে। শিল্পকর্মের উপযুক্ত মাকলা বাঁশ ছাড়াও যে সকল বাঁশ এতদঞ্চলে জন্মায় সেগুলি হল নল বাঁশ, ঝাড়বাঁশ এবং মুলি বাঁশ। মুলি বাঁশ মূলতঃ অসমে উৎপাদিত হলেও কুচবিহারের অনেক জায়গায় এ বাঁশ জন্মায়। এই বাঁশের উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মের নিদর্শন হল বাঁশি। যেমন — আড় বাঁশি, মুরুলি বাঁশি, ব্যারল বাঁশি ও বেনু বাঁশি। একমুখ ও দুই মুখ খোলা বাঁশি এখানে প্রস্তুত হয়। আবার বিষহরি পালায় ব্যবহৃত মুখা বাঁশিও তৈরি হয় এরূপ বাঁশ দিয়ে।

আর্ট বা শিল্পকর্মের বা নক্শা ইত্যাদির ব্যাপারে এতদঞ্চলের স্থানীয় মানুষ বাঁশের উপর নির্ভর করেই অপূর্ব শিল্পকর্মের নিদর্শন রেখেছেন। জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক গ্রামীণ কৃষি সমাজের মানুষ। যাদের কুশলী দক্ষ হাতের স্পর্শে বাঁশ দণ্ডও বিমূর্ত থেকে মূর্ত হয়ে উঠে নান্দনিক শিল্পকর্মের মাধ্যমে। বাঁশি শিল্পের খ্যাতি তাই আজও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

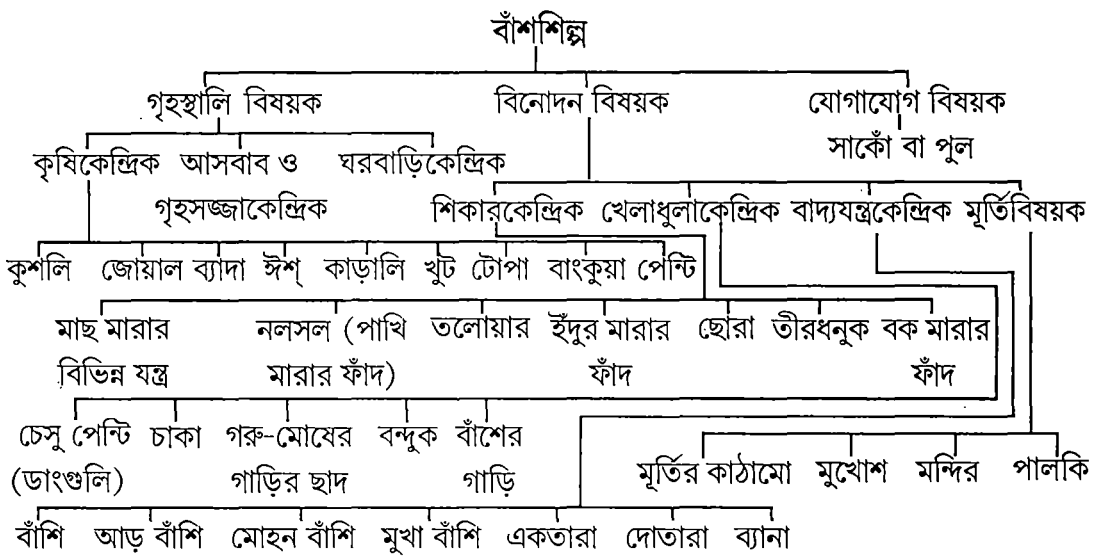

কাঠ শিল্প ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চল 'Tea, Tobbaco, Timber ও Tourism' এর জন্য বিখ্যাত। কেননা, অরণ্যে ভরা ডুয়ার্সে বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ সুলভে পাওয়া যায়। ফলে এখানকার কাঠ শিল্প যথেষ্ট উন্নত। ডুয়ার্সের কাঠের আসবাবপত্র শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এমনকি ভারতের বাইরেও রপ্তানি হয়। এখানকার উল্লেখযোগ্য কাঠের

দ্রব্যাদি হল — খাট, আলমারি, টেবিল, চায়ের টেবিল, আলনা, ঠাকুরের আসন, চেয়ার, ঘর সাজাবার উপকরণ। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মুখোশ, নৌকা, এলাকার বিখ্যাত লোকবাদ্য দোতরা, ঢোলক, সারিঙ্গা, ব্যানা, বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন — লাঙ্গল, বেদা, ঈশ্ ইত্যাদি। কাঠের মধ্যে খোদাই করা বিভিন্ন দেব-দেবী, জীবজন্তু, পাখি, ফুল, নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন কাঠশিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে। গ্রামীণ হাটগুলিতে আজও ধানভানার ছাম-গাইন, লাঙ্গল ক্রয়বিক্রয় হয়।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে লোকশিল্পের অঙ্গনে দারু ও কারুশিল্প একটি উল্লেখযোগ্য নাম। শুধু দৈনন্দিন জীবনের তাগিদেই নয়, এর বাইরেও বিভিন্ন পূজা ও ধর্মীয় উৎসবে এইসব জিনিসের চাহিদা রয়েছে। লোকশিল্পের নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখা যায় কাঠের গুঁড়ি ও কাঠের টুকরো, বাঁশের গুঁড়ি ও বাঁশ, পাটজাত দ্রব্য, এছাড়া কলাগাছ, পুরনো কাপড় ইত্যাদি দিয়ে ডোরা কাটা মেখলি কিংবা কাঁথা সেলাইয়ের মধ্যে শিল্পী তাঁর শৈল্পিক ও নান্দনিক চেতনার চোখে তুচ্ছ বস্তুকেও পরিণত করেন বিভিন্ন শিল্প সামগ্রিতে। এই দারুশিল্পেরই একটি আঙ্গিক হল 'কাঠখোদাই'।

এতদঞ্চলের কাঠশিল্প কর্মটি একচেটিয়া ভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সূত্রধর সম্প্রদায়ের হাতে প্রতিষ্ঠিত হলেও কালের বিবর্তনে মানুষের চাহিদার পরিবর্তন স্বাভাবিক। সেই সুবাদে দারু -তক্ষণ শিল্পের মধ্যেও ঘটেছে বিশাল পরিবর্তন। একদিন চণ্ডীমণ্ডপের খুঁটি, বাড়ির দরজা-জানালা রথ এবং কাঠের বিগ্রহ তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই শিল্পের বিস্তার। আবার এতদঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই খোদাই শিল্পের দক্ষ কারিগর আছেন যারা তৈরি করেন অনেক লোকবাদ্যযন্ত্র। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দোতরা ও সারিন্দা। এই দুটি লোকবাদ্যযন্ত্র তৈরিতে যেমন কাঁঠাল কাঠ উপযুক্ত, তেমনি কাঠের মূর্তি, পুতুল, কারুকার্য মণ্ডিত পশু-পাখি ইত্যাদি তৈরিতে উপযুক্ত কাঠ হল সেগুন, গামারী। আজও উত্তরবঙ্গ তথা নিম্ন অসমের একটি প্রচলিত কথা হল "কাঠের দোতরা কথা কয়।"

কাঠশিল্পের মূল যন্ত্রপাতি হল — করাত, ছোট বাটালি, হাতুড়ি, পেন্সিল, শিরিস কাগজ, অনেকক্ষেত্রে ফেবিকল আঠা। শিল্পী প্রথমে কাঠের টুকরোর উপর কল্পিত মূর্তি পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করে নেন। তারপর সেই স্কেচ অনুযায়ী ছোট বড় বিভিন্ন বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে মূর্তির অংশ ধরে কাজ শুরু করতে হয়। মুখ ও চোখের কাজ সবার শেষে করেন।

পাটশিল্প ঃ

তিস্তা তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাটের চাষ হয়। পাটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা পাটশিল্পের উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায়। এতদঞ্চলের পাটশিল্পের শিল্পী প্রধানতঃ রাজবংশী মেয়েরা। বাঁশ ও কাঠের সাধারণ সরু কাঠি দিয়ে মহিলারা যে দ্রব্য উৎপাদন করে তার নাম

ধোকোরা। ধোকোরা দেশী তাঁতে তৈরি এক ধরনের চট। তবে মিলে তৈরি চটের তুলনায় অনেক বেশি মোটা। একটি ধোকোরা দুই বা তিনটি ভাগে তৈরি হয়। এক একটি অংশের দৈর্ঘ্য ৫ বা ৬ ফুট এবং প্রস্থে ২.৫ থেকে ৩ ফুট হয়। দুই বা তিনটি অংশ একসঙ্গে সেলাই করে একটি পূর্ণ ধোকোরা নির্মিত হয়। ধোকোরা গ্রামের বাড়িতে বসার কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া চৌকি বা খাটের উপর পেতে তার উপরে চাদর দিয়ে শোবার বিছানা করা হয়। আবার কোথাও কোথাও ধান শুকানোর (বিশেষ করে সেদ্ধ ধান) কাজেও ব্যবহৃত হয়। ধোকোরা তৈরির সময় রং ব্যবহার করে রঙিন ধোকোরাও তৈরি করা হয়। এছাড়া পাট শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাটের দড়ি এবং শিকা।

দড়ি ঃ

পাটের আঁশ ভেঙ্গে রাজবংশী সমাজ বিভিন্ন মাপের 'সুতলি' বা 'বাটি' তৈরি করেন। প্রাচীন কাল থেকেই এই শিল্পের গুরুত্ব সুবিদিত। কারণ এতদঞ্চলের ৮০/৯০ শতাংশ মানুষের ঘর খড়ের এবং খড়ের ঘর নির্মাণে 'বাটি' বা 'দড়ি' ব্যবহার অপরিহার্য। রাজবংশী সমাজের মানুষ 'ঢেরার' (কাঠের তৈরি যন্ত্র) সাহায্যে এই 'বাটি' তৈরি করে। বলা হয়ে থাকে —

'পাকাইলে দড়ি
না পাকাইলে পাটা।'

এই পাটের তৈরি দড়ি রাজবংশী গৃহস্থালীতে নানা কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। গৃহপালিত পশু যেমন, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বাঁধবার জন্য 'উটকনের' সাহায্যে তৈরি দড়ির ব্যবহার দেখা যায়।

শিকা / শেকিয়া ঃ

সংস্কৃত 'শিক্য' শব্দ থেকে শিকা শব্দের উদ্ভব। শিকা প্রকৃত পক্ষে বয়নশিল্পের গোত্রভুক্ত। মূলতঃ পাট দিয়ে তৈরি শিকা হলেও শণ, নারকেল দড়ি ও খড় বা ঘাস দিয়েও তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মালদা প্রভৃতি জেলাতে যেমন পাটের শিকা দেখা যায় তেমনি বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদেনীপুর ইত্যাদি জেলায় শণ বা বাবুই দড়ির শিকা বেশি লক্ষণীয়।[৩৭] বাংলাদেশের সর্বত্রই নানান আকারের ও প্রকারের শিকা দেখা যায়।

রাজবংশী সমাজে পাট দিয়ে ব্যবহৃত শিকার ব্যবহার পাওয়া যায়। এতদঞ্চলের পল্লী নারীরা দুধ, দই, ঘি, গুড়, মাছ, মাংস বা অন্যান্য খাবার হাঁড়িতে রেখে হাড়ি শুদ্ধ শিকাতে ঝুলিয়ে রাখে। খাবারের পাশাপাশি লেপ, কাথা, বইপত্তর ইত্যাদিও শিকাতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এর উচ্চতা এমন হয় যাতে কেবল বড়রাই এর নাগাল পেতে পারে। লোভনীয় খাবার শিকাতে

ঝুলিয়ে রাখলে বিড়াল, কুকুর, পিঁপড়ে ও ছোটদের হাত থেকে তা রক্ষা পায়।[৩৮] কখনও কখনও পাট কড়া বা হালকা পাকিয়ে বা নানান গিট দিয়ে শিকায় বিভিন্ন ফুলজাতীয় নক্‌শা ফুটিয়ে তোলা হয়। আবার কখনও শিকার গায়ে পুঁতি, ঝিনুক ও কড়ি দিয়েও নকশা করার রীতি দেখা যায়। যার মধ্য দিয়ে উর্বরতাতন্ত্রের ধারণাটি সহজেই প্রতীতি হয়।

মৃৎশিল্প ঃ

তিস্তা ও তোর্ষাপারের গ্রাম এলাকায় কাঁচা ঘরের মাটির দেওয়ালে নানা প্রকার শিল্পকর্ম চোখে পড়ে সেগুলি মৃৎশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সাধারণতঃ বাঁশের বা বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরি বেড়ার উপর মাটি দিয়ে প্রলেপ দিয়ে তার উপর মাটি দিয়েই নানান ধরনের লতা-পাতা, ফুল, পাখি, জীবজন্তু, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি আঁকা হয় এবং মাটি হাল্কা করে জলে গুলে লেপে দিয়ে রং করে দেওয়া হয়। এই শিল্পকলার নান্দনিক দিক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গৃহসজ্জার জন্য অবশ্য বাংলার প্রায় সর্বত্র জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ফুল পদ্ম, লতাপাতা, ধানের ছড়া, গৃহ, ধানের আটি, মাছ, ময়ুর, হাতি ইত্যাদির অলংকরণ আপাতদৃষ্টিতে আনুষ্ঠানিকতায় সম্পর্ক বিযুক্ত হলেও আদিম জাদুবিশ্বাস-সম্ভূত কৃষি ও নারী জীবনের কামনা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্বন যে ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই।[৩৯] এছাড়াও রয়েছে মাটির ঘট, কলসি, সরা, নানা ধরনের খেলনা, পশুপাখির মূর্তি, দেবদেবীর প্রতিমা ইত্যাদি। পূজা ও উৎসব ভেদে ঘটের নানা নাম, যেমন — দ্বারঘট, মঙ্গলঘট, মঙ্গল কলস, দেবীঘট, জলঘট, লক্ষ্মীঘট, ধর্মেরঘট, নাগঘট ইত্যাদি। পূজার যে আচার ও ভাবনা নিয়ে ঘটস্থাপন করা হয় তা গভীর তাৎপর্যবোধক ও দার্শনিক ভাবনাযুক্ত। যেমন ঘটটিকে জলপূর্ণ হতে হবে। কারণ জলই জীবন বা প্রাণ। জলে প্রাণ শক্তির প্রতিষ্ঠা। ঘট বা কলসী সর্বদেব সমন্বিত। দেবদেবী বা তাঁর সহচরগণ সেই জলপূর্ণ ঘটে অধিষ্ঠিত হয়ে স্থির ভাবে বিরাজ করুণ-পূজকের এই কামনা।[৪০] কিছু মৃৎঘটে আবার নিপুণ ভাবে কতগুলি সর্পফণা সজ্জিত হয়। এর নাম নাগঘট। যেহেতু এই ঘটকে মনসার প্রতীকে পূজা করা হয় তাই এর সঙ্গে উর্বরাতান্ত্রিক ভাবনা গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট।[৪১] পশুপাখি মূর্তি ও দেবদেবীর মূর্তি যেমন ভাগুানী, বিষহরি, মাশান, লক্ষ্মী, কালী, গোন্নাথ ইত্যাদি দেবদেবীর ব্যঞ্জনা ও প্রতীক সম্বন্ধে যথাযোগ্য স্থানে আলোচিত করা হয়েছে।

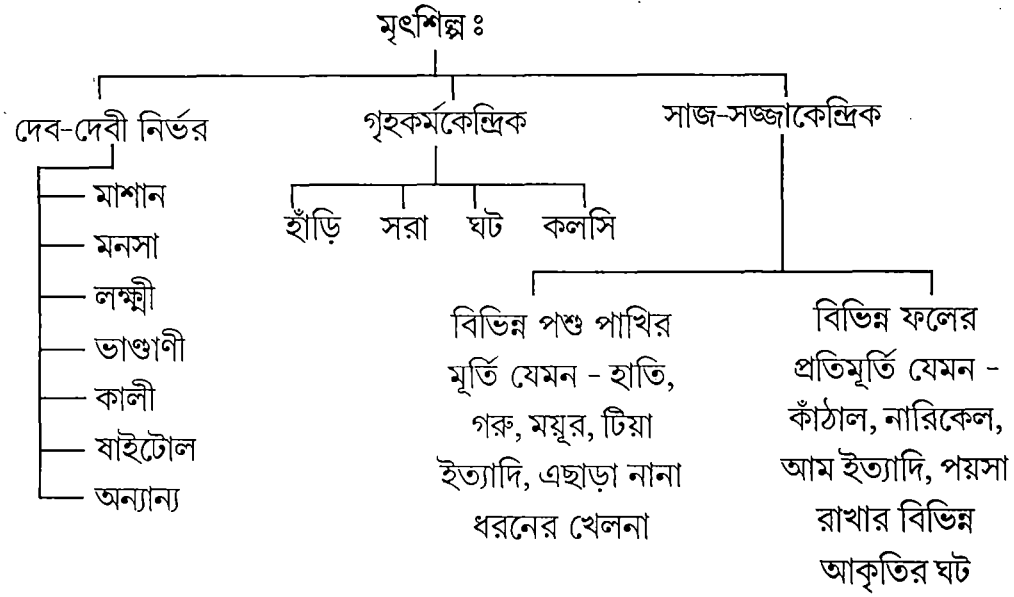

বেত শিল্প ঃ

বাঁশশিল্পের পরেই আসে বেত শিল্পের কথা। কুচবিহারের নিশিগঞ্জ, ঘুঘুমারি প্রভৃতি অঞ্চলে বেতের চাষ হয়। অপরদিকে জলপাইগুড়ির কুমারগ্রামদুয়ারে বেতের বহুল চাষ দেখা যায়। বেত দিয়ে নানা ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করেন শিল্পীরা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বেতের টেবিল, দোলনা, আলনা, চায়ের টেবিল, শীতল পাটি, নানা ধরনের খেলনা, ধামা, দোন বা দুন ইত্যাদি।

সূচিশিল্প ঃ

কাঁথা ঃ

সূচিশিল্পের ধারা সভ্যতার শুরু থেকেই প্রবহমান। আদিম মানুষ পাতার সঙ্গে ফুল লাগিয়ে সুন্দর করে নিজেকে এবং ঘরদোর সাজাতো। এই ভাবেই সূচিশিল্পের জন্ম হয়। প্রথমে হাড়ের সূচ ও পরে ব্রোঞ্জের সূচের ব্যবহার মিশরীয় অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। কাঁথার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রভাস সেন বলেছেন — 'The tradition of Kantha embroidery is very old. It is mentioned in the definitive sanskrit grammer written by Panini around the sixth century B.C. and also in the epic of Ramayana of Valmiki about two century later. The earliest mention of Kanthas in Bengali literature is found in the charyapadas - the earliest known verses in an old form of Bengali that prevailed from the 8th to 11th centuries A.D.[৪২]

কাঁথাশিল্প সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন — "সামান্য শাড়ি ও ছেঁড়া কাপড়ের উপর

কত চিত্র বিচিত্র কারুকার্য দেখাইয়া তাহারা যে কাঁথা ও বালিশের খোল, পানের বটুয়া তৈরি করিতেন তাহাতে তাহাদের শয্যাগৃহ ছিল চিত্রশালা।"[৪৩] কাঁথাশিল্প হল গার্হস্থ্য তথা কৃষি জীবনের এক বিশেষ মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। কাঁথাশিল্পী নানা রঙের সুতো দিয়ে সূচের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলেন এক অপূর্ব শিল্প ধারাকে। 'নকশাগুলির মূলে একটা ঐক্য এবং সন্নিবদ্ধতা সহজেই চোখে পড়ে। কাঁথায় গায়ে ফোটানো এইসব নক্‌শাগুলি কাঁথার ব্যবহারিক দিকটাকে অনুল্লেখযোগ্য করে এর ইঙ্গিতময়তার দিকটাকেই বড় করে তোলে। কাঁথার বৈশিষ্ট্য সাধারণ সূচি শিল্প থেকে কাঁথা শিল্পকে একটু কৌলিন্য সম্পন্ন ও স্বতন্ত্র করে রেখেছে।[৪৪] কাঁথার মধ্য দিয়ে সমকালের বহু জিনিস চমৎকার ধরা পড়ে। এর মধ্য দিয়ে তখনকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানা যায়। কাঁথাশিল্পে বাংলার নারীদের সৃজনশীল প্রতিভার চমৎকার বিকাশ ঘটে।

কাঁথা হল গ্রামজীবনের অপরিহার্য ও সজীব শিল্প সাধনা। কাঁথা তৈরির পিছনে কিছু কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার পরিলক্ষিত হয়। পল্লীবাংলার মেয়েরা উঠোনে বসে বিকেলের মধ্যে বা সন্ধ্যায় পূর্বেই কাঁথা সেলাই শেষ করবেন। রাতে সেলাই করবেন না কারণ এই বিশ্বাস যে, রাতে সেলাই করলে পরিবারে দারিদ্র্য আসবে। বিশ্বাসের সঙ্গে কিছু সংস্কারও জড়িয়ে আছে। একমাত্র বিবাহিতা নারীরাই কাঁথার নক্‌শা তৈরি করবেন। অবিবাহিত মেয়েরা কখনওই করবেন না। যদি কোন গর্ভবতী নারী কাঁথা সেলাইয়ের সময়ে স্বপ্ন দেখেন তাহলে তার কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে।[৪৫]

"কাঁথাতে নানা রঙের সুতোর বাহারে তৈরি বিচিত্র ছবি ও দৃশ্য শিল্পীর নৈপুণ্যে জীবন্ত ও চলমান গতির মোহ সৃষ্টি করে। এইসব গ্রাম্য শিল্পীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা কথা জানতে হলে কাঁথাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা খুবই প্রয়োজন। কারণ আজও মাতা যে কাঁথা খানি রচনা করিতে শুরু করিয়াছেন, জীবনে তাহা শেষ করিতে পারেন নাই। সেই অসমাপ্ত কাঁথা লইয়া তাঁহার কন্যা বসিয়া গিয়াছেন, তিনিও উহা শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহার কন্যা হয়তো উহা শেষ করিয়াছেন, এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।"[৪৬]

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের মেয়েরাও সূচিশিল্পে পিছিয়ে নেই। সূচিশিল্পের মধ্যে প্রধান হল কাঁথা। নক্‌সি কাঁথা এখানে হয়তো খুব প্রচলিত নেই তবে কাঁথায় নক্‌শার অভাব দেখা যায় না। কাঁথার উপরে সুতো দিয়ে অঙ্কিত বিভিন্ন যেমন, ফুল, ফল, পশু, পাখি চিত্র ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর। কাঁথায় এই প্রতীক বা চিত্রগুলি কাঁথাকে বিশেষ লোকশিল্পের মর্যাদা দিয়েছে। কাঁথার প্রতীকগুলি যেমন বাংলার পরিবেশ ও সংস্কৃতিগত তেমনি কাঁথাশিল্প তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবন ও সংস্কৃতিগত। কাঁথাশিল্পী তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবন ও জগৎকে যেমন করে দেখেছেন তাকেই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কাঁথার নক্‌শায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কাঁথার কিছু মোটিফে আদিম জীবন ভাবনার অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়। কিছু মোটিফ যেমন —

সূর্য ঃ সূর্য হল সমস্ত শক্তির আধার বা ক্ষমতার প্রতীক।

মাছ ঃ

মাছ হল উর্বরতার প্রতীক। কাঁথাতে এই ধরনের মোটিফের ব্যবহার করা হয় মঙ্গলজনক হিসেবে। বিবাহযোগ্য মেয়েদের জন্য যে কাঁথা সেলাই করা হয় তাতে মাছের প্রতীক থাকে। মাছ জীবন সংরক্ষণ ও জীবনের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত। অর্থাৎ জীবনের প্রতীক। কাঁথায় মাছের মোটিফ দেওয়া হয় বিবাহিতা কন্যার উর্বরতার প্রতীক হিসেবে।[৪৭]

জ্যামিতিক নক্‌শা ঃ

বৃত্ত, আয়তাকার, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি জ্যামিতিক নক্‌শাগুলি কৃষিজমির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত। অর্থাৎ মানুষ যবে থেকে কৃষিকাজ করতে শিখল তখন থেকেই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কৃষিজমি দখলের লড়াইতে সামিল হয়। সেই আদিম জমি দখলের লড়াই এখানে কাঁথার নক্‌শায় অনুকৃত হয়েছে।

ধানের শীষ ঃ

কৃষকের প্রধান ফসল ধান। ধান ভাল হলে খাওয়ার অভাব হবে না। ধানের কামনাত্মক মোটিফটি উর্বরতার প্রতীক হিসেবে কাঁথায় ব্যবহৃত হয়েছে।

ডাব ও কলা ঃ

উর্বরতার প্রতীক। ধনে-মানে-জনে ডাব ও কলার মতই যেন সংসারে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। লোকগানে পাই —

'ধনে বংশে বাড়ুক গিরি
চন্দ্র দিবাঙ্কর।'

পাখি ঃ

পেঁচা, মোরগ, পায়রা, চড়াই ইত্যাদি পাখির নক্‌শা কাঁথায় দেখা যায়। পেঁচা লক্ষ্মীর বাহন। তাই মঙ্গল ও সৌভাগ্যের প্রতীক। পায়রা, চড়াই, মোরগ ইত্যাদি পাখি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা যে এইসব পাখির যৌন ক্ষমতা অত্যন্ত প্রখর। এই প্রখরতার ক্ষমতায় যেন সন্তান লাভ হয়।[৪৮] এই কামনাত্মক মনোভাব থেকে নারীরা এইসব পাখিদের রূপ কাঁথায় চিত্রায়িত করেন। অন্যদিকে পাখি কৃষকের পরমবন্ধু। প্যাঁচা ইঁদুর খেয়ে যেমন কৃষকের উপকার করে তেমনি ফিঙে, বক, চড়াই ইত্যাদি পাখি পোকামাকড় খেয়ে কৃষকের ফসলের উপকার করে। এই ধারণা থেকে কৃষকেরা ধানের ক্ষেতে পুঁতে দেয় বাঁশের 'আগা' বা 'আগালি'। এই কৃতজ্ঞতা থেকেও কাঁথায়

এই মোটিফটি এসে থাকতে পারে বলে আমাদের মনে হয়।

পাতা-ফুল-ফল ঃ

পাতা, ফুল ও ফলের উদ্‌গমের মধ্য দিয়ে জন্ম, পরিণয়, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে কাঁথায় চারকোণে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। এটি প্রাণ ও উর্বরতার প্রতীক।

হাতি ঃ

হাতি হল দেবরাজ ইন্দ্রের বাহনের প্রতীক আবার অন্যদিকে পল্লীগ্রামে নবাব, জমিদার বা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের হাতির পিঠে চড়ে যাওয়ার চিত্রটি নারীরা কাঁথায় সূচ-সুতো দিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন। এবং মনে মনে এই কামনা করতেন যে, কাঁথাটি যাকে দেওয়া হবে সে যেন পরবর্তী সময়ে সংসার জীবনে হাতির পিঠে বেড়াতে পারে।[৪৯] অর্থাৎ সে যেন ধনী ও সমৃদ্ধশালী হয়। কৃষিকেন্দ্রিক উপকরণ — কাস্তে, মই ইত্যাদি কৃষিজীবী সমাজ সম্পৃক্ত উপকরণ যা কৃষক রমণী কাঁথায় বিচিত্র করে থাকে। এর মধ্য দিয়ে কৃষিকেন্দ্রিক জাদুভাবনা অনুকৃত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

আলপনা ঃ

বিবর্তনের নিয়মে আদিম মানুষ চেষ্টা করে চলেছিল নিজেকে প্রাকৃতিক ও জান্তব প্রতিকূলতা থেকে ক্রমাগত রক্ষা করার। তখন আত্মরক্ষার দায়িত্বপালন করতেই অতিবাহিত হয়ে যেত জীবন। পশুপালন ও খাদ্যগুণে ভরা ফসল ফলানোর সার্থকতার আসরে একসময়ে মানুষ মনে বাসা বাঁধলো হিংসা ও পরশ্রী কাতরতা। আদিম মানুষের প্রায় সবকিছুই দেহভিত্তিক। শরীরের শক্তি যার বেশি তিনিই থাকবেন এমনই ছিল জীবনের নীতি। প্রায় ন'হাজার বছর আগে নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ প্রথম তার নিজস্ব বাসস্থান তৈরি করে।[৫০] আবাদি জমির বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে অথবা তার আগে পশু শিকারের সুবিধার্থে কিংবা হিংস্র পশুর থেকে রক্ষার্থে সূত্রপাত হয় গোষ্ঠী চেতনার, শুরু হয় দুর্বলের সঙ্গে সবলের দ্বন্দ্ব। গুহাশিল্পীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেউ বলেন, আত্মরক্ষার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ব্যবহার করা হত জন্তু-জানোয়ারের শিকারের সেইসব দৃশ্যাবলী। আবার কেউ বলেন, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাই মানুষকে শিল্প রচনার পথে নিয়ে যায়। শিকার ইত্যাদি কারণে সমবেত হওয়ার এই সব দৃশ্যপটকে গোষ্ঠী চেতনার প্রকাশও বলা হয়।[৫১] শিল্পীর সৃষ্ট শিল্পকর্মটি আমাদের আকর্ষণ কতটা করে তার চেয়ে বড় কথা হল শিল্পী কোন অনুপ্রেরণা থেকে কাজ করছে। পৃথিবীর যাবতীয় শিল্পকর্ম সম্বন্ধে একথা খাটে। অর্থাৎ বিচার্য বিষয় হল শিল্পীর শিল্প ভাণ্ডার আমাদের কতটা আকর্ষণ করে এবং সেই শিল্পকর্ম থেকে বিশ্লেষণী মন সে

যুগের জীবনযাত্রার তথা শিল্পীর মানসিকতার কোন্ কোন্ লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুলে।

আলপনা প্রাথমিক ভাবে ব্যবহারিক প্রয়োজনেই তৈরি হয়। আলপনার বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন যেমন লতানে চিহ্ন, লক্ষীর পায়ের ছাপ, টিপ্‌টিপ্ ছাপ, কোলে পোঁ কাখে পোঁ, পদ্ম, সূর্য, মাছ, কলাগাছ ইত্যাদি সমস্ত ধরনের আলপনার চিহ্নই হয় প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষভাবে কিছুটা পরিমাণে হলেও জাদু নির্ভর।[৫২] এক্ষণে আমাদের প্রকল্পধৃত তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে কী ধরনের চিহ্ন আলপনায় ব্যবহৃত হয় তা উল্লেখ করে বিশ্লেষিত করা যেতে পারে।

ক) লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ,

খ) পদ্ম,

গ) মাছ, পশু-পাখি,

ঘ) কলাগাছ,

ঙ) সূর্য,

চ) লতা মণ্ডন,

ছ) সর্প,

জ) ডাব বা নারিকেল,

ঝ) কৃষিকেন্দ্রিক যন্ত্রপাতি এবং

ঞ) ধানের শীষ।

মানুষের কামনা বাসনা বিশ্বাসই যে আলপনার মধ্যে অনুকৃত হয়েছে তা বোঝা যায় সেজুঁতি ব্রতের একটি মন্ত্রে যেমন —

আমি আঁকি পিটুলির গোলা
আমার হোক ধানের গোলা
আমি আঁকি পিটুলির বালা
আমার হোক সোনার বালা।[৫৩]

অর্থাৎ শিকারের ছবি আঁকলে বাস্তবেও অনুরূপ শিকারের ব্যাপারে সংঘটিত হবে। ধানের ছড়া আঁকলে ফসল ক্ষেত্র ধানে ভরে উঠবে, মাছ ভর্তি পুকুর আঁকলে সত্যিকারের পুকুর মাছে - পোনায় ভরে উঠবে[৫৪] এইসব কামনা-বাসনাই লুকিয়ে আছে আলপনা শিল্পের প্রেরণার আড়ালে।

ক) লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ঃ

লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ সমৃদ্ধি ও সম্পদের প্রতীক। লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ মেঝেতে আঁকার মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে আদিম জাদু বিশ্বাস কাজ করেছে তা হল শিকারজীবী পর্যায়ে মানুষ পূর্বতন কোনো শিকারীর কাদার ওপরে শুকিয়ে থাকা পায়ের ছাপ ধরে এগিয়ে যেত, কেননা

সেই একই পথ বরাবর পরবর্তী শিকারী যদি যায় তো সেও শিকারের সন্ধান পাবে সুতরাং পদচিহ্ন শুভদ্যোতক সংকেত হয়ে গেল। আর কালক্রমে সেটাই 'লক্ষ্মীর পা' হয়ে দাঁড়াল, যা কিনা শুভ, কল্যাণ, শ্রী ও সম্পদের প্রতীক বলে এখন গণ্য হয়। শিকার নির্ভর অর্থনীতি থেকে মানুষ যখন কৃষি অর্থনীতির পরিমণ্ডলে এসে পড়েছে, তখনই পারিপার্শ্বিক প্রভাবে চিহ্নগুলির তাৎপর্যও পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হতে লাগল। পূর্বতন শিকারীর পদচিহ্ন থেকে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপে ক্রম উর্দ্ধতনের এই হলো অলক্ষ্য ইতিবৃত্ত।[৫৫] অর্থাৎ বনচারী সংস্কৃতির ছোঁয়ায়, কৃষি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় এ এক মহান মণ্ডন শিল্প যা অতীতের যোগসূত্র রূপে (Missing Link) উত্তর সূরীর কাছে পৌঁছে দিয়েছে।[৫৬]

খ) পদ্ম ঃ

পদ্মের নানা রকম ও বহুল ব্যবহার আলপনায় দেখা যায়। নব্য প্রস্তরযুগে প্রতীক ধর্মীতা শিল্পকলায় প্রবল হয়ে উঠে এসেছে পৃথিবীর সমকালের সংস্কৃতির পীঠস্থানগুলিতে। যেমন — মিশর, মেসোপটেমিয়া বা সিন্ধু অববাহিকায়।[৫৭] স্ত্রী-অঙ্গ ফুলের প্রতীকে দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে, যা পরবর্তীকালে তন্ত্র সাধনার 'যন্ত্র' নামে অভিহিত অষ্টদল পদ্ম বা বহুদল পদ্ম এবং কারুকৃৎবৃত্ত আদিম সংস্কৃতির যোনি-সম্পৃক্ত জাদু বিশ্বাস ব্রত এবং ব্রতকেন্দ্রিক আলপনার মধ্যেও বহমান।[৫৮] বর্তমানে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকায় এরকম আলপনার ব্যবহার ব্যাপক ভাবে লক্ষিত হয় যা উল্লেখিত জাদুবিশ্বাসের উত্তরসূরী রূপে কল্পনা করা যায়। সামগ্রিক ভাবে আলপনায় পূর্ণ বিকশিত পদ্ম, শঙ্খ পদ্ম, যুগ্মপদ্ম, দশদল পদ্ম সবই উর্বরতার (Fertility) প্রতীক।[৫৯] বৃত্তাকার আলপনায় কেন্দ্র ভাগে যে মূলপদ্ম দেখা যায় তা পূর্ণ বিকশিত পদ্ম। মূল পদ্মের পাপড়ি সংখ্যা পাঁচ-সাত-দশ-পনের বা তার বেশি থাকে। শতদল পদ্মে অসংখ্য পাপড়ি থাকে। দলগুলিকে মূলপদ্মের কেন্দ্রমূল হতে অঙ্কিত হতে দেখা যায় না বরং কেন্দ্রস্থল ঘিরে থাকা একাধিক বৃত্তের বাইরে অঙ্কিত। অনেক সময় বিয়ের পিঁড়িতেও শতদল পদ্ম অঙ্কিত হয়; লক্ষ্মীপূজার আলপনায়ও নানারকমের পদ্মফুলের ব্যবহার দেখি।

গ) মাছ, পশু-পাখি ঃ

আলপনায় মাছ, পশু-পাখি ইত্যাদি এসেছে উর্বরতাকেন্দ্রিক অষ্ট্রিক ধর্মধারার ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার হিসেবে।[৬০] একটি মাছে অনেক ডিম অর্থাৎ প্রচুর বংশ বৃদ্ধি, সুতরাং সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন আচারানুষ্ঠানে এবং আলপনায় মাছের ব্যবহার হয়ে থাকে। অন্যদিকে সধবা নারীর কামনাত্মক মোটিফটি আলপনায় মাছের ব্যবহারের অর্থ দাঁড়ায় সিঁথির সিঁদুরকে অক্ষুণ্ণ রাখা।[৬১]

বিভিন্ন পাখি আলপনায় আঁকা হয়। বিশেষ করে প্যাঁচা। এ পাখি আলপনায় ব্যবহারের তাৎপর্য হল শস্যক্ষেত্রে ইঁদুর ফসল নষ্ট করে আর প্যাঁচা ইঁদুর খায়, তাই কৃষিজীবী মানুষের পরম বন্ধু রূপে প্যাঁচার ভূমিকা ধন্যবাদাত্মক (Thanks giving) চিন্তার ফল।[৬২] গবাদি পশুর কামনায় গোয়াল ভরা গরু-ছাগল, বন্যজন্তুর (হাতি, শেয়াল ইত্যাদি) হাত থেকে জান ও ফসলের রক্ষার্থে আলপনায় তার ব্যবহার যে আদিম জাদুবিশ্বাস সম্ভূত কৃষি ও নারীজীবনের কামনা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ঘ) কলাগাছ ঃ

আলপনার কেন্দ্রস্থ বৃত্তের চতুর্দিকে যে সমস্ত চিত্র অঙ্কিত হয় তার মধ্যে কলাগাছ উল্লেখযোগ্য। যা পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই এবং গ্রামীণ নান্দনিক বোধের পরিচায়ক। একটি মূলসহ কলাগাছ পুঁতে দিলে খুব দ্রুত কলাবাগানে পরিণত হয়। অর্থাৎ কলাগাছ এবং বংশ বৃদ্ধি এখানে সমার্থক। সুতরাং কলাগাছ সন্তান বৃদ্ধি তথা উর্বরতা-বৃদ্ধিসূচক জাদুচিত্র।[৬৩] কৃষির সঙ্গে উর্বরতার বিষয়টি জড়িত থাকায় শস্যকেন্দ্রিক উর্বরতা ও সন্তানকেন্দ্রিক উর্বরতার চেতনা দুটি গ্রামীণ মানুষের কাছে সমার্থক হয়ে উঠেছে যা আলপনার মধ্যে অনুকৃত হতে দেখা যায়।

ঙ) সূর্য ঃ

আলপনায় সূর্য কৃষিসভ্যতার স্তরে অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত শুভচিহ্ন। সূর্যচিহ্ন উর্বরতামূলক কাল্টের সূত্রবাহী। বিশ্বজনীন ভাবেই সূর্য উর্বরতার পুরুষ-প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। স্বস্তিকা চিহ্ন যা আলপনায় প্রায়শই ব্যবহৃত হয় তাও আসলে সূর্য প্রতীক[৬৪] সূর্য সমস্ত শক্তির আধার কৃষির তো বটেই, অতএব কৃষি সমাজের পক্ষে শুভদায়ক অবশ্যই।

চ) লতামণ্ডন ঃ

আলপনায় কেন্দ্রস্থ বৃত্তের চারদিকে অঙ্কিত লতা যেমন কলা লতা, কলমিলতা, খুন্তিলতা, শঙ্খলতা, দোপাটিলতা, চাঁপালতা, শীর্ষলতা ইত্যাদিকে লতামণ্ডন বলা হয়। আলপনায় ব্যবহৃত এই রকম বিসর্পিল লতা চিহ্ন রয়েছে যার আদিম ব্যঞ্জনা এখন হারিয়ে গেছে বলে নতুনতর ব্যঞ্জনা আরোপিত হয়েছে।

শিকারভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে পশু,পাখি, সরীসৃপদের চলাফেরা বসার চিহ্নগুলি অবশ্যই বিশেষ প্রয়োজনীয় সংকেত বলে গণ্য হ'ত। ঐ সমস্ত প্রাণীই শিকারী মানুষের খাদ্য, চামড়া, পালক ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনযাত্রা নির্বাহের পাশাপাশি আরো কিছু কিছু উপকরণও তারাই জোগাত। সুতরাং তাদের সন্ধান দেয় যে সব চিহ্ন, সেগুলি নিশ্চয়ই

তাদের কাছে শুভ দ্যোতক। কাজেই সরীসৃপের বিসর্পিল সঞ্চরণ চিহ্ন ইত্যাদি অন্নবস্ত্রের হদিশ দেয় বলে ঐ ধরনের চিহ্ন মাত্রেই শুভদ্যোতক জাদুর অন্তর্গত বলে ধার্য হয়েছে। কালক্রমে শিকারের বদলে কৃষি ও পশুপালন যখন অর্থনৈতিক সংস্থানের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল তখন এই চিহ্নগুলির ব্যঞ্জনা বদলে গেল। আলপনা চিত্রের পাশে ঐ সর্পিল রেখার অলঙ্করণের মাধ্যমে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটল।[৬৫] অর্থাৎ উর্বরতাভিত্তিক ধর্মধারার সম্পর্কজনিত আদিম বিশ্বাস কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে গেল। অতএব, বলা যায় আলপনায় সর্পিল চিহ্ন যুক্ত লতামণ্ডন উর্বরতাকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাসের প্রতিফলন।

ছ) সাপ ঃ

আলপনায় সাপ উর্বরতার প্রতীক। সাপের উপস্থিতি দ্বিবিধ। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাপের অবয়বগত বৈশিষ্ট্য উপস্থিতি। পরোক্ষ ক্ষেত্রে সর্পিল লতায় সাপের উপস্থিতি। ধানের গুছি বা মরাই এর পাশে কিংবা মন্দিরের গাত্রে সাপের চলার চিহ্নের মতো যে ছবি আঁকা হয় তার মধ্যে অনুকরণাত্মক জাদু ফুটে ওঠে। কৃষিভিত্তিক সমাজ মানসিকতায় যার অর্থ সাপের বংশ বিস্তারের অনুরূপ উর্বরতা কৃষিক্ষেত্রেও নেমে আসবে।

জ) কৃষিকেন্দ্রিক যন্ত্রপাতি ঃ

আলপনায় মই, কাস্তে, লাঙ্গল, জোয়াল এমনকি বলদজোড়া কৃষি সভ্যতার স্তরে অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত শুভচিহ্ন।

কামনাত্মক আলপনায় জৈব বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে বেশি। মানুষের মূল কামনা সন্তান এবং শস্য উৎপাদন। উর্বরা ধরণীর গর্ভস্থ সন্তান শস্য। আদিম মানুষ কৃষি শিখেছিল হয়ত কিছুটা আকস্মিক পর্যবেক্ষণের ফলরূপে। কিন্তু তার লক্ষ্য এড়ায়নি গর্ভিনী নারীর ফলবতী হওয়ার সঙ্গে ধরণীর ফলবতী হয়ে উঠার সাদৃশ্যটুকু। নারীর শরীর থেকে যে ফল ফলে সে মানব সন্তান, আর ধরণীর বক্ষের ধন যে ফসল, তা সেই সন্তানকে বেঁচে থাকার 'প্রাণ' সরববাহ করে। আদিম মানুষ এই ব্যাপার দুটির রহস্যভেদ না করতে পারলেও এ দুয়ের মধ্যে যে কোথাও একটা মিল আছে তা সে লক্ষ্য করেছিল। ফলে সে উভয়ের প্রতি প্রগাঢ় এক বিস্ময়বোধে আক্রান্ত হয়।[৬৬] তাই ধরণীর বক্ষকে উর্বরা করতে যে সমস্ত বস্তু কৃষককে সাহায্য করে তার মধ্যে মই, কাস্তে, লাঙ্গল, জোয়াল, বলদ ইত্যাদি শস্য উৎপাদনকেন্দ্রিক আলপনার ঠাট হিসেবে উঠে এসেছে। গরু-বাছুর-মহিষ ইত্যাদি প্রাণীসম্পদও কামনাত্মক আলপনা।

ঝ) ধান ঃ

আলপনায় ধান বা ধানের শীষ কৃষিজীবনের সঙ্গে যুক্ত শুভচিহ্ন। গৃহসজ্জার জন্য বাংলার প্রায় সর্বত্র ধানের শীষ, ধানের আঁটি, ধান ইত্যাদির অলংকরণ আপাত দৃষ্টিতে অনুষ্ঠান বিযুক্ত হলেও আদিম জাদুবিশ্বাস সম্ভূত কৃষি ও নারী জীবনের কামনা আকাঙ্ক্ষার যে প্রতিফলিত রূপ তা অস্বীকার করা যায় না।[৬৭] অন্যদিকে আলপনায় ধান আঁকার অর্থ বাঙালীর কাছে ধানই লক্ষ্মী। ধান ছাড়া অন্য কোন শস্য বাংলাদেশে লক্ষ্মী রূপে কল্পনা করা হয় না। এবং ধান্য লক্ষ্মীকে নিয়ে নানা প্রকার আচার-আচরণ ব্রত-পার্বণ লক্ষ্য করা যায়। তাই আলপনায় ধান, ধানের শীষ, মরাই ইত্যাদির বহুল ব্যবহার। সুতরাং আলপনায় ধান সম্পর্কীত ইঙ্গিত লক্ষ্মীর প্রতীক। কখনও বাঁকা কখনও সরলরেখায় ধানের শীষ অঙ্কিত হয়েছে। ধানগাছ বাতাসের আন্দোলনে ঢেউ খেলে যায়, শস্যের ভারে নুইয়ে পড়ে, ঝড়-বৃষ্টিতে শুয়ে পড়ে; কৃষি বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় Lodging — ধানের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সম্ভবতঃ আলপনায় ধানের শীষ বক্র কিংবা লতানো।[৬৮]

ঞ) ডাব বা নারিকেল ঃ

আলপনায় ডাব বা নারিকেল কিংবা জলপূর্ণ ঘট উর্বরতাকেন্দ্রিক রীতি ধারার ঐতিহ্য বহন করে। পশুপালন বা কৃষিস্তরে এসে মানুষ অন্তঃসত্ত্বা মহিলার প্রতীক হিসেবে ডাব-নারিকেল অঙ্কন অনুকৃত জাদু বিশ্বাসের প্রতিফলন হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাই বলা যায় ডাব বা নারিকেল সমৃদ্ধিসূচক কামনাত্মক আলপনার উদাহরণ।

এছাড়াও পিঁড়ি আলপনা, কুলো আলপনা, দেওয়াল আলপনা দেওয়া হয় নানান জ্যামিতিক নক্শায়। আলপনায় যে জ্যামিতি তার সূত্রপাত হয়েছিল সম্ভবতঃ জমি তৈরি ও সমতল করার প্রাচীন প্রক্রিয়া থেকে। জোয়াল বাহিত আদি লাঙ্গলের মৃত্তিকা খননে তৈরি হয়েছিল মাঠের আলপনা, তার দুপাশে বলদ এবং কৃষকের পদচিহ্ন, জমি কর্ষণে উদ্ভূত পোকামাকড়ের লোভে ধেয়ে আসা পোখপাখালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন, ফসলের লোভে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের আগমন এবং মাঠ ভর্তি পাকা ফসলের সমারোহ সবমিলিয়ে মানুষের সহজাত নান্দনিকতায় হয়ে উঠেছে ব্রতপূজার আলপনায় সমরূপ চিত্রাবলী।[৬৯] সুতরাং বলা যেতে পারে আলপনা হল মানুষের কৃষিসম্পৃক্ত জাদু বিশ্বাস ও নান্দনিকতার মিলিত ফসল।

খাদ্য বিষয়ক লোকায়ত শিল্প ও লোকপ্রযুক্তি ঃ

আদিম যুগে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করত অরণ্য থেকে। শিকারজীবী পশুপালন থেকে ক্রমান্বয়ে মানুষ পৌঁছায় কৃষিজীবী স্তরে। আর এই কৃষিকর্মস্তরে পৌঁছতে মানুষ পরপর অতিক্রম করে

প্রস্তর, ব্রোঞ্জ, তাম্র ও লৌহযুগ। সেই সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পশুপালন, চাষবাস ও মৎস্য শিকার প্রভৃতি কাজে মানুষ নিযুক্ত হয়। এসব কাজে ব্যবহৃত লোকায়ত শিল্প ও লোকপ্রযুক্তিকে কয়েকটি ভাগে দেখানো যেতে পারে —

রন্ধনশিল্প সংক্রান্ত লোকপ্রযুক্তি।

আগুন আবিষ্কারের আগে আদিম মানুষ ফলমূল ও কাঁচা মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। তবে এই পর্বে দাবানলের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে এবং দাবানলে অর্ধদগ্ধ মাংস খেয়ে সে মাংসের স্বাদের তফাত বুঝতে শিখেছে। তাই দাবানলকে ভয় পেলেও অপেক্ষা করত আবার কবে দাবানল আসবে এবং পোড়া মাংস খেতে পাবে। আর আগুন আবিষ্কারের পরবর্তীকালে মানুষের খাদ্যাভাস ও রুচির ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে শুরু করে এবং রন্ধনকার্য পরবর্তীকালে একটি শিল্পে পরিণত হয়।

আর এই রন্ধন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে চাল, গম, ডাল, তেল, লবণ, হলুদ এবং বিভিন্ন মশলা ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ফলতঃ এই রন্ধন শিল্পকে কেন্দ্র করে কিছু লোকায়ত প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটে। রন্ধন শিল্পে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তিগুলি হল — ১. ঘানি, ২. ঢেঁকি, ছামগাইন, ৩. যাঁতা, ৪. মৃৎশিল্প (হাড়ি, কড়াই প্রভৃতি), ৫. ধাতব (লোহার পাত্র, পিতলের পাত্র ইত্যাদি)।

যানবাহন সংক্রান্ত লোকপ্রযুক্তি ঃ

গরুমোষের গাড়ি ঃ

কাঠের চাকতির উপর লোহার পাত বসানো চাকা ও বাঁশের কাঠামোয় তৈরি হত একধরনের যান। পিছন দিক থেকে ক্রমশ সূচালো হত সামনের দিকে এবং সামনে জোয়ালের সাথে গরু বা মোষের টানা যানই এই অঞ্চলের প্রধান পরিবহন ছিল।

ষাটের দশক পর্যন্ত এতদঞ্চলের শহর, গ্রাম এবং প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছতে গেলে গরু বা মোষের গাড়ি ছিল একমাত্র পরিবহন। ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মাথাভাঙ্গা, শীতলকুচি, দিনহাটা, বলরামপুর, তুফানগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার থেকে মেখলিগঞ্জ এমনকি ভূটানীদেরও একমাত্র পরিবহন ছিল গরু মোষের গাড়ি। শুধুমাত্র মানুষজন নয়, পণ্যদ্রব্য পরিবহনেও একমাত্র মাধ্যম ছিল গরু মোষের গাড়ি, গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই একখানা করে গাড়ি ছিল এবং শহরের আশেপাশের কিছু লোকের গাড়ি ভাড়া দেওয়াই পেশা ছিল। এক একখানা গরু মোষের গাড়িতে দশ/এগারে জন দোকানদারের পণ্য সামগ্রী হাটে নিয়ে কেনাবেচা হত। গরুমোষের গাড়ির চালকদের বলা হয় গাড়িয়াল। পাশাপাশি বড় বড় ধান চালের ব্যবসায়ীদেরও গাড়িয়াল বলে সম্বোধন করা হত। এরা সকলেই বড় বড় জোতদার বা নিজস্ব গরু মোষের গাড়ি থাকত। ১০/১১ খানা ভাড়ার

গাড়ি নিয়ে উজানের হাটে কিংবা বন্দরে যেতেন। এই গাড়িয়ালকে নিয়ে পাওয়া যায় বিভিন্ন গান —

"যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে
ওকি গাড়িয়াল ভাই হাকাও গাড়ি তুই
চিল মারির বন্দরে" ইত্যাদি

গরু মোষের গাড়ি ছাড়াও মাথাভাঙ্গার হিন্দুস্থান মোড়, পাড়াডুবি প্রভৃতি অঞ্চলে ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন আজও দেখা যায়।

নৌকা ঃ

নৌকার মূল উপকরণ সুন্দরী, শাল, জারুল জাতীয় কাঠ। তবে আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসেবে পেরেক, গজাল, তারকাটা প্রভৃতি ধাতবদ্রব্য ব্যবহৃত হয়। গঠনগত ভাবে নৌকার আকৃতির বিভিন্নতাও অনেক। তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, মানসাই, ধরলা, মুজনাই নদীতে ছোট আকারের (১৫/১৬ ফুট লম্বা) দুই থেকে সাড়ে তিনফুট চওড়া নৌকা চলতে দেখা যায়। বেশির ভাগ নৌকায় একজন মাঝি কখনো কখনো দুজন মাঝি দেখা যায়। মাঝি 'লগি' দিয়ে নৌকা পারাপার করে। লগি লম্বা (১৫/১৬) বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। মূলতঃ বর্ষাকালে নদী নালায় এই নৌকা দেখা যায়। এক একটি নৌকায় ১৫/২০ জন লোক যাতায়াত করতে পারে। আজকাল মানুষের সঙ্গে সাইকেল, ভ্যান, মারুতি এসবও পারাপার হয়। মাথাভাঙ্গায় কাছে ধরলা নদী, মানসাই জলঢাকা নদীতে এখনও প্রচুর লোক এই নৌকায় পারাপার হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পলাশবাড়ি নিকট শিলতোর্ষা নদীতে পারাপারের একমাত্র মাধ্যম ছিল নৌকা।

ড. চারুচন্দ্র সান্যাল আরও কিছু ছোট নৌকার কথা বলেছেন — 'Very small boats called 'kosa' carring four passangers can go over all the rivers. But the most popular boat is the canoe - the 'Solonga'. It is fifteen feet long and two feet wide and one and a half feet deep scooped out of a Bombax (Simul) tree trunk. It being very light can go over even two feet deep water with two adult extra passengers which is usually carries.[৭০]

প্রাচীন কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় নানা লোকশিল্প সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাত্যহিক জীবনে জীবিকার স্বার্থে যে সকল দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন হ'ত যেসব নিজেরাই তৈরি করে নিত। ফলে সেগুলির মধ্যে শৈল্পিক মানসিকতার ছাপ ফুটে উঠত। তিস্তা ও তোর্ষাপারের লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক এতদঞ্চলের গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজ ও তাঁর লোকশিল্প। যাঁদের কুশলী দক্ষ হাতের স্পর্শে

বাঁশ, কাঠ, মাটি, শোলা বিমূর্ত থেকে মূর্ত হয়ে উঠে নান্দনিক শিল্প কর্মের মাধ্যমে।

———

গ) বাগ্‌ধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি

রাজবংশী সমাজে লোকায়ত সাহিত্যের কয়েকটি শাখা প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধা, লোকগান, লোককথা প্রভৃতি। এগুলির প্রকাশভঙ্গি ও অর্থব্যঞ্জনা কত সাবলীল এবং উপজীব্য তা একটু আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। এগুলি কে বা কারা আবিষ্কার করেছে তা জানা যায় না। লোকমুখে আজও সমান ভাবে তিস্তা ও তোর্ষাপারে প্রবহমান। তবে একথা বলা বোধহয় অতিরঞ্জিত হবে না যে কৃষিভিত্তিক রাজবংশী সমাজের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকেরাই এর স্রষ্টা। এই লোকায়ত সাহিত্য ধারা কিভাবে কৃষি দ্বারা সমৃদ্ধ তাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রবাদ ঃ

প্রবাদ-প্রবচন কবে, কোথায়, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা আজ আমাদের জানবার উপায় নেই। ব্যবহারিক জীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতাই প্রবাদ সৃষ্টির মূল। বিশদে বললে, প্রবাদ কোনো একটি সমাজের বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি বা সমষ্টি দ্বারা লব্ধ অভিজ্ঞতার বিস্ময় প্রকাশ। বিশেষ পরিস্থিতিতে লব্ধ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে সমষ্টির দ্বারা উপলব্ধ পরীক্ষিত হয়ে সার্বজনীন হতে পারে। সমষ্টিগত অভিজ্ঞতাও যদি ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা উপলব্ধ না হয় তবে তা নিটোল ছন্দোবন্ধে বিধৃত হবে না। কেননা, প্রবাদ প্রবচনের মতো রচনা সমষ্টিগত সৃষ্টি হতে পারে না। সমষ্টির দ্বারা অনুমোদিত বা গৃহীত হতে পারে মাত্র।[৭১] তাই তো জনশ্রুতি, লোকসাহিত্যের স্রষ্টা লোকমানস। প্রবাদের ক্ষেত্রেও তাই। তবে এই সামান্য সৃষ্টির মধ্যেই লোকজীবনের প্রাণস্পন্দনটি সহজভাবে অনুরণিত হয়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' এবং পরবর্তী 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' প্রবাদমূলক প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। মঙ্গলকাব্য ধারায় প্রবাদ প্রবচনের চূড়ান্ত ব্যবহার দেখতে পাই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে। ঊনবিংশ শতকের বাংলা নাটক, প্রহসন ও গল্প, উপন্যাসে ব্যাপকভাবে প্রবাদের প্রয়োগ একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এই প্রবাদের ব্যবহারও কিছু কম নেই। ইদানিংকালে এই প্রবাদের ব্যবহার কি সাহিত্যে কি দৈনন্দিন জীবনে খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। অথচ মানবজীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয়বাহী এই প্রবাদ বাক্যসমূহ অতি সমাজকে গৃহীত হয়ে এক সময় সাহিত্যের ভাষাকে মনোরম ও প্রাঞ্জল করে তুলেছে। আমাদের প্রকল্পটিতে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকজীবনে এই প্রবাদ প্রবচনের বহুল প্রচলন আমরা লক্ষ্য করি। তবে আমরা এক্ষণে সেই সমস্ত প্রবাদ প্রবচনের উল্লেখ করব যা এতদঞ্চলের কৃষিজীবন আধারে রচিত। কৃষি তথা কৃষিজীবনকেন্দ্রিক যে সমস্ত প্রবাদ প্রবচন রাজবংশী সমাজের লোকজীবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কেবলমাত্র সেইগুলিই বিশ্লেষণের মাধ্যমে

তুলে ধরা হবে।

রাজবংশী সমাজ মূলতঃ কৃষিজীবী। কৃষিক্ষেত্র, কৃষিকর্ম প্রভৃতি কৃত্যাকৃত্য সম্পর্কে অনেকগুলি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় এই প্রবাদগুলিতে। যেমন —

"আছে গরু না বোয়ায় হাল
তার দুঃখ চিরকাল।"

- - - - - - - - - - - -

"ইয়ার ঠেস্‌সা ইয়ার ঠেস্‌সি
তাতকে আছে কামহ্ কিষ্‌ষি"

- - - - - - - - - - - - - - -

"উজান ভুঁই যার ভাট্টিমাল্লি তার।"

- - - - - - - - - - - - - - - - -

"যায় না গাড়ে কচু তায় আদৎ পশু
যায় না গাড়ে আদা তায় দুনিয়ার গাধা।"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"ভাদোর মাসিয়া ধান/শ্বশুর বাড়ির দান।"

কৃষিজাত শস্যাদি ধান, পাট, গম, সরিষা, কালাই, তিল, তামাক ইত্যাদি এবং আলু, কচু, পিয়াজ, রসুন, হলুদ, পান-সুপারি প্রভৃতি সবজি ও গুল্মজাত দ্রব্যাদি কৃষিকর্মোপজীবী রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রকৃত পরিচয় উদঘাটনে সহায়তা করে। এই রকমই একটি প্রবাদ এতদঞ্চলে প্রচলিত—

"চারের বাড়ির ধান
মল্লিকবাড়ির পান"

প্রবাদ আছে - কৃষকের চিহ্ন হল -

"দুধের বাটি
হালুয়ার লাঠি।"

অর্থাৎ হালুয়ার হাতে লাঠি আর বাড়িতে থাকবে বাটি ভরা দুধ। অর্থাৎ গোয়াল ভরা গরু। লাঠির ভূমিকা হল চাষ করার সময় গরুকে তাড়ানো। এই লাঠি অবাধ্য গরুকে শাসন করার জন্য যেমন ব্যবহার করা হয়, তেমনি সেকালে অবাধ্য স্ত্রীকেও শাসন করতে এর ভূমিকা কম ছিল না।

ধান, পান, গাই এই তিনটি থাকলে কোনো গৃহস্থকে অন্যের দুয়ারে যেতে হয় না। সেজন্য ধান চাষ, পান চাষ এবং গাভী পালন প্রত্যেক রাজবংশীদের করণীয় রীতি ছিল। এসব নিয়েই প্রবাদ পাই —

"ধান পান গাই
এই তিনটা হোলে
কাহারো দুয়ারে না যাই।"

অন্য একটি প্রবাদে আছে —

"ধানে ধন
খানিক ধান হইল্ সোনা উপা
আর তামানে পাতান।"

ধানকে ধন বলা হত রাজবংশী সমাজে। কারণ ধানের একটি বাজার মূল্য সবসময় থাকে। সোনা ও রূপার থেকেও ধানকে মূল্যবান মনে করত রাজবংশীরা। আর অন্যান্য সম্পদ হল 'পাতান' অর্থাৎ ধানের চিটা যা মূল্যহীন।

প্রকৃত গৃহস্থ সেই যার ঘরে বার শস্য যেমন - ধান, পাট, ডাল, তামাক ইত্যাদি থাকে। যোগ্য গৃহ বধূ তাকেই বলা যাবে যে গৃহকর্মের পাশাপাশি সন্তান পালন, সূচিকর্ম প্রভৃতি কাজে পারদর্শিনী হবে। এরকম গৃহবধূ যার তার সংসার সুখের হয়।

"বার শস্যে গিরি
তের কামে তিরি।" (তিরি - বধূ)

"মারিয়া মাছ আর্জিয়া ভাত।"

অর্থাৎ মাছ খেতে গেলে মাছ মেরে খাও এবং ভাত খেতে হলে চাষবাস করে শস্য ফলিয়ে খাও।

"আগ চায়া বান্দে আলি
তায় খায় শোল বোয়ালি।"

অর্থাৎ প্রকৃত কৃষক সে বর্ষার প্রারম্ভে আল বেঁধে জমির উর্বরা শক্তিকে বৃদ্ধি করে থাকে। এতে জমিতে যেমন জল থাকে তেমনি পাশাপাশি প্রচুর মাছও থাকে। ফলে কৃষকের সংবৎসরের খাওয়া পড়ার অভাব হয় না। তাই এই প্রবাদটি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মুখে প্রায়'শ শোনা যায়।

উৎসবে, ব্যসনে, শ্রাদ্ধে, বিবাহবাসরে রাজবংশী সমাজে 'দই-চুড়া' অপরিহার্য ভোগ্যবস্তু। আহারের সর্বাগ্রে দই-চুড়ার স্থান। পূর্ববঙ্গে যা 'কামেরবাড়ি' তিস্তা ও তোর্ষাপারে তা 'দই-চুড়া বাড়ি'। 'দই-চুড়ার' এমন মর্যাদা সম্ভবতঃ অন্যত্র দুর্লভ।

"দই কিনি তার মাঝোৎ খাল কিংবা - দই ভাঙ্গিলে পানি
কইনা জুড়ি তার মাও ভাল।" টাকা ভাঙ্গিলে হানি।

"খাবার জানলে ধানুয়া চুড়া
বসিবার জানলে মাটির পিড়া।"

জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার ছোটবড় সব নদীরই উৎস হিমালয় পর্বত শ্রেণি। সাধারণতঃ শীর্ণকায়া নদীগুলি বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। নদীগুলির গতিপথ যেমন আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হয় তেমনি নদীর উভয়কূল বর্ষার জলস্রোতে ভেঙে পড়তে পারে। এসব নদীর কাছাকাছি বসতবাটি তৈরি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় —

"ভরসা নাই নদীর পারোত বাড়ি
ভরসা নাই গাবুর বসের আড়ি।"

আবার, নদী ও নারী লোকায়ত ভাবনায় একাকার হয়ে গেছে —

"নদীক না কই আটো
নারীক না কই খাটো।"

কৃষক সারা বৎসরই বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণের সাহায্যে নানা ধরনের ফসল উৎপাদন করে। এই ফসল উৎপাদনের সময়ে তাদের কৃষিসংস্কৃতি নানান ভাবে ও ঢঙে প্রকাশ পায়। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই কৃষক, জমি, প্রাকৃতিক অবস্থা, চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে এতদঞ্চলে কতকগুলি প্রবাদ শুনা যায় যার মধ্য দিয়ে কৃষক সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

"বৈশাখে দেখো উত্তর পশ্চিম;
আষাঢ়ে দেখো পূর্ব-দক্ষিণ।"

অর্থাৎ কৃষককে চাষের জমি তৈরি রাখতে আকাশের পরিস্থিতির উপর খেয়াল রাখতে হত। বিশেষতঃ বৈশাখ মাসে উত্তর পশ্চিম দিকে লক্ষ্য করে কৃষক ভুঁই বা খটু (জমি) তৈরি করে বিচন ফেলতো। জমিতে জলের দরকার হয় রোপণ করার জন্য, এজন্য তারা আষাঢ় মাসে পূর্ব-দক্ষিণে আকাশের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করতো।

"শাত্তনের পাছিয়া বাও
তিল কালাই ফেলাও"

শ্রাবণ মাসে পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করলে কৃষককে তিল, কালাই বপনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়।

"শাত্তনের বার ভাদরের তেরো
এরমধ্যে যত পারো।"

শ্রাবণ মাস কৃষকের কাছে আসল সময়। এই সময়ে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের বারো তারিখ থেকে ভাদর মাসের তেরো তারিখ পর্যন্ত বিচন বুনা (রোয়াগারা) শেষ করতে হবে। তবেই ফসল ভাল হবে। ভাদ্রের তেরো তারিখের পর রোয়া গাড়লে ফসল ভাল হয় না।

"আষাঢ় যাবে ফাসার ফুসুর

শ্রাবণ যাবে ধায়া
ভাদরের তেরো দিন যায়া
কিষ্যাণ নবে চায়া।"

আষাঢ় শ্রাবণ কৃষকের কাছে মহামূল্যবান। এই সময়ের কর্মের উপরই সারা বৎসরের খাদ্য শস্যের জোগান নির্ভর করে। এসময় কৃষকেরা এত কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে যে তারা বুঝতেই পারে না কেমন করে মাসটা কেটে গেল। শ্রাবণ মাসও দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এভাবে যদি ভাদ্র মাসের তেরো দিন চলে যায় এবং কাজ গুটানো না যায় তাহলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া কৃষকের আর উপায় থাকে না।

অন্যদিকে কোন জমিতে কত চাষ দিলে ফসল ভাল হয় সে নিয়ে উপদেশ পাই —

"পাঁচ চাষে ধান, বিনা চাষে পান
মুলার ভুঁই তুলা, তানকুর ভুঁই ধূলা।" (তানকু > তামাক)

অর্থাৎ ভাল ধান পেতে হলে জমিকে পাঁচ চাষ দিতে হয়। পানের জন্য কোন চাষের দরকার পরে না, আবার মূলা চাষে মাটি যত নরম হবে ততই ভাল। আর তামাক চাষে মাটিকে ধুলার মত ঝুরঝুরে করতে হয়। কিংবা আর একটি প্রবাদের পাই —

"ষোল চাষে তুলা
তার অর্ধেকে মূলা
তার অর্ধেকে ধান
বিনা চাষে পান।"

- - - - - - - - -

"পড়ি গেল জেঠ
মাথা এলা কর হেট।"

জ্যৈষ্ঠ মাস এলে কৃষকের চিন্তা বেড়ে যায়। এসময় তারা সারা বছরের ফসল ফলনের প্রস্তুতি নেয়। তাই আর কথা নয়, চুপচাপ মাথা নিচু করে কাজ করে যাওয়াই একমাত্র উপায়।

"হালুয়ার হাল
জালুয়ার জাল
ওদবাতাসের জলে তার পিঠি হয় নাল
সগায় তাক দেয় গাল
আর তুলিবার চাহে দেহার ছাল।"

রৌদ্রে (ওদ) ও বৃষ্টিতে কষ্ট করে কৃষক ও জালুয়া (জেলে) যথাক্রমে ফসল ও মাছ মারতে প্রাণপণ পরিশ্রম করে সভ্যতার গ্রাসাচ্ছাদনে ব্যস্ত থাকলেও সকলে (সগায়) তাদের

অবহেলা করে।

"নিজের ভুঁইর বিছন দেবার না পায়
আলির চাক কাটি ভুঁই বাড়ায়।"

নিজের জমি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বিচন সংগ্রহ করার সার্মথ্য নেই অথচ আল কেটে জমি বাড়ানোতেই বেশি ঝোঁক। যা গ্রাম্য দলাদলির লক্ষণ।

"কালাই মোদ্দে মুসুরী
সাগাই মোদ্দে শশুরি"

ডালের মধ্যে যেমন মুসুরী ভালো, তেমনি আত্মীয় স্বজনের মধ্যে শাশুড়ি ভালো।

'উজান ভুঁই যার ভাটি আল্লী তার।'

উত্তরদিকে যে কৃষকের জমি থাকে সেই জমির দক্ষিণ আলিও তার হয়।

"যায় হয় কিষ্যাণের ব্যাটা
চৈতমাসে ফেলাও পাটা।"

অর্থাৎ, প্রকৃত কৃষক চৈত্র মাসেই পাটা ফেলে। পাটকে নিয়ে একটি প্রবাদ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

"পাকাইলে দড়ি না পাকাইলে পাটা।"

পাটের বিভিন্ন রূপ, প্রথমতঃ সে পাট বা পাটের বীজ কিংবা কোস্টা, কিন্তু পাক দিলেই তার নাম হয় দড়ি। সুতরাং তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে কৃষক তথা কৃষিজীবনই হয়ে উঠেছে প্রবাদের উপজীব্য বিষয়।

ধাঁধা ঃ

কথিত আছে গ্রামীণ ভারতবর্ষের লোক নিরক্ষর হলেও মুর্খ নয়। কথাটা সর্বৈব সত্য। এই সুবিশাল ভূ-খণ্ডের লোকসংস্কৃতির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব গ্রামীণ ভারতের লোকজীবন তার সুবিশাল লোকসাহিত্যকে কিভাবে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে তাদের মনন ও মেধা দ্বারা। আদিম কাল থেকে মানুষ চিন্তা ও চেতনা বিকাশের মাধ্যমে ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাব প্রকাশের জন্য ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে যেমন ব্যবহার করেছে ঠিক তেমনি মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা যেমন ধাঁধা, ছড়া, লোককথা, প্রবাদ প্রভৃতির মাধ্যমে জানা যায় তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে। বহুখাতে প্রবাহিত ভারতীয় সম্প্রদায় কে কোন ধারা বা ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক তাও স্পষ্ট হয় এই বাগ্‌ধর্মী লোকসাহিত্য থেকে। আমাদের প্রকল্পধৃত রাজবংশী সমাজ কীভাবে তাদের লোকায়ত জীবনকে মৌখিক সাহিত্যে বিধৃত করেছে তা বিশ্লেষিত হবে।

ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীনতম অংশ। ধাঁধার নিদর্শন পাই খ্রীষ্টের জন্মেরও হাজার বছর পূর্বে ঋগ্বেদে। পৃথিবীর বহুদেশেই আদিম অধিবাসী ও প্রাচীন সাহিত্য থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দি পর্যন্ত ধাঁধার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। ধাঁধার প্রাচীনত্বকে স্বীকার করে নিয়ে আচার্য টেলর বলেছেন "Riddling is an universal art"[৭২]

ধাঁধা সম্পর্কে ড. শীলা বসাক বলেছেন — "ধাঁধা লোকসাহিত্যের প্রাচীন ও গুরুত্ববাহী শাখা। ধাঁধা গ্রামবাংলার নিজস্ব সম্পদ ও একান্ত আপনার ধন। পল্লীবাংলার সর্বত্র আবালবৃদ্ধ বণিতা সবার মুখেই শুনতে পাওয়া যায় নানা ধরনের ধাঁধা। আবার শিশু ও কিশোরদের আনন্দের সামগ্রী ও তাদের বুদ্ধি বৃত্তির প্রখরতা বৃদ্ধি ও জ্ঞানানুশীলনের প্রকৃষ্ট পন্থাও। গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিরা সন্ধ্যায় সারাদিনের কর্মক্লান্ত দেহ এলিয়ে ছেলেমেয়ে কিংবা নাতি নাতনিদের নিয়ে দাওয়ায় বা উঠোনে মাদুর বিছিয়ে হুঁকা টানতে টানতে বা শুঁয়ে বসে ধাঁধার আসর গুলজার করে তোলেন।[৭৩]

রাজবংশী সমাজের কৃষিকর্মের পাশাপাশি কৃষিজীবনের সমগ্র উপকরণ নিয়েই ধাঁধা হাজির হয়েছে। এতদঞ্চলের আহার বিহার, আচার-ব্যবহার, চলন-বলন, রঙ্গরসিকতা, লোকঐতিহ্য সবটা নিয়ে ধাঁধা প্রচলিত — যার মধ্যে কৃষি তথা কৃষিজীবনের অচ্ছেদ্য বন্ধন প্রতিফলিত এমনই সব ধাঁধা নিম্নে বিশ্লেষিত করা যেতে পারে।

কৃষক সারাবছর নানা ধরনের কৃষি উপকরণের সাহায্যে বিভিন্ন রকমের ফসল উৎপাদন করে। এই উৎপাদন কর্মের সময়ে তাদের কৃষি-সংস্কৃতি নানাভাবে প্রকাশ পায়। মূলতঃ গ্রামীণ সমাজের লোকেদের গ্রামে বাস করতে গেলে হাল কিংবা পরিবহন অথবা দুধ বা সারের জন্য গোপালন অবশ্যম্ভাবী। এই গোপালনকে কেন্দ্র করে দরকারী কিছু জিনিসপত্র যেমন দড়ি, পেন্টি, গরুর গলার ঘন্টা, খড়ের গাদা ইত্যাদি দরকার হয়ে পড়ে। এসবকে কেন্দ্র করে দৈনন্দিন জীবনে বেশ কিছু ধাঁধা লক্ষ্য করবার মতন।

"হাতির মতন গণ্ডারটা
খাইতে খাইতে এত্তেনা" (উঃ খড়ের গাদা)

পাঠান্তর ঃ

"হাত্তির মতো দেহাটা
খাইতে খাইতে কান্টাটা।"

"দেখিতে শুনিতে সুন্দরী কইন্যা
নাড়লে কাড়ে আও
ছাওয়াটা তার নৃত্য করে
গান গায় ওয়ার মাও।" (উঃ গরুর গলার ঘন্টা)

"ঠক ঠক ঠগিলা বগবগ বগিলা
চাইর মাথা বারো ঠ্যাং কাহা দেখিলা।" (উঃ গাইছ্যাকা)

বাঁশের ভূমিকা রাজবংশী গৃহস্থালীতে অসীম গুরুত্বপূর্ণ। ঘর বানানো থেকে শুরু করে গৃহকর্মের বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুতে বাঁশের ব্যাপক প্রচলন। গৃহ উপকরণ যেমন - কুলা, পলো, খলুই, সাজি, ঝুঁড়ি ইত্যাদি। তাই এসব নিয়েও পাই ধাঁধা —

"চৈতে মাথে টুপি
দ্বাপরে মজাইল গুপি
রাবণ মৈল রামের হাতে
সেই তরকারী আমার পাতে।" (উঃ বাঁশ)

"হাট গেইলেন তোমরা পাইসা দিলি হামরা
হামার বাড়ির কুনল্যা জিনিসের দরকার
কিনি আনেন তুমরা।" (উঃ কুলা)

যেকোনো পূজাচর্যায় কলা ও কলা গাছের রাজবংশী সমাজে অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্ব ক্রিয়াকর্মে থাকে এই কদলী বৃক্ষ। এই কদলী বৃক্ষ ও লোকায়ত সংস্কৃতিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

"একথার নাই মাথা ব্যাঙে দই চুরা খায়
বাপের বিয়াও না হইতে বেটায় বৈরাত যায়।" (উঃ কলাগাছ)

কৃষিকর্মের মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল পান-সুপারি। আর্থিক দিক ছাড়াও

সামাজিক দিক থেকে এতদঞ্চলে পান-সুপারির ভূমিকা বিরাট। অতিথি অভ্যর্থনা থেকে বিদায় পর্যন্ত বিশেষ সম্মান হিসেবে পান-সুপারি অপরিহার্য। তিস্তা ও তোর্ষাপারের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে বড় বড় পান-সুপারি বাগান আজও লক্ষ্য করা যায় — যা ধাঁধায় পাই

"কাটাগুয়া খাও পান
স্বামী-স্ত্রী বাইশটা কান" (উঃ রাবণ ও মন্দোদরী)

"এক ভাই সাগরোত এক ভাই নাগরোত
এক ভাই টিং টিং আগালোত।" (উঃ চুন-পান-সুপারি)

গেরস্থালি কর্মে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহৃত হয় তাকে নিয়েও পাই ধাঁধা —

"দা কুড়াল বাইশটা
বুঝি দেতো বাপই কয়টা" (উঃ তিনটা)

কৃষিকর্মের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন গান বাজনার আসর বসে থাকে এই অঞ্চলে। যেমন গোরক্ষনাথের গান, দোতরাডাঙ্গা আসর, বিষহরা গান, সুবচনী, হাইচ্যাও খেলার গান ইত্যাদি। আর এইসব গানের আসরে যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয় সেসব নিয়েও পাই ধাঁধা যা এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

"পাণি পাণি ঘুরে বটে নয় পানি মাছ
তাল নাম ধরে যে নয় কোনো গাছ
পৈতা আছে গলায় নয় ব্রাহ্মণের সূত
ডাং দিলে কথা কয় এ বড় অদ্ভুত।" (উঃ করতাল)

আবার জমি থাকলে আল থাকবে। সেই আল নিয়েও পাই ধাঁধা —

"কাটলে একটা
না কাটলে দুটা"

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের অধিকাংশ মানুষেরই প্রধান জীবিকা হল কৃষি। অত্যন্ত পরিশ্রম করে তারা বন্ধ্যা জমিকে করে তোলে শস্যশ্যামলা। জমিকে শস্যশ্যামলা করার জন্য প্রয়োজন হাল-চাষের। আর হালচাষ করার সময় দরকার হয় মই। তাই মই দেওয়া নিয়ে তারা ধাঁধা তৈরি করে —

"চিকা চিকা ভুঁই নিকা
ছয় চৌকা তিন টিকা" (উঃ জমিতে মই দেওয়া।)

আবার মই দেওয়ার সময় দরকার হয় কুর্শির অর্থাৎ জমিতে ঢেলা ভাঙ্গার উপকরণ। তাকে নিয়েও ধাঁধা রচিত হয়েছে —

"এদি ওদি নাচে
তোমার বাড়িত কি তায় আছে?" (উঃ কুর্শি, ঢেলা ভাঙ্গার উপকরণ।)

ধান উত্তরবঙ্গের একটি বিশেষ ও প্রধান ফসল। কৃষকেরা ধান চাষ করার পর পাকা ধান বাড়িতে নিয়ে এসে স্তূপাকারে রাখে। রাজবংশী মানুষেরা যাকে বলে পোয়ালের পুজ —

"সারা পিথিবী নড়ে যুগী আসন ধরে
গার মাংস খুলি খায় তবুও রাও না করে।"
(উঃ পোয়ালের পুজ, খড়ের গাদা।)

আমন ধান সাধারণত বর্ষাকালেই চাষ আবাদ হয়ে থাকে। কৃষকেরা তা রোপণ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় জোঁকের দ্বারা। জোঁক নিয়েও লোকে তাই ধাঁধা বলে —

"বাঁশের আড়া থাকি বেড়াইল হোক্কোস
মাথা করে টোক্কোস টোক্কোস।" (উঃ জোক/চিনা জোক।)

ধানীজমিগুলি চাষ করতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করে গৃহপালিত পশু গরু। এই গরুকে বেঁধে রাখার ও জমিতে ঘাস খাওয়ানোর জন্য দরকার দড়ির সঙ্গে খুঁটেরও —

"একনা বুড়ি সেজা মুতুরি
সকালে উঠি এক গুড়ি।" (উঃ খুঁট, দড়ির সঙ্গে সংযুক্ত বাঁশের দণ্ড।)

কথান্তর ঃ

"একনা বুড়ি সেজার পোতনা
একনা বুড়ি সকালে উঠি এক গুড়ি।"

এই সমাজের মানুষগুলির প্রধান খাদ্য ভাত। তাই ভাত নিয়ে তারা ধাঁধা রচনা করেছে—

"ধরিয়া উবুত করিয়া চিত
ভিতর গেইলে মন পিরীত।" (উঃ ভাত।)

জলের অপর নাম জীবন। তাই জলকে নিয়েও ধাঁধা রচিত হয় —

"হাত নাই পাও নাই গড়গড়েয়া যায়
পিঠির চামড়া নাই সর্ব্বলোকে খায়।" (উঃ জল।)

বাঙালিদের পছন্দের খাদ্য মাছ। রাজবংশী জীবনযাত্রাতেও মাছ প্রিয় খাদ্য। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে মাছও পাওয়া যায় যথেষ্ট। মাছ নিয়ে ধাঁধা —

"অড্ডিম পঙ্খী অফুলা শাক
কোন্ জীবের আঠারোটা নাক।" (উঃ সাটি/ল্যাটা মাছ।)

শব্দার্থ ঃ

অড্ডিম — যে পাখির ডিম হয় না। (উঃ বাদুড়)

অফুলা — যে শাকের ফুল হয় না। (উঃ ঢেঁকি শাক)

ওলকে নিয়েও ধাঁধা —

"হেট কলসি উপরোত দণ্ড
পাত হয় তার খণ্ড খণ্ড
যদি হয় ফুল
হাজার টাকা মূল।" (উঃ বনুয়া ওল।)

এছাড়াও এই মানুষগুলির বিশেষ খাদ্য হল শামুক ও ঝিনুক। তাই শামুক ও ঝিনুক নিয়েও তারা ধাঁধা তৈরি করে —

"একেনা বুড়ি খই ভাজে
মানষি দেখিলে দুয়ার ঢাকে।" (উঃ শামুক।)

"বাঁচিলে এক, মরিলে দুই
কাম কাজ করিয়া তুলিয়া থুই।" (উঃ ঝিনাই।)

খাদ্য বস্তু ডিমকে নিয়েও পাই ধাঁধা —

"ক দেখি ভাই ঘর কোনা আছে
তার দুয়োর কোনো নাই।" (উঃ ডিম।)

পাঠান্তর ঃ

আই আই আই
ঘর আছে তি দুয়ার নাই।

ধাঁধায় ব্যবহৃত রূপক ও উপমা বস্তুগত ও কল্প জগতের সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তা শিল্প ও রসবোধেরও সৃষ্টি করে। যার মধ্যে ধাঁধা রচয়িতাদের পরিণত শিল্প ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — 'ইহাদের মধ্য দিয়ে পরিণত শিল্প ও রস বোধেরই পরিচয় প্রকাশ পায়, ... কোন অপরিণত বুদ্ধি সমাজের শিল্প ও রসসৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে না।'[৭৪]

আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, কলা, সুপারি উত্তরবঙ্গের প্রধান ফল। তাদের নিয়েও পাই ধাঁধা —

"একনা বাপই

সারা গায় আটই'' (উঃ কাঁঠাল/কাঠোল।)

পাঠান্তর ঃ

''একনা বাপই
সারা গায় অঠোই।''

''হিত্তি গেনু হুত্তি গেনু গেনু মরার ঘাট
আপন চখু দেখি আসিনু ফলের উপর পাত।'' (উঃ আনারস।)

পাঠান্তর ঃ

''হেত্তি গেনু হুত্তি গেনু গেনু ধূপগুড়ির হাট
আপন চখু দিয়া দেখিনু ফলের উপর পাত।'' (উঃ আনারস।)

''উপর থাকি পড়িল ঢ্যাপ
ঢ্যাপ কয় বলে মোর প্যাট কাট।'' (উঃ সুপারি।)

এই মানুষেরাই আবার জল বা অন্য কোন বস্তু রাখার জন্য ব্যবহার করে পাতিল। পাতিল নিয়ে ধাঁধা —

''একনা বুড়ি হাট যায়
গালে মুখে চড় খায়।'' (উঃ পাতিল।)

তিস্তা ও তোর্ষাপারের রাজবংশী সমাজের খাদ্য, বাসস্থান, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, তাদের জীবিকা, কৃষিকৌশল, কৃষিকেন্দ্রিক নানা উপাদান ধাঁধাগুলির মধ্যদিয়ে উঠে এসেছে, যার মধ্য দিয়ে সামগ্রিক ভাবে কৃষক তথা কৃষিজীবনের নানাছবি প্রতিফলিত হয়েছে।

গান ঃ

মানুষের মুখের ভাষা সীমাবদ্ধ কিন্তু অন্তরের ভাব অসীম। এই অসীম ভাবকে সীমাবদ্ধ করার প্রকাশ করা যায় না তখনই প্রয়োজন হয় সুরের। সুর মানুষকে অতি রূঢ় বাস্তব চেতনাকে ভুলিয়ে দেয়। টেম্পেরালকে তা করে দেয় টাইমলেস। একবার অন্নদাশংকর রায় কবিগুরুকে বলেছিলেন — 'হে কবি আমি তোমার গান শুনে মরণ থেকে উঠে আসতে পারি।' তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের গানও যেন ঠিক তাই।' যেই শুনেছে সেই মজেছে। এতদঞ্চলের গান শুধুমাত্র বাংলাদেশকে নয় বিশ্বলোকসংস্কৃতি উৎসবেও সবাইকে মাতিয়ে দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করেছে। মূলতঃ যে গানের জন্য এতদঞ্চল আন্তজার্তিক স্বীকৃতি লাভ করেছে তা ভাওয়াইয়া

গান। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হল কৃষিজীবন তথা কৃষিকর্ম কিভাবে এই গানে জড়িয়ে আছে বা উঠে এসেছে।

ভাওয়াইয়া গান ঃ

তিস্তা ও তোর্ষাপারের উর্বর পলিমাটি বিভিন্ন কৃষিজাত ফসলের পাশাপাশি উপহার দিয়েছে বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতি ও পরম্পরা। উত্তরবঙ্গ তথা তিস্তার উত্তরাঞ্চল মূলতঃ কৃষিকেন্দ্রিক ভূখণ্ড। কৃষিই এখানে অর্থনীতির জীবনী শক্তি। শতাংশের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে যে কৃষি নির্ভর লোকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই কৃষি নির্ভরতা শুধু ঔপনিবেশিক পর্বেই ছিল, তা নয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বেও এই নির্ভরতা সমানভাবে সক্রিয় ছিল এবং আছে। কাজেই কৃষি তথা কৃষক জীবনের কথা বাদ দিয়ে কোনো আলোচনাই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। এতদঞ্চলের 'রাজনীতি -কৃষি ও সংস্কৃতি একইসূত্রে গাঁথা'। তিস্তা ও তোর্ষা পারের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতি প্রবাহের মধ্যে অন্যতম ধারা হল লোক গান, আর এই লোকগানের অন্যতম ভাওয়াইয়া গান। ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে কৃষক তথা কৃষিজীবন কিভাবে জড়িয়ে আছে সেটাই এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ভাওয়াইয়া সংগীত মূলতঃ তিস্তা ও তোর্ষাপারের সম্পদ। কেউ কেউ এর একটা সীমারেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'হিমালয় পাদশৈল অঞ্চলের সমভূমির প্রান্তসীমা থেকে রংপুর জেলার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাকে ভাওয়াইয়ার সঙ্গীতাঞ্চল বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে করতোয়া গঙ্গা মধ্যবর্তী প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধনের এলাকাসহ অসমের গোয়ালপাড়া জেলাকেও উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এই ভৌগোলিক এলাকার অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল নানা প্রজাতির তৃণভূমি সম্বলিত বনভূমিতে ঢাকা'।[৭৫] আমাদের মনে হয় ভাওয়াইয়া সঙ্গীত দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে আজ তা দেশকালাতীত, সার্বজনীন।

তিস্তা ও তোর্ষাপারের তণ্ডুল জাতীয় শস্যের মধ্যে ধান ও গমের উৎপাদন অন্যতম। এছাড়া তন্তু জাতীয় ফসল পাট এই অঞ্চলে অন্যতম অর্থকরী ফসল। তিস্তা ও তোর্ষা নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একদা প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপাদন হত বলে জানা যায়।[৭৬] একদা এই তামাক রপ্তানি হত ব্রহ্মদেশে (বর্তমান মায়ানমার), অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা তীরবর্তী অঞ্চল কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাই এতদঞ্চলের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির সঙ্গে কৃষিকর্মের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই, আমাদের প্রকল্পধৃত প্রবন্ধের বিশেষতঃ রাজবংশী সমাজের কৃষিজীবনের সঙ্গে ভাওয়াইয়া গানের মেলবন্ধনের প্রয়াস। সম্প্রতি আলুও একটি অর্থকারী ফসল হিসেবে উঠেছে। আমাদের রাজ্যে ২৩ লক্ষ বিঘা জমিতে আলু চাষ হয়। রাজ্যে আলুর উৎপাদন গড় বিঘা প্রতি ৮৭ মণ। সর্বভারতীয় গড় বিঘা

প্রতি ৫৮ মণ। পশ্চিমবঙ্গে সারাভারতের প্রায় ৩৫ শতাংশ আলুর উৎপাদন হয়। হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুরে রাজ্যের উৎপাদনের ৬৫ শতাংশ চাষ হয়। উত্তরবঙ্গের কুচবিহার ও জলপাইগুড়িতে তিন লক্ষ বিঘা জমিতে আলু চাষ হয়। গড় ফলন জাতীয় গড় ফলনের প্রায় সমান।[৭৭]

কৃষিজীবনের সঙ্গে লোকায়ত জীবনের যে অচ্ছেদ্যবন্ধন অনাদিকাল থেকে তৈরি হয়েছে তা লোকায়ত উপাদানগুলির মধ্যে গভীরভাবে প্রতীয়মান। রাজবংশী সমাজ মূলতঃ কৃষিনির্ভর। কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে কৃষক তার ইচ্ছা অনিচ্ছা, ভালোলাগা-মন্দলাগা, কামনা-বাসনা, সখ-আহ্লাদ পূরণ করবে এবং তার ভাবনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকায়ত সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন লোকায়ত উপাদানের মধ্যে একটি শাখা ভাওয়াইয়া সঙ্গীত যা তিস্তা ও তোর্ষাপারের অন্যতম লোকসংস্কৃতি। ভাওয়াইয়ার সুর তাল মনকে ব্যাকুল করে তোলে, ভাবিয়ে তোলে, মনকে উদাস করে দেয়। তাই 'ভাব' থেকে ভাওয়াইয়ার উৎপত্তি বলে মনে হয়। কেউ বলেন - ভাওয়াইয়া গানের সূত্র 'ভাওয়া' সূত্র থেকে। 'ভাওয়া' মহিষ চরার পতিত ভূমি। মহিষের পিঠে চড়ে দোতরা বাজিয়ে মইষাল যে গান গায়। আবার কারও মতে ভাওয়াইয়া কথাটি বাওয়াইয়ার প্রতিরূপ। 'বাও' মানে বাতাস। গানের সুরে আকাশ-বাতাস—ধরিত্রীকে মথিত করে বলেই বাওয়াইয়া, আর তা থেকেই ভাওয়াইয়া।[৭৮] ভাওয়াইয়া গানের সৃষ্টিতত্ত্ব যাই থাক না কেন এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে তিস্তা ও তোর্ষাপারের বৃহত্তর বলয়ের কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর আবেগের মাধ্যম ভাওয়াইয়া সঙ্গীত। তাই কবির সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারি - 'যে ভাবই উঠে প্রাণের মাঝে/সকলই আছে ভাওয়াইয়া গানে।'

কৃষিকর্মে হাল একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। হাল মানে লাঙ্গল-জোয়াল-গরু-মানুষ-জমির মিলিত রূপ। হলকর্মে কোন লজ্জা নেই বরং লোকবিশ্বাস হাল দিলে লোকসমাজে কদর বাড়ে। তাই ভাওয়াইয়া গানে পাই সেই লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন -

"ও বাপই রে কারবা কথাত ডর
কোমরতে গামছা বান্ধি হালের মুঠি ধর বাপইরে।
জোর করিয়া হাল বুয়াওরে বাপই
জমিতে ফলাও ধান
আসিবে কত কইন্যার খবর
বাড়িবে কত মান বাপইরে।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. দ্রষ্টব্য)

ভাওয়াইয়ার মধ্যে এতদঞ্চলের কৃষকের জীবন-জীবিকার ভাবনা রূপায়িত। কৃষক কৃষি ছাড়া কিছু বোঝেনা। কৃষিই তার আশা-ভরসা। তাই ভূ-স্বামী, কি বর্গাদার, কি দিনমজুরি সবারই মনের কথা একযোগে প্রকাশ পায়, যখন শুনি -

"ও মোর হালুয়া চাষা ভাই ও মোর দিনমজুরী ভাই
চল লাঙল জোংয়াল ঘাড়ৎ লইয়া ক্ষেতৎ চলিয়া যাই
আনন্দে ভাই বুয়ামু হাল ফসল হামার হইবে ভাল
সুখে হামরা থাকিমু সবাই
হাল না বুয়াইলে হামার বাঁচার উপায় নাই
ও মোর হালুয়া চাষা ভাই।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৯৯ দ্রষ্টব্য)

এদিকে কৃষক উদয়াস্ত পরিশ্রমে কৃষিকর্ম করে, আশা-আতঙ্কের দোলাচলতার মধ্যে দিয়ে সোনার ফসল জমিতে দেখে বুকটা খুশিতে ভ'রে উঠে। কিন্তু তার সংসারের অভাব ঘোচে না। আসলে জোতদার জমিদারের হাতে কৃষকের সর্বস্বান্ত হওয়ার কথাই মনে করিয়ে দেয় -

"ফল ফলাং মুই সোনার ফসল দিন রাত্রি খাটিয়া
তাও কেনে মোর মাইয়া ছাওয়া রে থাকে কচুর মুরা খাইয়া।
শাকের সিজা খাইয়া - ও মুই হাল বুয়াং রে।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ৩০১ দ্রষ্টব্য)

কিংবা

"সুখ নাইরে ও মোর চাষার কপাল
বারমাসে যায় হাল বুয়াইতে
উঠিয়া সকালে সুখ নাই চাষার কপালে
....
ধনীর ঘরে লেপ তোশক ভাই শীতে না পায় তাল
চাষী ভাইদের ঘরে ঘরে বিছিনায় দেয় পোহাল
হামার গড়িয়া কপাল।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ৩০৩ দ্রষ্টব্য)

আবার বস্তুগত লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল লোকগান। যা পল্লী বাংলার কৃষক তথা কৃষিজীবনের সঙ্গে সম্পর্কায়িত। লোকযান অর্থাৎ গরু-মোষের গাড়ী, নৌকা ইত্যাদি। এই লোকযান থেকেই গাড়িয়াল, মইষাল, মাঝি ইত্যাদি শব্দগুলি ভাওয়াইয়া গানে ওঠে আসে, যা এই সঙ্গীতে কৃষ্ণ মিথকে মনে করিয়ে দেয়।

অপরদিকে, 'কৃষ্ণ' শব্দটি কৃষির সঙ্গে যুক্ত হবার কারণে কৃষি সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ মিথ সৃষ্টির এবং বিবর্তনের দিকটি স্পষ্ট হয়'।[৭৯] কৃষ্ণ শব্দের অর্থানুযায়ী কৃষ্ণ হলেন

কৃষির দেবতা। শব্দার্থ ব্যাখ্যা না করেও যে কৃষ্ণকথা সমাজে প্রচলিত সেখানে কৃষ্ণ পুরোপুরি কৃষির দেবতা না হলেও পশুপালকতো বটেই। যার বড় ভাই হলধর অর্থাৎ কৃষক তার পরিবারকে কৃষির সঙ্গে যুক্ত বলে ধরে নিতে অসুবিধা হয় না।'[৮০] মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে পশুচারণ স্তরের পর এসেছে কৃষি সভ্যতার স্তর। সারা পৃথিবীর মানব সভ্যতার বিবর্তনে পরিলক্ষিত হয় পশুচারণজীবীকে হত্যা বা পরাজিত করে কৃষিজীবী সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিবর্তনের একস্তর থেকে আরেক স্তরে যেতে যে ভাঙা গড়ার সম্মুখীন হতে হয় তারই ফলশ্রুতি হিসেবে কৃষ্ণ মিথকে পাই ভাওয়াইয়ার গাড়িয়াল বন্ধু, মৈষাল বন্ধু ও মাহুত বন্ধুর মধ্যদিয়ে। আর রাধা যেন রক্তমাংসের মানবী উত্তরবাংলারই কোনো কৃষক বধূ।

"ওকি ও গাড়িয়াল ভাই
কতই রব পন্থের পানে চায়া রে।"

কিংবা

"মৈষ চড়ান মোর মৈষাল বন্ধুরে
মৈষাল মুজনাই নদীর পারে
ঘুন্টির বাইজন শুনিয়া মৈষাল
মন না রয় মোর ঘরে মৈষালরে"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ৩০২ দ্রষ্টব্য)

তিস্তা ও তোর্ষাপারের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে সমান্তরাল ভাবে গড়ে উঠেছিল বাথান সংস্কৃতি। দার্জিলিং জেলার নিম্নসমভূমি অঞ্চল, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি, নাথুয়া, আলিপুরদুয়ার; কুচবিহারের, তুফানগঞ্জ, অসমের গোয়ালপাড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তৃণভূমিতে বিশেষতঃ নদী তীরবর্তী এলাকায় গড়ে ওঠে অসংখ্য বাথান। সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে দহিদুগ্ধ বাজারে আসত। এই বাথান সংস্কৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণেই মৈষাল বন্ধুরা মহিষের পিঠে চড়ে উদাসী পাগল করা সুরে গান ধরতেন - যে সুর তার একান্ত নিজস্ব।

"আসিল আগুন মাস পাকিল নয়া ধান
ধান কাটিয়া চিড়া ভুকি করিব নবান
ওরে নয়া গাই -এর নয়া দই নয়া গাছের কলা
নয়া চাউলের মুড়ি দিয়া বানামু নবান।
নয়া চাউলের নয়া ভাত নয়া নাফা শাক
নয়া পেপা বাইগনের ভাজা খুয়াইসু শাগাইলাক
নয়া ধানের শীষ দেখিয়া নাচেরে হামার মন
নবান করি আজ পড়শিক করিব নিমন্ত্রণ।

আসিল আগুন মাস।''

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৯৯ দ্রষ্টব্য)

লোকসংগীত হল লোকায়ত সমাজের দর্পণ। তাই একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কৃষক তথা কৃষিজীবনের কথাই তিস্তা ও তোর্ষাপারের ভাওয়াইয়া গানের উপজীব্য বিষয়। তবে আজকাল আর বাথান সংস্কৃতি নেই। গরুমোষের গাড়ী নেই - তাই লোক গায়ক গান ধরেন -

''আজি মৈষাল বন্ধু মোর হারেয়া গেইসে রে।
আজি গাড়িয়াল বন্ধু মোর হারেয়া গেইসে রে
আজি মাহুত বন্ধু মোর হারেয়া গেইসে রে।''

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ৩১১ দ্রষ্টব্য)

গমীরা গান ঃ

পূর্ববঙ্গের নীলের গাজন এবং পশ্চিমবঙ্গের শিবের গাজনের মতই গমীরা তিস্তা ও তোর্ষা পারের লোকউৎসব। চৈত্র সংক্রান্তির চার পাঁচদিন পূর্বে 'গমীরা শুরু হয় এবং সংক্রান্তির দিন শেষ হয়। অর্থাৎ বছরে চার পাঁচদিন এই গমীরা গানের স্থায়িত্ব। গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়ের লোকেরা চৈত্রমাসের শেষের দিকের একটি শুভ দিন দেখে কোন এক মাঠের মধ্যে শিব মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্তি প্রতিষ্ঠার সময় পুরোহিত আসেন সঙ্গে থাকে ঢাক ঢোল কাঁশর ইত্যাদি। অর্থাৎ গায়কের সমাবেশ হয়। তারপর শুরু হয় পূজা, পূজার সময় প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে। পূজা শেষ করে পুরোহিত গায়ক দলের মাথায় জল ছিটিয়ে দেন। অতঃপর গায়করা ঐ চার পাঁচ দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে গমীরা গান করেন। গান করার দিন গুলিতে গায়করা অত্যন্ত শুদ্ধাচারে থাকেন এবং কোন রকম উত্তেজক দ্রব্য ভক্ষণ করেন না।

পূর্বে শিব বিষয়ক গানগুলি গমীরা নামে পরিচিত ছিল। ধীরে ধীরে সভ্যতা ও শিক্ষার প্রসারের ফলে নিরক্ষর পল্লী বাংলার মানুষদের মধ্যে নূতন চেতনার জাগরণ ঘটতে থাকে এবং গানগুলির মধ্যে ফুটে ওঠে আদিরসের প্রাধান্য। এই গানগুলি কখনো 'ভাওয়াইয়া' সুরেও গাওয়া হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে তাই অনেক সময় দোতরাও ব্যবহৃত হয়। সমাজের বিভিন্ন দিক এই গমীরা গানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় —

'' ও আই টাকার লোভে বুড়াক দিলেন
আর মুলুকত বর নাই পালেন
মোকে কি সগায় যে বুড়ি আই
সগায় কছে জেঠাই খুড়াই

কাহো কছে বুড়ি আই বুড়ি আই
নদারী করার গে মান্‌ষি নাই
ও আই সাজি বুড়ি গুয়া পান
ও বুড়া বরের ফেদেলান
গুয়া ভুকাইতে যাবে জান।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৯১ দ্রষ্টব্য)

এখানে লক্ষণীয় যে, অল্পবয়স্কা একটি মেয়ে তাকে বৃদ্ধ একজনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। এবং সেই কিশোরীটি দৈনন্দিন জীবনের নানা দুঃখের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়। আমাদের গ্রাম্য সমাজে পূর্বে এই সমস্ত সামাজিক সমস্যাগুলি প্রবলভাবে ছিল। অন্যদিকে দেখা যায় যে, সরাসরি শিবকে বাদ দিয়ে ভণ্ড দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে—

"হামরা হলাম চাষি মানষী
যে বুলাইছে সেই বুইল্যাছি
আইয়াছে ভোটের পালে
খ্যায়া খ্যায়া দিনু কাঁচা কলা।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৯২ দ্রষ্টব্য)

এখানে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ গুলি যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি সমাজ সচেতনতার দিকটিও সমুজ্জ্বল।

মেছেনী গান ঃ

ইতিপূর্বে মেছেনী ব্রত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই নিবন্ধে মেছেনী গান সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। সমস্ত বৈশাখ মাস ধরে বা বৈশাখ মাসের কিছুদিন মেয়েরা দলবদ্ধ ভাবে এই লোকসংগীতের মাধ্যমে ব্রত পালন করে থাকেন। মূল ব্রতিনীকে বলা হয় 'মাড়েয়ানী'। তিস্তা নদী থেকে তুলে আনা মাটি ও গ্রাম দেবতার থানের মাটি সমেত 'মাড়েয়ানী' তিস্তা দেবীর ডালাটি কাঁখে নিয়ে সকলের অগ্রে এগিয়ে যান এবং তার মাথার উপরে একটি সুসজ্জিত ছাতা ধরা হয়। শোভা যাত্রার সময় ব্রতিনীরা দই ও ফুল মাখা আতপচাল বৃষ্টির মত বর্ষণ করতে থাকেন। এই অনুষ্ঠানটি কয়েকটি কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন — নামানি, রাস্তা হাটা বা পথ বেরানিয়া, বাড়ি ঢুকা, নাচানিয়া, উঠানিয়া এবং সর্বশেষ পর্যায় হল সাতসিনানী বা ভুরাভাসানী। এই সমস্ত পর্ব শেষ করার পর, বাড়ি ঘুরে ঘুরে যে চাল সংগৃহীত হয় তা দিয়ে নদীতে স্নান সেরে বনভোজন করে বাড়ি ফেরা হয়। এই লোক গানের মূল উদ্দেশ্য হল অধিক জল পাওয়া। তিস্তা নদীকে প্রধান উৎস করে তিস্তাকে জলদেবী রূপে কল্পনা করা হয়। এটি মূলতঃ নারীদের দ্বারাই

গীত হয়। নারীরা সারা মাস ধরে জলের প্রার্থনায় এই ব্রত পালন করে থাকেন।

গ্রামীণ দরিদ্র চাষিদের চিরন্তন বিশ্বাস অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করা —

"তিস্তা বুড়ির নামান গে হচে।
বড়য় হাউসালী।।
আলন্দে বরিয়া নেহ গে
দুমার পাঞ্চ কাহিনী।।
লক্ষ্মীর নামান গে হচে
বড়য় হাউসালী।।
ডাক লক্ষ্মীর নামান গে হচে
বড়য় হাউসালী।।
অখন লক্ষ্মীর নামান গে হচে
বড়য় হাউসালী।।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৮৪ দ্রষ্টব্য)

এই গানগুলি করার সময় রাস্তায় অন্য কোন দলের সঙ্গে সাক্ষাত হলে দুই দলের মাড়েয়ানীর মধ্যে গানের লড়াই জমে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে মাড়েয়ানীর দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব ও সংগৃহীত প্রতিভার বিচার হয়। এই গানের সঙ্গে কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। কেবলমাত্র করতালি দেওয়া হয়, এই কারণে এই গানের তালকে 'থাপুরি' বলে।

চোরচুন্নী গান ঃ

ইতিপূর্বে চোরচুন্নী ব্রতখেলা সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। এই নিবন্ধে চোর-চুন্নী গান সম্বন্ধে আলোচিত হবে। রাজবংশী লোকসমাজের অত্যন্ত প্রিয় গান 'চোরচুন্নী'। এতদঞ্চলের মানুষেরা প্রতিবছর কালী পূজার সময় প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এই গান করে থাকেন। কালী পূজা বা তার পরের দিন থেকে শুরু করে চতুর্দশী পর্যন্ত এই গান করা হয়। কোথাও দুদিন-তিনদিন আবার কোথাও সাতদিন পর্যন্ত এই গান করা হয়। পুরুষরাই মূলতঃ এই লোকসংগীতের সঙ্গে যুক্ত কোন এক সুদর্শন কিশোরকে চুড়ি, শাড়ি, গয়না পরিয়ে চুন্নী সাজানো হয় এবং অপর জন বিচিত্র সাজসজ্জায় চোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। চোর ও চুন্নী দলের সর্বাগ্রে থাকে, এবং সং-সেজে কয়েকজন তাদের পেছন পেছন চলতে থাকে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সঙ্গে থাকে ঢোল বা মন্দিরা। এই ভাবে দল তৈরি হলে তারা গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চোরচুন্নীর গান করেন ও নাচেন, এবং গৃহস্থের নিকট থেকে পয়সা বা মিষ্ট দ্রব্যাদি নিয়ে নানা রঙ্গ তামাশা করে অন্য গৃহে যান।

'চোরচুন্নী' লোকসংগীতটি একান্ত ভাবেই সামাজিক। নিম্নবিত্ত মানুষ অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে কি করে একজন দরিদ্র মানুষ পেটের দায়ে অন্যের বাড়িতে চুরি করতে বাধ্য হয় তার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এই চোরচুন্নী গানের মধ্য দিয়ে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। অসুস্থতার জন্য চুরি করতে না পারলে কিরকম অভাবের মধ্য দিয়ে তাদের দিনাতিপাত করতে হয় তার বর্ণনা এই গানে পাওয়া যায়। সমাজের পুরুষ শাসিত ব্যবস্থার প্রতিও ইঙ্গিত আছে এই গানগুলির মধ্যে প্রসঙ্গতঃ চোরচুন্নী গানে লোকনাট্যের সম্ভাবনা আছে।

"ও আই মোক দিলেন কি দেখি
মোর কপালে মিলিল চোরা সোয়ামী এক।।
আগ পাছ না দেখিলেন;
আই পাশ পড়শী না পুছিলেন।।
চোর যাছে চুরি করির
মোক নাগেছে জিগির জিগির
ক্যামনে পোহাইম আই আন্ধার আতি।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৯১ দ্রষ্টব্য)

উত্তরবঙ্গের গ্রাম বাংলাতে এখনও অনেক জায়গা আছে যেখানে বাবা মায়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সেখানে ছেলে মেয়েদের কোন স্বাধীনতা থাকে না। এই মেয়েটির মধ্যেও তার 'আই' কে বলার মধ্য দিয়ে এই চিত্র ফুটে উঠেছে। চোর চুন্নীর কথা অগ্রাহ্য করে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল এবং চুরির দায়ে জেলে গেল। দীর্ঘ মেয়াদী জেলের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে চোরের মৃত্যু হয় এবং চুন্নী হয়ে পড়ে একা অসহায়। এই লোকসংগীতের মধ্যে একদিকে প্রকাশ পায় মানব জীবনের দারিদ্র্যের চরমতম রূপ, অন্যদিকে এক করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে শেষ হয় লোকসংগীতটি।

নারীর চিরন্তন সত্তাকেও এই লোকসংগীতের মধ্যে আমরা পাই —

"আজি আন্ধার আতি যাছিৎ ভেলা কুত্তি চুরি করিবার।
ওকি ও চরারে, ও তুই চুরি করা ছাড়েক ছাড়,
কিষ্যিকাম করিবার ধর,
য্যামন হইছে পাটার দর, ধরেক হাল ববার।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৯১ দ্রষ্টব্য)

এখানে লক্ষণীয় স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে কর্তব্য, যে দায়দায়িত্ব তার পূর্ণ রূপ। প্রত্যেকটা নারীই চায় স্বামীর সংসারে সুখী হতে এবং তাদের সুখের সংসারে যাতে কোন বিপদ না আসে তার খেয়াল প্রত্যেকটি নারীরই আছে। ঐ নারীটির মধ্যেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চুরি করা ছেড়ে দিয়ে তাকে কৃষিকাজ করার পরামর্শ দিচ্ছে এতেই ভেসে ওঠে নারীসত্তার সার্বজনীন রূপ।

———

ছড়া ঃ

ছন্দোবদ্ধ পদের একত্র সমাবেশ ঘটে ছড়ায়। ছড়া রচিত হয়ে থাকে সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায়। তাই বলা যায় লোকসমাজ কর্তৃক সৃষ্ট, ছন্দোবদ্ধ অসংলগ্ন চিত্র সম্বলিত, পরম্পরানুয়ায়ী পদসমূহই হল ছড়া। রবীন্দ্রনাথ ছড়া সম্পর্কে বলেছেন - 'আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয়, নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার শাস্ত্রের বাহির; মেঘ-বিজ্ঞানও শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভাল করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড় জগতে এবং মানব জগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারি ধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনা বৃষ্টিতে শিশু হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।'[৮১]

তিস্তা ও তোর্ষাপারের রাজবংশী সমাজের ছড়াগুলির মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে কৃষি ও কৃষিজীবনমূলক ছড়া। এগুলির মধ্যে যেমন শুদ্ধ হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে তেমনি এগুলি এখানকার লোকায়ত জীবনের নৈতিকতারও পরিচয় বাহী। এগুলি শুধু শিশু কিশোরের মুখে নয় বয়স্কদের মুখেও এগুলি সমান গুরুত্ব পায়। অর্থাৎ এই ছড়াগুলির মধ্যদিয়ে এতদঞ্চলের সমাজ মানসিকতা প্রত্যক্ষ হয়।

তিস্তা ও তোর্ষাপারে রাত হলেই কৃষক বউয়ের যেমন দুশ্চিন্তা হয় তেমনি কৃষক রমণীর ভয়ার্ত রূপটি ফুটে ওঠে এই ছড়ায় —

"আন্ধার ঘরৎ সন্দাইল চোর,
হাতে বেড়াও পয়ার গোড়।
জ্বালাও বাতি জ্বলে না,
চোর মরাটা মরে না
উঠ্ উঠ্ স্বামী ধন প্রাণ বাঁচে না।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫৭ দ্রষ্টব্য)

আন্ধার - অন্ধকার, ঘরৎ - ঘরে, সন্দাইল - প্রবেশ করল, হাতে বেড়ায় -হাত্ড়ে বেড়ায়, পয়ার গোড় - খুঁটির গোড়ায়। অন্ধকার ঘরে চোর ঢুকেছে। খাটের খুঁটি হাত্ড়ে বেড়াচ্ছে, বাতি জ্বালতে গিয়েও জ্বলে না, বউ ভয়ে অস্থির আর স্বামী নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে।

উত্তরবাংলার অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিনির্ভর। তাই এখানকার মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নিচের ছড়াটি কৃষিকেন্দ্রিক —

"আগশোর আগশোর হাট
পোকা-মাকড় নেন্দুর ভেন্দুর দূর যা
সোনার নাঙ্গল উপার ঈশ্।

হামার ধানের বড় বড় শীষ্।''

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫৮ দ্রষ্টব্য)

কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত এই ছড়াটি পূজাকেন্দ্রিক। ক্ষেতি লক্ষ্মী পূজার দিন এই ছড়াটি ধানখেতে আবৃত হয়। ছড়াটির মাধ্যমে ক্ষেতি লক্ষ্মীর নিকট আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, খেত থেকে পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রাণীসমূহ যাতে দূরে সরে যায়। এবং অন্য সকলের ধান যেমনই হোক না কেন আমার ধানে যেন বড় বড় শিষ্ যুক্ত হয় এবং সকলের শ্রেষ্ঠ হয়। জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় কোনো কোনো অঞ্চলে ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজায় হাঁস বলি দেওয়ায় প্রথা আছে। সেই প্রথারও পরিচয় ছড়ায় আছে —

''হাঁসের ডিমা কচুর ফুতি
আয় মা লক্ষ্মী হামার ভিতি।''

মা লক্ষ্মীকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, হাঁসের ডিম কচুর ফুতি দিয়ে তোমাকে অর্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে। তুমি যেন আমাদের বাড়িতে অবস্থান করো। তিস্তা ও তোর্ষাপারের কৃষি প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই মেঘ বৃষ্টিকে আহ্বান করার একটি ছড়া —

''গিরজি আয়রে ঝরি
মানার পাতত ধরি।''

বৃষ্টিকে আহ্বান করা হচ্ছে মানকচুর পাতায় গর্জন করে ঝরে পড়বার জন্য।

অনুরূপ আরেকটি ছড়া —

''যারে পানি ঘুরিয়া
সিদল দিম পুরিয়া।''

উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত লোকখাদ্য সিদল। এই সিদল শুকাতে রোদের দরকার। তাই বৃষ্টিকে থামবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অপরদিকে সিদলের মাহাত্ম্যে নিয়ে পাই কবিতা —

''নমস্কার কর মুই কালা সিদলের পায়
আহা কি মধুর নাম তোমার হইল দুনিয়ায়
ইচ্ছা করি কেহ যদি সিদল খাইতে চায়
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল তার চারগুণা হয়।''

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫৭ দ্রষ্টব্য)

আবার কোন ছড়ায় লোকায়ত জীবন দর্শনের ইঙ্গিত মেলে —

''সংসার সাগররূপ
মীনরূপা মানবা
জঞ্জাল জালরূপা

কালরূপা ধীবরা।''

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫৫ দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ সাগররূপ সংসারে মানুষ মাছের মত, সেখানে যমরূপ ধীবর জাল নিয়ে এসে মাঝে মাঝেই হাজির হয়। কিংবা —

''সাধু যায় গুণ খুঁজে
মধু খুঁজে ভোমরা
মক্ষিকায় খুঁত খুঁজে
দোষ খুঁজে বর্বরা।''

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫৫ দ্রষ্টব্য)

এই ছড়াটিতে মানুষের স্বভাব চরিত্রের কথা বলা হয়েছে; যা কেউ পাল্টাতে পারে না। যারা সাধু সজ্জন ব্যক্তি সর্বদা লোকের মঙ্গল কামনা করেন। অন্যদিকে বর্বর বা বাজে লোক মানুষের সর্বদা দোষ খুঁজে এটাই স্বাভাবিক। আবার ভোমরার কাজ মধুর সন্ধান নেওয়া। আর মাছি খুঁত পেলেই সুবিধে; সে সেখানে বসে তার আহার সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যদিয়ে মানব জীবনের নীতি শিক্ষার কথাটি এই ছড়াটির উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

''শ্বশুরবাড়ি মধুর হাড়ি
দিনা চারি ভারিভুরি
এটা কথায় অর্থ কেমন
ছাই-এর ভিড়ায় কুত্তা যেমন।''

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫৬ দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ কোন বধূ বাপের বাড়ি যাওয়ার কিছুদিন পর তার স্বামী তাকে আনতে গেলে সম্বন্ধী বউ বলে উঠে, শ্বশুর বাড়িতে জামাই আদরটা ভালই পাবে অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি। এবং সেটা দু'চারদিন পাওয়া যায় অর্থাৎ 'দিনা চারি ভারি ভুরি।' জামাই এর অর্থ জানতে চাইলে সম্বন্ধী বউ বলছে ছাই-এর গাদায় কুকুর যেমন করে আরাম করে ঠিক তেমনি দু'চারদিন অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। অর্থাৎ যে প্রকৃত পুরুষ সে নিজের বাড়িতেই ভালোমন্দ খেয়ে পড়ে থাকে। এতদঞ্চলের মানুষ মনে করেন —

''মানষি সোজা হয় হুমকিত্
গরু সোজা হয় পেন্টিত
মাইয়া সোজা হয় পেন্দনত
সাগাই সোজা হয় আন্দনত।''

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫৫ দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ হুমকি না দিলে মানুষ কোনো কথা শুনে না। যেমন পেন্টি বা লাঠি দেখলেই গরু ঠিক থাকে, ভাল কাপড়-গয়না পেলে নারী ঠিক থাকে তেমনি ভাল রান্না বাড়া হলে আত্মীয় স্বজনও খুশি হয়।

"হরহর গড়গড়
কালাই ভাঙ্গি ডাল কর
সেই কালাই খাবে তোর
মামা মাসির ঘর।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫০ দ্রষ্টব্য)

কালাই অর্থাৎ মাসকলাই বা 'ঠাকুরী' কলাই। এতদঞ্চলের এই ডাল খুব জনপ্রিয় ও সুস্বাদু। তাই সাগাই বা আত্মীয় স্বজন এলে এই ডাল খাওয়ানোর নিয়ম। এখানে শিশুর মামা মাসিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। শিশুর মামা-মাসির সঙ্গে তার মায়ের ঠাট্টার সম্পর্ক। তাই খেলাচ্ছলে সে ডাল ভাঙার কথা বলা হয়েছে তাই তার মামা মাসি খাবে বলা হয়েছে। আসলে মামা-মাসীর আগমন ও ডাল খাওয়ার কোন সম্ভাবনাই এখানে নেই।

'নিন আয়রে নিন আয়' এই ছড়াটি সাধারণত শিশুর মায়েরা শিশুকে দোলনায় ঘুম পাড়ানোর সময় বার বার আবৃত্তি করেন। মায়ের মধুর কণ্ঠের আবৃত্তি বার বার শুনতে শুনতে শিশু ঘুমিয়ে পড়ে। লক্ষ্য করবার মতো, এই দোলনাটি বাঁশের বাতা অর্থাৎ কৃষিজাত ফসল দিয়ে তৈরি। তাই বলা যায় তিস্তা ও তোর্ষাপারে ছড়ায় কৃষিকেন্দ্রিক উপাদান বর্তমান।

"হামার দাদা নাচন জানে ভাল
নাইচতে নাইচতে খাল খুড়ে
আদন ধান বাইর করে
নাইচতে নাইচতে খাল করে।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫০ দ্রষ্টব্য)

আ-দন - অর্ধেক দোন, দোন অর্থে ধান মাপার কাজে ব্যবহৃত ছোট বাঁশের ঝুড়িকে বোঝানো হয়। যাইহোক, শিশুর পরিচর্যাকারিণী এখানে তার ঠাকুরমা। তিনি বলেছেন - আমাদের দাদাবাবু ভাল নাচতে জানে। নাচতে নাচতে খাল তৈরি করে ফেলেছে। গোলাঘর থেকে অর্ধেক ধান বের করেছে। মামাদের পান্তা ভাতের হাড়ি বের করেছে। দাদাবাবুর নাচের কোন ছন্দ নেই। মাচার নিচে ছয়কুড়ি ছাগল এখনো রয়ে গেছে। শিশুটি হয়তো এখনো হাঁটতে শেখেনি। আমাদের ঘরের ঠাকুরমা/দিদিমারা সর্বদা কামনা করেন তাদের নাতিরা যেন শীঘ্র বড় হয়ে শক্তিমান হয়ে ওঠে, এখানে তারই প্রকাশ পেয়েছে।

"হামার মাই নাচে
ধান কুলাখান পাচে
উয়ার পিসাই নিলাজী
জাওলা ধরি আসে
জাওলাৎ নাই ধান
ধর শালীর কান"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫১ দ্রষ্টব্য)

পাঁচে মানে - পাচ্ছে, ঝাড়ে - ঝেড়ে পরিষ্কার করে, পিসাই-পিসিমা, জাওলা-থলে, নিলাজী-লজ্জাহীনা। শিশুর পরিচর্যা যখন পিসিমা স্থানীয়া কেউ করেন, তখন তিনি বিদ্রূপ করেন তার বৌদির পক্ষের আত্মীয়দের। এখানে আসরে নেমেছেন শিশুর মায়ের পক্ষের কেউ। সবমিলিয়ে দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনের চরিত্রটি উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

খাওয়ানোর সময় কখনো কখনো শিশুরা বিরক্ত করে। মেজাজ বিগড়ে গেলে খেতে চাইত না একেবারেই। তখন একধরনের ছড়ার ব্যবহার দেখা যায়। এসব ছড়া শোনাতে শোনাতে শিশুকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়, যেমন —

"কাউয়া জোগায় খেড়খড়ি বগে আন্ধে ভাত,
হামার মাইটা ভাত খায় বগে ফেলায় পাত,
শুকিয়া গেলেক বাটার পান খাটা হৈলেক দৈ,
মোসির বেটি দয়া জানে আনিল মুড়ি খই।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫১ দ্রষ্টব্য)

কাউয়া-কাক, খেড়খড়ি - খড়কুটো, আন্ধে - রান্না করে, বগে - বক, খাটা - টক, মোসি - মাসি। খুকী যে ভাত খায় তার রান্না করে দেয় বক। এবং রান্নার কাঠ জোগাড় করে কাক। খাওয়া শেষ হলে বক পাতা ফেলে দেয়। বাটার পান শুকিয়ে গেল। দই টক হল। মাসির মেয়ে দয়াবতী, সেই খই মুড়ি এনে দিল। আশা করি এখন আর সাধাসাধি করতে হবে না।

"হামার মাই নাচে
আদন ধান পাচে
মাথায় চুলি ঝাপুর-ঝুপুর
বুড়া ভাতার পাচে।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫১ দ্রষ্টব্য)

হামার - আমাদের, মাই - মেয়ে, আদোন - অর্ধেক দোন, পাচে - পায়, চুলি - চুল, ঝাপুর-ঝুপুর - এলোপাথারি, ভাতার - স্বামী। নাতনিকে ঠাকুরমা / দিদিমা ঠাট্টা করছেন, যে নাচে সে

অর্ধেক দোন ধান পায়। সে বুড়া বর পাবে কারণ তার মাথার চুল এলোমেলো, এ অবস্থায় বুড়া বর পাওয়াই তো স্বাভাবিক। ফলে ছড়াটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

"ঝোঁ-চু-চু-চু, বাঁশ বাড়িৎ গু
কায় ফেলাবে গু, মাসি ফেলবে গু
মামা গেইসে হাল ঝুড়িবার
মাসি জুড়িসে খলা"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৫২ দ্রষ্টব্য)

ঝোঁচু - ফিঙে, গু - মল, হাল - লাঙ্গল, খলা - চিড়ে বানানোর জন্য অর্ধসিদ্ধ ধান কড়াইয়ে ভাজা। ফিঙে পাখিকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে খুকু যে মলত্যাগ করছে তা ফেলবে কে? নিশ্চয়ই মাসি ফেলবে। কিন্তু এ দিকে যে দুঃসংবাদ মামা গেছেন জমিতে হাল দিতে। মাসি চিড়ে তৈরির জন্য খলায় অর্থাৎ উনুনে বসে গেছেন এমন সময় মাসির চুলে আগুন লেগে গেল। আসলে এটি দুর্ঘটনা নয়, মাসিকে নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়েছে মাত্র।

লোককথা ঃ

ইংরেজি 'Folktale' এর বাংলা পরিভাষা ' লোককথা' কিন্তু 'Folktale' এ কথার কোনো অবকাশ নেই। সেখানে কাহিনির 'ঠাসবুনুনী'। লোকমুখে চলিত গদ্যেই এ কাহিনি বর্ণিত হয়। গল্প শোনা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলেই তাই লোককথার প্রভাব রয়েছে। আমাদের প্রকল্পধৃত তিস্তা ও তোর্ষাপারের রাজবংশী সমাজেও তাঁর অন্যথা হয় না।

কৃষিভিত্তিক সমাজের গল্প কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ তাই সমাজের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, ধনী-দরিদ্র, ঈর্ষা-দ্বেষ মানুষের এইসব একান্ত মানবিক অনুভূতিগুলির নিদর্শন মেলে লোককথায়। তিস্তা ও তোর্ষাপারে যে সমস্ত গল্প সংকলিত হয়েছে তার শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে নিম্নরূপ ভাবে —

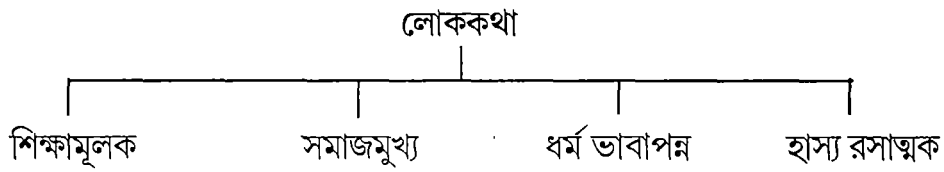

লোকসমাজে 'সর্বপ্রাণবাদে' বিশ্বাসের সূত্রে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম ইত্যাদি যে সমস্ত চরিত্র হয়ে উঠে, মানুষের ন্যায় কথা বলে, আচার আচরণ করে এবং সেই সূত্রে একটি নীতি গর্ভ গল্প কাহিনি পরিবেশিত হয় তাকে শিক্ষামূলক লোককথার পর্যায়ে ফেলা যায় এ প্রসঙ্গে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের 'উপকারীর অপকার', 'নাকাল শিয়ালের কথা' ইত্যাদি লোককথার প্রসঙ্গ উঠে আসে। 'উপকারীর অপকার' গল্পে (পরিশিষ্ট পৃ. ৩২০ দ্রষ্টব্য)। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দুষ্ট বাঘের উপকার করতে গিয়ে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন নয় তা শ্রোতা মাত্রেই বিচলিত হয়ে উঠে। নানা সাক্ষীর পর শিয়ালের বিচার বুদ্ধি ও সমস্যার সমাধানে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এ গল্পটি সমাপ্তি লাভ করে। শিয়ালের বিচারটি কৃষি সমাজের কাছে গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করেছে বলে আমাদের মনে হয়। কেননা শিক্ষিত সমাজ বা উচ্চকোটির লোক বাঘকে উদ্ধার করতে যেতো না বা গেলেও তার সাজা পাওয়াই উচিত এই রকম অহংবোধ থেকে গল্পের সমাপ্তি ঘটতে পারত। কিন্তু সহজ সরল গ্রামীণ পরিবেশে সেটা সম্ভব নয়। তাঁরা চায় সবার মঙ্গল। তাই গ্রাম্য অনাড়ম্বর জীবনে কৃষকের সহজ সরল জীবনের মতই গল্পগুলিও তাদের মত করেই পরিবেশিত হয়েছে।

'নাকাল শিয়ালের কথা' গল্পে (পরিশিষ্ট পৃ. ৩১২ দ্রষ্টব্য) শিয়ালের অতি লোভ যা কিনা চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় এবং শেষ পর্যন্ত দাঁতমুখ ভেঙ্গে গর্তে পলায়নের মধ্য দিয়ে গল্পটি বেশ উপজীব্য হয়ে উঠেছে। গাছা গরু বা ষাড় গরু, যা কিনা কৃষিকর্মের অপরিহার্য, অন্যদিকে গ্রামের মাঠে জঙ্গলে শিয়াল থাকাটাও স্বাভাবিক। তাই কৃষিজীবী সমাজ সৃষ্ট গল্পে কৃষি উপাদান ওঠে এসেছে।

অন্যদিকে শুধু মানবেতর প্রাণী বা উদ্ভিদ নয়, কখনও কখনও নীতি কথার চরিত্র হয়ে উঠেছে মানুষও। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ' হেদা-নেদার গল্প' (পরিশিষ্ট পৃ. ৩১৯ দ্রষ্টব্য)। হেদা-নেদার স্ত্রীদের দৈনন্দিন কলহ-বচসা, হাতাহাতি এবং তার সমাধানে স্বামীদের চেষ্টা চরিত্র অর্থাৎ ঘাট বদল ইত্যাদি কোনোটাই স্থায়ী সমাধান দিতে পারে নি। যা কিনা সহজ সরল গ্রামীণ নারীদের দ্বারাই সম্ভব। তাই শেষে সিদ্ধান্ত 'রবার না পায় ডাগিড়ি, রবার না পায় ঝগুড়ি, আর রবার না পায় গুদুড়ি। ডাগিরি মানে - নষ্টা নারী অর্থাৎ পরপুরুষের কামনা করে। ঝগুড়ি মানে যে ঝগড়ী করতে ভালবাসে। গুদুড়ি মানে - যে সবসময় ময়লা থাকতে ভালবাসে।

'মৈষাল ও কইন্যা' গল্পে (পরিশিষ্ট পৃ. ৩১৩ দ্রষ্টব্য) মৈষালের রাখাল থাকা, জমানো টাকা দিয়ে মোষ কেনা, সেই মোষ থেকে বহু মোষ, মোষ বিক্রি করে বহু টাকা, সেই টাকা দিয়ে অনেক জমি কেনা, জমিতে ধান লাগানো, ধান পাকা, পাকা শস্যে আগুন ধরানো, আগুনে খই ফুটা, সেই খই খেতে আসা অনেক পাখি, পাখি বন্দী ও পাখি ছাড়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এখানে উর্বরাতন্ত্রের ধারণাটি পাওয়া যায়। কেননা আমরা জানি এক মোষ থেকে বহু মোষ যা কিনা প্রজননতন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে গবাদি পশুর সার ও উপকারিতা থেকে প্রচুর জমি কেনা এটাও একটি শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির প্রকাশ যা প্রত্যেকটি কৃষিজীবী মানুষের স্বপ্ন। জমিতে আগুন, ছাই আখেরে জমির উর্বরা বৃদ্ধির লক্ষণ এবং সবশেষে প্রচুর পাখি যা উর্বরতাতন্ত্রের প্রতীক। কারণ আমরা জানি পাখির আগমন সেখানেই ঘটে যেখানে প্রচুর সমৃদ্ধি, প্রচুর খাবার দাবার এবং এই সমৃদ্ধি ও প্রচুর খাবার দাবার যে কোনো কৃষকেরই প্রধান লক্ষ্য। আর সেই সূত্রে এই গল্পে উর্বরতার ধারণাটি বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। ঠিক একই কথা খাটে পরবর্তী গল্প 'চুল বাড়ুক', 'লেবু বাড়ুক', 'ভাত বাড়ুক' গল্পে।

'চিরদিনে পোষ পোষ এলা হৈল মোর পুক্‌টি খানের দোষ' (পরিশিষ্ট পৃ. ৩১৪ দ্রষ্টব্য) লোককথায় পাণিকৌড়ি ও কাকের বাচ্চার মধ্যদিয়ে 'স্বভাব যায় না ম'লে' এই নীতি বাক্যটি আরেকবার প্রকট হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

উত্তরবঙ্গের কৃষকেরা কৃষিকাজ করলেও তাদের মধ্যেও যে গাণিতিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায় তা লক্ষ্য করা যায় 'ছাপান্নটা গরু' গল্পে (পরিশিষ্ট পৃ. ৩১৫ দ্রষ্টব্য)। এই গল্পে গরুর মালিকের মাত্র তিনটি গরু। তার একটি দড়ি ছিঁড়ে প্রতিবেশির জমিতে ধান খেয়েছে বলে প্রতিবেশির সেকি লম্ফ ঝম্ফ! এবং শুধু লম্ফ ঝম্ফই নয় সে সাদাটা = সাদ + আটা অর্থাৎ সাত আটা = ছাপান্নটা গরুতে উন্নীত করে পাড়াশুদ্ধ মাথায় করেছে - তা গল্পটিতে বেশ উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এখানেও আমাদের বলবার বিষয় কৃষিভিত্তিক সমাজের গল্পের উপাদানও কৃষিকেন্দ্রিক। তাই গরু-রশি-কৃষক ইত্যাদি বিষয় গল্পের মূল উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিক থেকে এই গল্পটিকেও কৃষিকেন্দ্রিক গল্প হিসেবে আমরা দেখতে পারি।

শুধুমাত্র পশু কথা বা নীতি কথার গল্পই নয়, তিস্তা ও তোর্ষাপারের লোকায়ত জীবনে যে ধর্মীয় বোধ-বুদ্ধিমূলক লোককথাও পাওয়া যায় তার উদাহরণ 'মানুষ হও' গল্পটি (পরিশিষ্ট পৃ. ৩১৬ দ্রষ্টব্য)। এই গল্পে গুরুদেবের আবির্ভাব ও তাঁর দীক্ষা দেওয়া, আশির্বাদ করা, শিষ্যের মন না ওঠা, শিষ্য দম্পত্তিকে জ্ঞানের চশমা প্রদান ইত্যাদি নানা হাস্যরস পরিবেশনের মধ্যদিয়ে গল্পটি সমাপ্ত লাভ করেছে। এই গল্পটির মধ্যদিয়ে লোকশিক্ষক ও লোকজ্ঞানের বিষয়টি সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বলে মনে হয়।

নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত লোক সৃষ্টি করেন নানাবিধ তাগিদে। যে তাগিদই এর পিছনে কার্যকর থাকুক না কেন, সংহত সমাজবদ্ধ মানুষ তার সমাজের কথা লোককথায় প্রকাশ করবেন এটাই স্বাভাবিক। অনেক অতিলৌকিক কাল্পনিক কাহিনি লোককথার দেহ জুড়ে থাকে। কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবটি সমাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে, তিস্তা ও তোর্ষাপারের লোককথাতেও এর অন্যথা হয় না। লোককথায় আমরা দেখতে পাই যে ক্ষুদ্র, অসহায় দৈহিক শক্তিতে অপটু শেষ পর্যন্ত তাদের জয় হয়। রাখাল, শিয়াল, পাখি, সাধারণ মানুষ প্রভৃতি লোককথায় বিজয়ী চরিত্র। কেননা সমাজের কিছু মানুষ থাকে যারা সহজ সরল জীবনযাপন করতে ভালবাসে, কিন্তু শক্তিমান কিছু সমাজপতি বা শোষণকারী এদের উপরেই বেশি অত্যাচার করে। বাস্তব সামাজিক পরিবেশে এরা সুবিচার পায় না, কিন্তু মনে মনে কল্পনা করে ঐসব সমাজপতির বা শোষকের পরাজয়। এই বাস্তব আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠে অসহায় প্রাণীদের ইচ্ছাপূরণের কাহিনির মধ্যে। তারই অসাধারণ মানবিক প্রকাশ লোকসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত লোককথা।[৮২]

লোককথার মেজাজ ও চরিত্র বিচার করলে দেখা যাবে যে, এক একটি লোককথা এক একটি টাইপ বা বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। একটি লোককথা অতিসরল কিংবা জটিল হতে পারে কিন্তু কথক যখন এই লোককথা বলবেন তখন দেখা যাবে যে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মেজাজ এর মধ্যে রয়েছে এটাই টাইপ।[৮৩]

লোকসমাজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে যা কিছু মানুষের চিন্তাকে আলোড়িত ও আন্দোলিত করেছে তার পরিচয় স্পষ্ট ভাবে কিংবা প্রতীক অভিপ্রায়ের মাধ্যমে লোককথায় ছড়িয়ে আছে।[৮৪] আর এইসব সম্পর্কের স্বরূপ উপলব্ধ করা যাবে টাইপ ও মোটিফ ইন্ডেক্সের মাধ্যমে। আমাদের আলোচ্য লোককথায় ব্যবহৃত টাইপ ও মোটিফগুলি লোকসংস্কৃতিবিদ্ দিব্যজ্যোতি মজুমদারের 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স' গ্রন্থের অনুসরণে সূত্রাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে। এতদঞ্চলের লোককথায় যে সমস্ত টাইপ ও মোটিফের ব্যবহার হয়েছে তা নিম্নলিখিত ইন্ডেক্সের মাধ্যমে প্রকাশিত করা হল, যেমন —

মৈষাল ও কইন্যা গল্প ঃ

যে গল্পের শেষ নেই	-	জেড - ১১
চালকা রাখাল	-	১৫৭৫
পুরস্কার হিসেবে জমিদার	-	কিউ -১১২.৩
কন্যার সঙ্গে বিয়ে		
রাখাল নায়ক	-	এল - ১০০.৬

'চিরদিন পোষ পোষ' গল্প ঃ

কথা বলা পাখি	-	বি - ২১১.৫
জ্ঞানী পাখি	-	বি - ১৪৩

'যেই ন্যাক ন্যাক সেই থ্যাক থ্যাক' গল্প ঃ

সময়ে উপলব্ধি পাল্টে যায়	-	ইউ - ২৬৩

'মানুষ হও' গল্প ঃ

ধার্মিক ব্যক্তি	-	ভি - ২২২
জাদুবস্তু (চশমা)	-	ডি - ৮০০
রূপ পরিবর্তন ঃ		
মানুষ থেকে ছাগল	-	ডি - ১৩৪
গুরু শিষ্যকে উদ্ধার করে	-	আর - ১৬৭

'হেদা, নেদার' গল্প ঃ

ঝগড়ুটে বউ	-	টি - ২৫৬

'উপকারীর অপকার' গল্প ঃ

ধার্মিক ব্যক্তি সকলের মঙ্গল চায়	-	ভি - ২২২.৭
বাঘ	-	বি - ২৮০.৫
কৃতজ্ঞ মানুষ অকৃতজ্ঞ পশু	-	১৬০ - গ
বুদ্ধিমান শিয়াল	-	বি - ১২০.২
অকৃতজ্ঞ বাঘ আবার বন্দী হল	-	১৫৫ - ক

ঘ) প্রয়োগধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে প্রয়োগধর্মী শিল্প-কলাগুলি অর্থাৎ মন্ত্র, তুকতাক, তাবিজকবচ, লোকঔষধ, লোকচিকিৎসা, কিভাবে কৃষি তথা কৃষিজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, কিংবা কৃষিজাত অনেক ফসল, ভেষজ বা লোকায়ত সমাজ লোকঔষধ হিসেবে কতটা ব্যবহার করে, এবং এই সকল ভেষজ কৃষিজাত ফসল কীভাবে লোকায়ত জীবনের লোকচিকিৎসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা দেখানো যেতে পারে বর্তমান প্রবন্ধে।

লোকচিকিৎসা কথাটি Folk Treatment -এর আক্ষরিক অনুবাদ। এখানে Treatment বলতে চিকিৎসা প্রণালীকে বোঝানো হয়েছে। আর Folk শব্দের অর্থ আমরা যে 'লোক' শব্দ ব্যবহার করি তা নিছক জনগণের অর্থবোধক নয় কিংবা জনগণের সমমান নয়। 'লোক' হল সংহত সমাজের মানুষের বিশেষ এক ভৌগোলিক পরিবেশে এক ঐতিহ্যানুযায়ী সাংস্কৃতিক মণ্ডলে যাদের বাস।[৮৫] সেই সব মানুষের যুগাক্রমিক ও বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে চিকিৎসা প্রণালী গড়ে তুলেছে যার প্রয়োগ বা ব্যবহার বিধিশাস্ত্রের মতানুযায়ী নয় এবং যার বিশ্বাসের মূল গভীর ভাবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তাকেই লোকচিকিৎসা বলা যেতে পারে। লোকচিকিৎসা প্রণালী মূলতঃ লোকসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

তিস্তা ও তোর্ষা পারের রাজবংশী সমাজের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আমরা লোকচিকিৎসার অন্তর্গত ধরে আলোচনা করছি। এই চিকিৎসা পদ্ধতি কোনো শাস্ত্রীয় মতানুযায়ী নয়, লোকসমাজের ঐতিহ্য পরম্পরায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই চিকিৎসা প্রণালীতে বিশ্বাসী এবং তা ব্যবহার করে আসছে। অতীতে আয়ুর্বেদের মতো বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রীয় চিকিৎসার পাশাপাশি যে লোকায়ত ধারাটি বিদ্যমান ছিল, রাজবংশী সমাজের লোক চিকিৎসায় সেই ধারাটি লক্ষ্য করা যায়। ঔষধের পরিবর্তে মন্ত্রের উপরই সাধারণ লোকের অধিকতর নির্ভরতা ছিল। মন্ত্রগুলি প্রায় মুখে মুখে এবং কখনো কখনো লিখিত পুঁথির সাহায্যে রক্ষিত হত।[৮৬] উত্তরবঙ্গ একদা ঘন বনাঞ্চলে আবৃত ছিল ফলে পথে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে হিংস্র জীবজন্তু ছাড়াও ভূত-প্রেত, অপদেবতা, উপদেবতারও উপদ্রব প্রবলতর ছিল। এই সবের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের ব্যাপারে ডাক্তার বৈদ্যের চাইতে স্থানীয় ওঝা কবিরাজের উপর গ্রামবাসীরা নির্ভর করতেন বলে মনে হয়।[৮৭] এদেশের (কামরূপ) মানুষ ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী এবং তাতে তাদের অতিরিক্ত আসক্তি আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন কামরূপবাসীগণ ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।[৮৮] এই জাদু বিশ্বাসের অস্তিত্ব যেমন তাদের লোকজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজও লক্ষ্য করা যায় তেমনি লোকচিকিৎসায় মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।

জাদু বিশ্বাসকে অবলম্বন করে লোকচিকিৎসার যে ব্যবস্থাগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পইরী নামানো, আখেরা দেখা, আখেরা চালি, জল কষা, তেল কষা ইত্যাদি।

পইরী (পরা) নামানো ঃ

পইরা নামানো হল অন্ধকার রাতে একটি নির্দিষ্ট ঘরে ওঝারা লোক চক্ষুর অন্তরালে পইরীকে আহ্বান করেন। ওঝা একটি কুলোতে মন্ত্র পাঠ করে সর্ষে ঘষতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ঘরের বাইরে বিভিন্ন প্রকার শব্দ করে পইরী তার উপস্থিতি জানান দেয়। তারপর 'পইরী' ঘরে প্রবেশ করলে উপস্থিত ব্যক্তিদের আগুন জ্বালাতে অথবা আলো জ্বালাতে কিংবা উপর দিকে তাকাতে নিষেধ করে দেন। ওঝা 'পইরী'কে রোগীর রোগের কারণ এবং নিরাময়ের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। পইরী 'নাকি-সুরে' সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন।

আখেরা দেখা-আখেরা চালি ঃ

জল কষা, তেল কষা, ঝাড়ফুঁক করেও রোগীর অবস্থান কোনোরূপ উন্নতি না হলে ওঝা গণনা করে রোগীকে সুস্থ করার শেষ চেষ্টা হিসাবে আখেরা দেখার নির্দেশ দেন। এই পদ্ধতিটিতে ওঝা মন্ত্র বলে রোগ সৃষ্টিকারী যতগুলি ভূতপ্রেত দেব-দেবতা আছে সবাইকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করে, রোগী বাঁচবে কিনা। তারপর আখেরা চালি করার বিধান দেন। এই সময় ওঝা একটি বিশেষ সুরে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। আখেরা চালি করেও যদি দেখা যায় রোগী আর বাঁচবে না, তখন কোন ওঝাই আর চিকিৎসা করেন না। অবশেষে রোগী ধীরে ধীরে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

মাশান ভূত ঃ

মাশান ভূত সবচেয়ে পরাক্রমশালী ভূত। এ ভূতের জন্ম সম্পর্কে একটি কাহিনী রয়েছে। একবার মাকালী একাকী নদীতে স্নান করতে গেলে ধর্মদেবতা সেখানে হাজির হন। তাদের মিলনে 'মাশান' এর জন্ম হয়। মাশান ঘোড়ায় চড়ে নির্জন মাঠ ঘাট, বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। সুযোগ বুঝে কারো শরীরে প্রবেশ করে।

আক্রান্ত ব্যক্তি পোড়া মাটি, কাঠকয়লা, কাঁচা মাছ-মাংস খায়। জ্বর হয়, ঘনঘন পায়খানা করে, রান্না কিছু খায় না। রোগী ক্রমশ দুর্বল হয়ে মারা যায়।

মাশান ভূত-আক্রান্ত রোগীকে বাঁচাতে হলে ওঝা ডাকতে হয়। ওঝা এসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে টুলে বসায়। ডানে হাতে সর্ষে নিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মন্ত্রপড়া সর্ষে ছোঁয়ান। এতে কাজ না হলে মাশান অপদেবতার পূজা দেওয়া হয়। শোলা দিয়ে মাশান তৈরি করে ঘোড়ার পিঠে বসান হয়। পোড়ামাটি, ভাজা খাবার, ধূপ-দীপ প্রভৃতি পূজার উপকরণ। ওঝা মন্ত্র পড়েন —

"বার চাষ দিলেক গোঁসাই
তের চাষ মুই কোন্ন।
বেছিয়া চাষ করলেক ভুঁই।
গোঁসাই বলে - নারদ শোন মোর কাথা
এক দন সইষ্যা দে জমিতে ফেলাইয়া।
গোঁসাই -এর কাথায় নারদ সইষ্যা ফেলাইল
কাটিয়া মারিয়া সইষ্যা গুণিয়া দিল
সইষ্যা নিয়া হাতত গুণিয়া
পূবের দোষদুষি আনিলেক ধরিয়া
এককেনা সইষ্যা দিল দক্ষিণক নাগিয়া
দক্ষিণের দোষদুষি আনিলেক ধরিয়া"।

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৬৩ দ্রষ্টব্য)

পোড়া ঘা ঃ

রাজবংশী সমাজে নানা রকম অসুখবিসুখে মন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। শরীরের কোথাও পোড়া ঘা হলে সেই ঘা শুকাবার জন্য জল পড়ে দেবার রীতি রয়েছে। এই পড়া জল ঘায়ে কয়েকদিন দিলে ঘা শুকিয়ে যায়। জল পড়া মন্ত্রটি নিম্নরূপ —

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন দেবতা একত্তর
ব্রহ্মা বলে বিষ্ণু আমি নেই জানি
অমুকের অঙ্গের পোড়া ঘা
জলপড়াতে ফুঁয়ে হোল পানি।[৮৯]

দেবার্চনা ও গৃহস্থালী মন্ত্রের মতো পৌষ্টিক ও আভিসারিক বাংলা মন্ত্রেও মোটামুটি একই ধারা অনুসৃত, তবে পার্থক্য এই যে পূজার্চনার মধ্যে যে বিভিন্ন সময়ের সংযোজনের প্রয়াস দেখা যায় পৌষ্টিক ও আভিসারিক মন্ত্রে তা হয় নি। গুরু মুখে শোনা এই সব গুহ্যমন্ত্র ব্যাপারে সংশোধন বা সংযোজন খুব একটা হয় নি, হয়তো বা শিষ্যেরা সাহস করেননি। নতুন মন্ত্র হয়তো হয়েছে, কিন্তু পুরনো মন্ত্রগুলোর গায়ে আচঁড় পড়েনি মনে হয়। পৌষ্টিক মন্ত্রগুলিকে স্থূলভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটা আরোগ্যমূলক, আর একটা প্রতিষেধ বা প্রতিরোধমূলক।[৯০] বনজঙ্গল ঘেরা নদীমাতৃক উত্তরবাংলায় পথে বেরুলে বিভিন্ন জীবজন্তু ও শ্বাপদ প্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হলে তারজন্য যেমন মন্ত্র আছে আর আক্রান্ত যাতে না হতে হয় তারজন্যও মন্ত্র আছে। রোগ নিরাময়ের জন্য মন্ত্রের সঙ্গে বিভিন্ন ভেষজ এর প্রয়োগ আছে তা যথাস্থানে আলোচিত হবে। এতদঞ্চলে ও লোকসমাজে পৌষ্টিক মন্ত্রগুলির গুরুত্ব অনেক বেশি। গ্রামের গরীব নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষক পরিবার

গুলির চিকিৎসাশাস্ত্রের সুযোগ নেওয়া সম্ভব ছিল না। তা সে চিকিৎসা ব্যবস্থা যত উন্নতই থাক না কেন। ওঝা গুণীন, জলপড়া, তেলপড়া, ফুঁকা এ সবই ছিল বাঁচবার একমাত্র পথ। মন্ত্রগুলির কোন অর্থ নেই, এতে কিছু হতো কিনা তা নিয়েও তর্ক করার কিছু নেই, এটা একদা ছিল খুবই জীবন্ত, মানুষ বিশ্বাস করত, প্রয়োগ করত এটাই বড় কথা।[৯১] নিচে কয়েকটি মন্ত্রের নমুনা এইরকম —

পোকামাকড় দংশন মন্ত্র ঃ

"নেবু নেবু নেবু পানি
নেবুর মাথায় ঢাল্লাম পানি
হর বিষপুর মর বিষ মর
নেবু ভিতে নির্বিষ কর। "[৯২]

জলপড়া মন্ত্র ঃ

এই মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মবাণ মন্ত্রের ফল পাওয়া যায়। বাড়ির ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভয়-ভীতি পেলে এই জলপড়ামন্ত্র দিয়ে জলকষে খাওয়ালে ভয় পালায় বলে বিশ্বাস —

"জলমধ্যে পড়ে জল কুম্ভীর
পাতাল মধ্যে পড়ে পাতাল কুম্ভীর
উনুকুটি নাকলরা পড়ে বিষহরি
গ্রামদেবতা পড়ে স্বস্তি
আপাল ভিন পড়ে।
ছরেকের নাগ কার্ত্তিক গণেশ পড়ে।
নন্দী মহাকাল হাদা তারা পড়ি গেল।"[৯৩]

তেলপড়া মন্ত্র ঃ

রাজবংশী সমাজে 'তেলপড়ার' প্রচলন রয়েছে। শরীরে কোথাও মচকে গেলে এই মন্ত্রটি প্রয়োগ হয়ে থাকে। মন্ত্রটি হল —

"বারো হাত কাপড় তেরো হাত দষি
আয় ফন্যা তুই মুই একটে বসি
তুই ছাগল মুই বাঘ মোর সাথে
তোর কিসের রাগ ধাপ তাপ

মোর (*) গোরে থাক।" (* পুং যৌনাঙ্গ)

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৬৫ দ্রষ্টব্য)

গু করতি মন্ত্র ঃ

গু করতি মন্ত্রের ক্ষমতা অসীম। এই মন্ত্রের দ্বারা বসন্ত রোগ, একশিরা, নাগানি, কালাজ্বর এবং নানা অমঙ্গল বিনাশ হয় বলে বিশ্বাস। এই মন্ত্র সাথে থাকলে (লেখ্যরূপ) কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি রোগব্যাধি অমঙ্গল হয় না বলে বিশ্বাস।

"অথ গু করতি লিখিতং ওঁ ওঁ ওঁ
ধনন্তরী নামে সহায় গু-করতি লিখিতং
শূন্য হৈল মূল ডাল হৈল আকাশ
সুজিল পৃথিবী রূপ পুত্র প্রকাশ।
বীর্য হৈয়া পাতালে বসিল জনরূপ অনাদি
যে অহিলা স্বরূপ আকাশে বাউ হৈল
কৃষ্ণ রূপ ধরি শিবের যা জল এই ত্রিশ্বর।"[৯৪]

ফাল লাগা মন্ত্র ঃ

লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করার সময় কৃষকের অসর্তকতার জন্য অনেকসময় লাঙ্গলের ফালে গরুর পা কেটে যায়। কৃষক তখন মন্ত্র জপ করে পা দিয়ে ঝাড়ে। এই সময় পরনের কাছা খুলে এক নিঃশ্বাসে হালের চার দিকে তিনবার ঘুরে। গরুর পায়ের ঘা এই মন্ত্রের দ্বারা চট্‌পট শুকিয়ে যায় বলে বিশ্বাস —

"ধনন্তীর বরে বনরীয়া নামাও মৈ
ফাল লাগা বিষ
হর বিটং হর পদ্মার হুংকারে বিষ
নামিয়া পর।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৭০ দ্রষ্টব্য)

পেটফুলে গেলে বা স্বপ্নে খেলে ঃ

"নুন নুন নুনিয়া সাগরে জন্মিলেক নুন
ওই নুন আনিলুং কিনিয়া
মাও দিলেক তুল দিয়া নাপিয়া
রাম লক্ষ্মণ দুইভাই দিলেক পুরিয়া

ঘাড়ে বসিল ঘরে বসিল
বত্রিশ লোমে লোমে বসিল।
এই পদ বড় ধায় মোর প্যাট ফোলা
দ্যাও দেবতা ভস্ম কর।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৬৪ দ্রষ্টব্য)

এই সমস্ত জাদু বিশ্বাস ছাড়াও রাজবংশী লোকসমাজের চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগাদি দূরীকরণে পূজা-পার্বণের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যায়। এই সম্পর্কে W. W. Hunter বলেছেন —The greater majority of them are also ojhas who proffess to cure disease by exorcism... .[৯৫] পরবর্তীকালে ড. চারুচন্দ্র সান্যালও একথা স্বীকার করে বলেছেন — "Rajbansis of North Bengal believe that disease are due to evil spirits and hence exocism is the method adopted to drive out the spirits for the cure of the diseases."[৯৬]

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী জনসমাজের মানুষ বিভিন্ন রোগের জন্য নানারকম দেবতা বা অপদেবতার পূজা বা ব্রতপালন করে থাকে। তা নিম্নের তালিকাতে প্রকাশ করা হল।

রোগের নাম	দেবতা/অপদেবতা
◆ শিশুদের সর্দিকাশি	বুড়াঠাকুর
◆ শিশুদের জটিলব্যাধি	ধুমঠাকুর
◆ শিশুরা রাত্রে ঘুমাতে পারে না, অনবরত কাঁদে, সর্বদা ক্ষুধা অথচ কিছু খেতে পারে না	নিশাঠাকুর
◆ সন্তান প্রসব হওয়ার পর বা কিছুদিন পরই সন্তানের মৃত্যু ঘটে	জিগা গাছের সাথে সই পাতানো
◆ যে কোন প্রকার জ্বর	জ্বরা দেবী/তুলসি ঠাকুরাণী
◆ শিশু বিচিত্রবর্ণের মলমূত্র ত্যাগ করে মায়ের দুধ পান করতে চায় না	পেত্তানি পূজা
◆ গর্ভবতী মা এবং গর্ভস্থ শিশুকে সুস্থ রাখা বা বিনাকষ্টে প্রসব করানো। অথবা গর্ভবতী সময়ে কষ্ট বোধ করা, অতিরিক্ত বমি করা, সম্বিৎ হারিয়ে ফেলা	বিষুয়া মাশান

রোগের নাম	দেবতা/অপদেবতা
◆ রোগীর সর্বাঙ্গে ব্যথা	বিষুয়া মাশান
◆ ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু	নাঙ্গা মাশান
◆ রোগীর অতিরিক্ত বমি	ওবুয়া মাশান
◆ আমাশা, দুর্বলতা, খাদ্যের অরুচি ঘুমন্ত অবস্থায় প্রলাপ বকা, কু-স্বপ্ন দর্শন	মাশান
◆ খোসপাচড়া প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগ	বিষুয়ায় দিন তিতা শাকসবজি খাওয়া
◆ বজ্রাহত	বিষুয়া পূজার দিন কান্দিরজল খাওয়া
◆ সর্পদর্শন	বিষহরি
◆ কলেরা (ওলাউঠা)	গারামঠাকুর/কালীঠাকুরাণী/মদনকাম
◆ বসন্ত	তিস্তাবুড়ি
◆ মুখ, ঠোঁট, চোখ বিকৃতি, হাত পা বেঁকে যাওয়া	গোহিলী/গঙ্গা সাগর
◆ ব্যক্তির জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে মৃত্যু বা দীর্ঘদিন রোগভোগ	ক্ষেতিলক্ষ্মী
◆ চক্ষু রক্ত বর্ণ হওয়া, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, খেতে চায় না, পরিবার পরিজনকে চিনতে পারে না, মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে হাসে এবং কাঁদে।	চন ও মগর

এছাড়াও যে কোন প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের জন্য লোকচিকিৎসকেরা যে বিভিন্ন দেবতার পূজার বিধান দিয়ে থাকেন। তা হল ভাণ্ডানী, যখা-যখিনী, সন্ন্যাসীঠাকুর ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে বঙ্গদেশের সর্বত্র বসন্ত রোগের দেবী হিসেবে শীতলা পূজিত হলেও রাজবংশী সমাজে প্রাচীন কালে শীতলা দেবীর প্রচলন ছিল না।

এতদঞ্চলের লোকচিকিৎসার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল তন্ত্র সাধনার প্রভাব। কালিকা পুরাণে মানস থেকে করতোয়া পর্যন্ত অঞ্চলকে রত্নপীঠ বলা হয়েছে। কলিকালে তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের উপর পড়া নিতান্ত অসম্ভব নাও হতে পারে।[৯৭] এডোয়ার্ড গেইট তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব প্রসঙ্গে কামরূপের কথাই উল্লেখ করেছেন।[৯৮] রাজবংশী সমাজের লোকচিকিৎসায় লোকচিকিৎসকগণ যে সকল মন্ত্র ব্যবহার করেন তাতেও তান্ত্রিক প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বসন্তরোগের প্রতিষেধক হিসাবে যে দেশীয় টিকা

দেবার প্রচলন ছিল তাও ছিল তন্ত্রশাস্ত্র সম্মত। নিদানও তন্ত্রশাস্ত্র সম্মত। নিদান ও তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী নারী ও পুরুষের জন্য বিশেষ দেশীয় টিকা দেওয়ার বিশেষ একটা নীতি চালু ছিল।[৯৯] আবার খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ বলেছেন — "দেশীয় টিকা' দেওয়ার প্রথা বিদ্যমান ছিল এবং টিকা দেওয়ার পর জ্বর এবং গায়ে দুই একটি অথবা ততোধিক বসন্তের গুটি উদ্‌গত হইত। স্থানীয় বৈদ্যরা বসন্তের চিকিৎসায় এবং শুশ্রুষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং এই প্রকার চিকিৎসা এই পর্যন্ত প্রচলিত আছে।"[১০০] এই দেশীয় টিকা দেওয়ার আগে একটুকরো শুকনো কাপড় দিয়ে টিকা কর্মীরা টিকার স্থান আটদশ মিনিট ধরে ভাল ভাবে ঘষতো। তারপর ছোট একখানি ছড়ি দিয়ে সেখানে কয়েকবার আস্ত করে চিরে দিত। পরে কোমর থেকে একখানি কাপড় দিয়ে জড়ানো দুই পাল্লা শণের থলি থেকে বসন্ত রোগের জীবাণু মিশ্রিত একটুকরো তুলো বের করে তাতে দুই ফোঁটা গঙ্গা জল সামান্য ভিজিয়ে দিয়ে লাগিয়ে দিত। এছাড়া 'পইরী নামানো' ও 'আখেরা চালির' মধ্যেও তন্ত্রসাধনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

রাজবংশী লোকসমাজে শুধুমাত্র তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবচ, পূজা-পার্বণ দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করা হত একথা বলা ঠিক হবে না। এই সবের বাইরেও যে উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা ব্যবস্থাটি প্রচলিত ছিল, তা হল ভেষজ ঔষধের প্রয়োগ। বহুবিধ ভেষজ আছে যেগুলি লোকচিকিৎসকগণ বিভিন্ন রোগের লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবহার করতেন। W. W. Hunter তাঁর A statistical Account of Bengal -X গ্রন্থে সেই সকল ভেষজ উদ্ভিদের কিছু উল্লেখ করেছেন। "লোকঔষধে প্রাকৃতিক উপাদান নির্ভরতা অনেক বেশি। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও অনেকখানিই প্রাকৃতিক উপাদান নির্ভর। লোকসমাজ সু-সংস্কৃত মানব সমাজের তুলনায় অনেক বেশি প্রকৃতি নির্ভর, অনেক বেশি প্রকৃতির মুখাপেক্ষী। তাই লোকসমাজ ব্যবহৃত ঔষধেও সেই প্রকৃতির নির্ভরতার প্রতিফলন।"[১০১] রাজবংশী সমাজে এখনও অনেক লোকচিকিৎসক আছেন যাঁদের বাড়িতেই এইরূপ প্রচুর ভেষজ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাঁরা বংশপরম্পরায় এইসব উদ্ভিদের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। নিম্নে একটি তালিকার সাহায্যে তিস্তা ও তোর্ষা পারের রাজবংশী সমাজের লোকচিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত ভেষজ উদ্ভিদ এবং নির্দিষ্ট রোগে তার ব্যবহার উল্লেখ করা হল।

ভেষজ উদ্ভিদ	**ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ**	**রোগের নাম**
তুলসী পাতা	মধুর সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো	সর্দি বুকে বসে গেলে
কালোজিরা	সর্ষের তেলের সাথে মিশিয়ে গরম করে মালিশ	ঐ

ভেষজ উদ্ভিদ	ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ	রোগের নাম
মুট বা মোট (উদ্ভিদ) গুলাই (উদ্ভিদ), কমলা লেবুর চোচা, যষ্ঠিমধু	চোচের মুড়ি (এক ধরনের পোকার বাসা, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে পাওয়া যায়) একসাথে জলে সেদ্ধ করে ছেকে বোতলে রেখে দিতে হয়। সকালে বিকালে পরিমাণ মত খাওয়ানো হয়।	সর্দি এবং সাথে কাশি থাকলে (বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য)
টাউরি কালাই, বন সজনার ছাল	হাঁসের ডিমের সাথে ভেজে খাওয়ানো হয়।	জণ্ডিস রোগ
আতপ চাল, দূর্বা ঘাসের শেকড়	এক সাথে বেটে খাওয়ানো হয়।	শিশুদের পায়খানা বন্ধ করার জন্য।
বাত বারুনের পাতা এবং ডাপে ঢুপির পাতা	এক সাথে সেদ্ধ করে স্নান করানো হয়।	বাত রোগের জন্য।
মালভোগ কলা	তার মধ্যে ভাম বিড়ালের শুকনো মাংস ঢুকিয়ে অজান্তে খাওয়ানো হয়।	ঐ
চেপটি কালাই এবং নীলটস্ উদ্ভিদের পাতা	সেদ্ধ করে স্নান করানো হয়।	গুটিব্যারাম (বসন্ত)
লাল আমরুলের রস	খাওয়ানো হয়	আমাশা রোগের জন্য
আইসটানীর পাতা (পাতায় মাছের গন্ধ যুক্ত)	তরকারী রান্না করে খাওয়ানো হয়	ঐ

ভেষজ উদ্ভিদ	ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ	রোগের নাম
সিজ (ফনি মনসার পাতা)	লবণ ঢুকিয়ে পোড়ানো হয়। তারপর সেই লবণ বেড় করে খাওয়ানো হয়	ড্রপসি (শোথ রোগ)
কাঁচা কলা	কাঁচা কলা ছোট ছোট করে কেটে চুন ও মধু মিশিয়ে কপালে মালিশ করতে হয়	মাথা ব্যথা
ধুলপি (দণ্ডকলস) পাতার রস	নাক দিয়ে টানতে হবে	অর্ধেক মাথা ব্যথা হলে
কেন্নো ঘাসের আলু রস, আদার রস	লবণ মিশিয়ে সামান্য গরম করে রোগীকে খাওয়ানো হয়।	পেট ব্যথা
কুন্তলতা/বিন্দিসর	রস করে উত্তর স্রোতের নদীর জলের সাথে মিশিয়ে মন্ত্র পড়ে খাওয়ানো হয়।	হরিস (নাক দিয়ে রক্ত পড়া)
উলট কম্বলের শিকড়	রাত্রে চিনির সাথে মেখে রেখে দিতে হবে এবং সকাল বেলায় খেতে হয়।	মেহ (যৌন রোগ)
তামাকের গুড়া	চিনির সাথে মিশিয়ে ঠোঁটে খৈইনীর মত দিয়ে রাখতে হবে।	হাঁপানী (পয়াখান)
বাঁশ পাতা	পুড়িয়ে ছাই জলে ভিজিয়ে পর দিন সকালে চিনির সাথে মিশিয়ে খালি পেটে খেতে হবে।	ডাব্বা (কৃমি)

ভেষজ উদ্ভিদ	ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ	রোগের নাম
লজ্জাবতীর শিকড়	সুতোর সাহায্যে হাতে বা কোমড়ে বেঁধে রাখতে হবে।	ভান্তি জ্বরা (ভাল্লুকের মত কেঁপে কেঁপে জ্বর আসে)
কেশরী ঘাস এবং ভোমরা চিতার শিকড়	সর্ষের তেল ভেজে সেই তেল নির্দিষ্ট স্থানে লাগাতে হবে।	নালী ঘা/ক্ষত।
নস্ সিং এর পাতা	গরম পাথরে পাতা জড়িয়ে সেক দিতে হবে।	ব্যথা পেলে।
শুকাতি পাতা (শুকনো পাট পাতা)	জলে ভিজিয়ে পরদিন সকালে খালি পেটে খাওয়ানো হয়।	জ্বর ও কৃমিনাশ
বিষ ঢেঁকিয়ার পাতা মাকলা বাঁশের পাতা নিমপাতা	একসঙ্গে সেদ্ধ করে সেই জল স্নান করানো হয়	বাত, জ্বরা (গায়ে ব্যথা সাথে জ্বর) সেরে গেলে।
পিপ্লি, গুড়, আদার রস	পিপ্লি ভেজান জল সেদ্ধ করে গুড়, আদার রস মিশিয়ে ছেকে বোতলে রেখে দিতে হবে, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় দু-চামচ করে খাওয়ানো হয়	মায়ের প্রসবের চার দিন পর থেকে।
উশনি শাক, আদা, রসুন, পিঁয়াজ, পিপলির শেকড়, পেঁপে	একসাথে তরকারী রান্না করে ভাতের সাথে খেতে হয়	মায়ের প্রসবের পর
পাকা কলা	নাক দিয়ে টানতে হয়	নাক দিয়ে রক্ত পড়লে

ভেষজ উদ্ভিদ	ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ	রোগের নাম
মুড়ি	মুড়ি জলে ভিজিয়ে তার মধ্যে সামান্য ধুপ এবং লবণ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়	ডাইরিয়া
গনভাদই (গন্ধ ভাদালী), ভূরভূরি পাতা, শুকনো আদা, গোল মরিচ	একসাথে বেঁটে খাওয়ানো হয়	পেট ব্যথা
আনারস পাতার রস	খাওয়ানো হয়	কৃমি (ডাব্বা)
কাঁচা আলু অথবা হেলেঞ্চা পাতা বা হেম কাঁচা পাতা	বেটে নির্দিষ্ট স্থানে লাগাতে হয়	পোড়া ঘা

ভেষজ উদ্ভিদ ঃ হলুদ

ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ ঃ মশলা হিসেবে রান্নায় ব্যবহৃত হয় কিংবা খালি পেটে কাঁচা হলুদের ব্যবহার।

রোগের নাম ঃ

খোসপাঁচড়া, জ্বর, চর্মরোগ, ব্রঙ্কাইটিস, ডায়েরিয়া, আমাশয়, মূত্রাশয় জনিত রোগ, গুটিবসন্ত, ফোঁড়া, ইত্যাদি রোগ। এছাড়া হলুদ হৃদরোগ, ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করে, রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিন নামক হরমোনের উৎপাদন বাড়ায়, কৃমিনাশ করে, ক্ষতিগ্রস্থ লিভারকে সুস্থ করে।

উপরিউক্ত ভেষজগুলি রাজবংশী লোকায়ত সমাজের চিকিৎসকেরা যে বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রয়োগ করছেন তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। লোকঔষধ ব্যবহারের মূলে দুটি কারণকে দাবি করেছেন লোকসংস্কৃতি গবেষক বরুণকুমার চক্রবর্তী। তাঁর মতে, প্রথম কারণ লোকঔষধের ওপর নির্ভরতার মূলে বিশেষ ভাবে দায়ী অসচ্ছলতা। যে লোকসমাজ চরম অসচ্ছলতায় মধ্যে বাস করে, যাদের দু'বেলা দুমুঠো আহার্য্যের সংস্থান হয় না, পরনে কাপড় জোটে না, তাদের পক্ষে ডাক্তার বদ্যির সাহায্য গ্রহণ কিংবা অর্থের বিনিময়ে আধুনিক চিকিৎসা

বিজ্ঞানের দান ঔষধ সংগ্রহ সম্ভব হয় না। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন দীর্ঘকালীন সময়ব্যাপী লোকঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস ও বিশ্বাস।[১০২] লোকঔষধ ব্যবহারের পিছনে কেবল অসচ্ছলতা বা অভ্যাস দায়ী নয়; এর পিছনে রয়েছে গভীর বাস্তব জ্ঞান তথা জীবনাভিজ্ঞতার প্রাজ্ঞতা। ওঝা বা চিকিৎসকেরা কেউ আনাড়ি নন, হাতুড়ে বলে যাঁদের বুঝি এঁরা তাও নন। প্রত্যেকটি ঔষধ ব্যবহারের পিছনে রয়েছে যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি। অবশ্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি একেবারে উড়িয়ে দেন নি। হঠাৎ করে কেটে গেলে, রক্তপাত কিংবা ক্ষতস্থানের সৃষ্টি, মচকে গেলে, ভেঙ্গে গেলে, শরীরের কোন অংশ অকস্মাৎ পুড়ে গেলে তার মোকাবিলা করার মত প্রয়োজনীয় ঔষধপাতি সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে না মেলার সম্ভাবনাই বেশি। সকলের বাড়িতে সবসময় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, ঔষুধ ও উপকরণাদি থাকে না। এক্ষেত্রে লোকঔষধের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও সহজলভ্য।

এছাড়াও বিশেষ কতকগুলি রোগের কারণ ও তার চিকিৎসায় কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন কলেরা রোগের কারণ হিসেবে এতদঞ্চলে রাজবংশী মানুষের ধারণা এই রোগের অপদেবতা, আলোকরশ্মি গুচ্ছের মতো দেখতে এবং তিনি কুয়োর জলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অপদেবতার নাম 'উকা'। গ্রামে কলেরা দেখা দিলে সকলে বলত 'উকা আইছে'। সকলে বাড়িতে রাত জেগে কাঁসর, ঘন্টা, টিন বাজাতেন এবং মাঝে মাঝে কুয়ো পর্যবেক্ষণ করে দেখা হত 'উকা' দেখা যায় কিনা। কলেরায় আক্রান্ত রোগীর গামছার আঁচলে রসুনের কোয়া বেঁধে রাখা হত। কোন ব্যক্তি যদি কোন বাড়িতে কলেরা রোগী দেখতে যেতেন তাহলেও তার আঁচলে রসুনের কোয়া বেঁধে যেতে হত। রোগী দেখে ফিরবার সময় কাউকে না বলে আসতে হবে এবং সেই সময় পেছন দিকে তাকানো চলবে না। বিশ্বাস, পেছন তাকালে রোগ তার পেছন পেছন নিজের বাড়িতে এসে উপস্থিত হবে। বসন্ত রোগের চিকিৎসায় রোগীকে বিষ ঢেকিয়া পাতা, মাকলা বাঁশের পাতা এবং নিমপাতা সেদ্ধ জল দিয়ে তিন রাস্তার মোড়ে স্নান করানো হয়। এক্ষেত্রেও স্নানের পর রোগীর পেছন ফিরে তাকানো নিষেধ। এই রকম অনেক রোগের কারণ এবং লোকচিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত বিধি নিষেধগুলির প্রায় সবটাই কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

———

ঙ) বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি

যাত্রাপূজা ঃ

যাত্রাপূজা তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের রাজবংশী সমাজের এক বিশেষ লোকাচার। প্রচলিত বিশ্বাস যাত্রা কথাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে শুভ-অশুভ বোধ। শারদীয়া দুর্গোৎসবের বিজয়া দশমীর পুণ্য তিথিতে যাত্রা পূজা করা হয়। বাঙালী বারমাসে তের পার্বণে অভ্যস্থ। শুভ-অশুভ বিচার প্রশ্নে দিন-তারিখ তিথি-নক্ষত্র উল্লেখিত পঞ্জিকা মতে বিশ্বাসী হলেও তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে রাজবংশী সমাজের নির্দিষ্ট দিনে যাত্রাপূজার পেছনে সঙ্গত কারণও রয়েছে, কেননা, হল কর্ষণের সূচনা পর্বে বিজয়া দশমীর দিনটিকে শুভ দিন হিসেবে করা হয়। চিহ্নিত তাই এই পর্বে যাত্রা পূজা কৃষিজীবী সমাজ যাত্রা পূজার আয়োজন করে থাকে। যাইহোক, যাত্রা পূজাকে আবার জায়গা ভেদে 'হালযাত্রা' বলা হয়।[১০৩] আমাদের ধারণা হল কর্ষণ কৃষির সঙ্গে যুক্ত বলে যাত্রাপূজাকে 'হালযাত্রা' নামে চালানো হয়।

যাত্রার পূজার প্রস্তুতি পর্বে আগের দিনই পূজার বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। দশমীর দিন বাড়ির সব ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এক প্রকার দুধ সাদা মাটি জলে গুলে নিকোনো হয়। তুলসী তলায়, কলাপাতা বিছিয়ে দা, কুড়ুল, হাতুড়ি, শাবল, খুরপি, বাইশ প্রভৃতি যা কৃষকের নিত্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তা রাখা হয়। এছাড়া ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার বই-খাতা, শ্লেট ইত্যাদি রাখা হয়। বাড়ির বাইরে লাঙ্গল জোয়াল ধোয়া মোছা করে শুকোতে দেওয়া হয়। এক জোড়া বলদকেও স্নান করানো হয়। এরপর খড়িমাটি (সাদা রং), গিরিমাটি (গেরুয়া রং) পৃথক পৃথক পাত্রে জলে গুলে তা দিয়ে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও নিত্য ব্যবহৃত জিনিসপত্রে ফোঁটা দেওয়া হয়। এমনকি বাইরে রাখা লাঙ্গল জোয়ালেও ফোঁটা দেওয়া হয়। এরপর শোলার তৈরি ফুল তুলসীতলা, শোবার ঘরের দরজায় ভাড়ার ঘরে, হালের লাঙ্গলের উপর বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় মূল পূজার কাজ, কলা গাছের খোল কেটে বিশেষ পাত্র তৈয়ারি করা হয়। পূজার সময় জোড়ায় জোড়ায় খোল ভর্তি চিড়া, দই, কলা, নারকোল (কুড়োনো) চিনি বা গুড় দিয়ে উদ্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। বাস্তুঘরে নারায়ণ পূজা, তুলসিতলায় আতপচাল, দুধ, কলা, চিনি উপাচারে শিবপূজা হয়ে থাকে। এরপরই হালযাত্রা অনুষ্ঠানের শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব। কলাগাছের খোল কেটে নির্মিত মণ্ড চালুনির উপর বসিয়ে তার ভিতর পঞ্চ প্রদীপ, সিঁদুর, দুটো রূপোর টাকা রাখা হয়। এরপর বসতবাটির নিকটবর্তী তামাকচাষের জমিতে হালজুড়ে আড়াইপাক চাষ করে ধরিত্রীর মাতার প্রতি ভক্তি সহকারে চিড়া, কলা, দই, চিনি ভর্তি একজোড়া খোল পূজার অর্ঘ্য স্বরূপ নিবেদন করা হয়। এ ভাবেই তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের রাজবংশী সমাজ বিজয়া দশমীর দিনে যাত্রাপূজার মধ্য দিয়ে প্রতিবছর কৃষিকাজের শুভযাত্রা পালন করে থাকেন।

রাজবংশী কৃষক সমাজের জীবনযাত্রা প্রকৃতির খেয়ালীপনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 'শস্য উৎপাদনের জন্য এখনও কৃষকদের আকাশপানে চেয়ে ''আল্লা মেঘ দে পানি দে'' বলতে হয়।[১০৪] স্বভাবতই কৃষিকর্মে এতদঞ্চলের কৃষকদের জীবিকা নির্বাহে একমাত্র সম্বল দৈব বিশ্বাস আর এই বিশ্বাস বলেই প্রতিবছর যাত্রাপূজার আয়োজন করে থাকে তিস্তা ও তোর্ষাপারের লোকসমাজ।

যাত্রাপূজা সম্পর্কে ড. গিরিজাশঙ্কর রায় বলেন — ''উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে দুর্গার প্রধান পরিচয় দেবীঠাকুর হিসেবে এবং শারদীয়া দুর্গোৎসবের নাম হইতেছে যাত্রাপূজা বা দেবীপূজা। শারদীয়া নবমী, কোথাও কোথাও দশমীর দিনটিকে যাত্রা বলা হইয়া থাকে। যাত্রাপূজা নামের প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই দিনটিতে রাজবংশী ক্ষত্রিয় কৃষকগণ হৈমন্তিক ফসল উৎপাদনের জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ আরম্ভ করিয়া দেন। আউশ ও পাটের চাইতে কৃষকদের পক্ষে আমন ধানের গুরুত্বই বেশি। এই গুরুত্বপূর্ণ ফসলের জমি প্রস্তুত করিবার জন্য হালচালনার যাত্রা আরম্ভ হয় জন্য কৃত্যটিকে যাত্রাপূজা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে যাত্রাপূজা একটি কৃষিকৃত্য বিশেষ বলিয়া ধরিতে হয়।''[১০৫]

তিস্তা ও তোর্ষাপারে রাজবংশী সমাজে শারদ উৎসবের আবহে যাত্রাপূজার আয়োজন। সূচনা করে হেমন্তকালীন পর্বের কৃষিকাজ। যাত্রা বলতে চাষের জমিতে লাঙ্গল চালনার সূচনা। কৃষি সভ্যতার আধার থেকে গড়ে ওঠা এই সংস্কৃতি আজও অমলিন। তবে পূজোয় দেবী প্রতিমার প্রচলন নেই। কাস্তে, মই বা লাঙ্গলের মতো কৃষিজ সামগ্রী এখানে দেবতা। এই সমস্ত সামগ্রীর গায়ে সিঁদুরের তিলক এঁকে কৃষি বন্দনায় মেতে উঠে রাজবংশী সমাজ। ফলে সহজেই অনুমেয় যে যাত্রা পূজায় মধ্য দিয়ে কৃষিজীবন তথা কৃষি সংস্কৃতির পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।

ভাণ্ডাণী পূজা ও মেলা ঃ

ভাণ্ডাণী পূজা সম্পর্কে একাধিক গল্প প্রচলিত রয়েছে। তারমধ্যে একটি হল, হিমালয় কন্যা উমা চারদিন বাপের বাড়ি থেকে কৈলাশে যাত্রাপথে গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেন। সেই এলাকার এক বর্ধিষ্ণু রাজবংশী (মতান্তরে জমিদার) জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। উমা তার পরিচয় দেন মেচেনি হিসেবে। পরদিন লোকটি মেচেনি রূপ উমার পূজা দেন। উমা তুষ্ট হয়ে এলাকার মানুষের ভাণ্ডার শস্যে ভরে দিয়ে যান। তারপর থেকেই ভাণ্ডাণী দেবীর পূজা প্রচলিত হয়।

যাত্রাপূজার শেষে দশমীর পরদিন থেকে শুরু হয় ভাণ্ডাণী পূজা। ভাণ্ডাণী মূলতঃ রক্তিম বর্ণের দ্বিভুজা অথবা কোথাও কোথাও চতুর্ভুজা এবং ব্যাঘ্রবাহিনী। তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে ভাণ্ডাণী দেবীর পূজা অতি প্রাচীনকাল থেকেই রাজবংশী সমাজে প্রচলিত থাকলেও অঞ্চলভেদে এই দেবী ভাণ্ডাণী, ভাণ্ডারণী, ভাণ্ডারী, ভাণ্ডালী নামে পরিচিতা। ভাণ্ডাণী দেবীর

আবির্ভাব ও পূজা মাহাত্ম্য প্রচার সম্পর্কে যে সমস্ত জনশ্রুতি নির্ভর গল্প কাহিনি আছে তার মধ্যে একটি এই রকম — প্রাচীনকালে এতদঞ্চলে নহুস নামে এক ধর্মপ্রাণ রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাবৎসল রাজার অন্যতম। তিনি কখনো কখনো গভীর অরণ্যে মৃগয়া যাত্রায় বের হতেন। কোন এক বৎসরের শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে রাজা নহুস মৃগয়া যাত্রা করেন। কিন্তু গভীর অরণ্যে শিকারের আনন্দে বিস্মৃত হয়ে যান রাজ প্রাসাদের দুর্গা পূজার কথা রাজার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোকলস্কর পাঠানো হয়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও অনুসন্ধানকারীদল রাজার সন্ধান না পেয়ে ফিরে আসে রাজপ্রাসাদে। অথচ নক্ষত্রের নিয়মে প্রচলিত রাজবাড়ির দুর্গা পূজা সম্পন্ন হয় এবং দশমীর রাতেই যথারীতি প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। কিন্তু রাজা নহুস যে মা দুর্গার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেননি তাই দেবী ব্যাঘ্রবাহিনী চতুর্ভুজা রূপে আবির্ভূতা হলেন গভীর অরণ্যে অবস্থানরত রাজা নহুসের সম্মুখে। সেদিন একাদশী তিথি, ধর্মপ্রাণ রাজা অরণ্যের ফলমূল সংগ্রহ করে তিনদিন ধরে মা দুর্গার চরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করলেন। দেবী দুর্গতিঅতি প্রসন্না হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিতা হলেন।[১০৬] রাজা নহুসের এই দেবীই পরবর্তীকালে রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিকট ভাণ্ডাণী দেবী বলে পরিচিত।

অপর একটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে কুচবিহার রাজবাড়িতে দেবী দুর্গা তিনদিন যথারীতি পূজা গ্রহণের পর বিজয়া দশমীর দিন কৈলাশে যাত্রা করেন। কিন্তু দীর্ঘপথ অতিক্রম কালে দেবীর মালপত্র তত্ত্বাবধায়ককারিণী ভাণ্ডাণীর অসুস্থতার জন্য নিজ তরফ গ্রামে (মেখলিগঞ্জ মহকুমা) দেবী দুর্গাকে অবস্থান করতে হয়। দেবীর এই অবস্থানের কথা স্বপ্নাদেশে গ্রামবাসীরা পরিজ্ঞাত হলে পুনরায় একাদশী থেকে তিনদিন ধরে দেবী দুর্গার পূজার আরাধনা করে। মনে করা হয় ভাণ্ডাণীর কারণে এই পূজা বলে দেবীর দুর্গার লৌকিক নাম হয় ভাণ্ডাণী দেবী।[১০৭]

ভাণ্ডাণী পূজার প্রধান পুরোহিত দেউসি বা অধিকারী। এই অধিকারীই মন্ত্রোচ্চারণ করে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা, আবাহন, বিসর্জন ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করেন। অধিকারীই দশমীর দিন থেকে উপবাস থেকে একাদশীতে পূজার যাবতীয় উপকরণ যথা - দুধ, দই, আতপচাল, গুড়, বাতাসা, চিনি, কলা, বাতাবি লেবু, নারিকেল প্রভৃতি ফলমূল বিল্বপত্র, দূর্বাঘাস, আম্রপল্লব, ফুল মণ্ডপে সাজিয়ে নেন। তারপর দেবীর ধ্যান মন্ত্র পাঠ করে পূজায় বসেন। বিভিন্ন মন্ত্রের মধ্যে একটি উল্লেখ করা গেল —

"আইসো মা মোর ভগবতী নথে করিয়া ভর
জয় শব্দ দিয়া মাগো বইসো শিরিঘটের উপর
ঘটে আসন ঘটে বসন, ঘটে মা তোমারে আসন
সিংহাসনে মা ভাণ্ডাণী তোমারই বসন।
হস্তে করি আছে দেবী খান্তা খাড়া লইয়া

উর্দ্ধমুখে আছে দেবী হেঁট মুখ হইয়া
পাদভরি পূজা পানি দিছু মা উদার করিয়া।''[১০৮]

একদিকে প্রাচুর্য, অন্যদিকে অভাবের যন্ত্রণা, বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরালয়ে ফিরে যাওয়ার পথে তাই শহরের কোন সরাইখানা নয়। দেবী দূর্গার পছন্দ গ্রামের চাষী পরিবারের পণকুটির। সেখানেই তিনি বিশ্রাম নেবেন। তিস্তা থেকে তোর্ষা বিস্তীর্ণ এলাকার রাজবংশী সমাজের প্রচলিত লোকগাঁথা এমনটাই। এই বিশ্রামের সময় দেবী ভাণ্ডাণী রূপে পূজা গ্রহণ করেন। গবেষকদের মতে, রাজবংশী সমাজে দেবী দুর্গার আদলে প্রচলিত ভাণ্ডাণী দেবী আদতে কৃষির প্রতীক। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী দীপককুমার রায় এমনটাই মনে করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন ''ভাণ্ডাণী নামটি এসেছে ভাণ্ডার থেকে। তিনি গ্রামের শস্য ভাণ্ডার রক্ষার দেবী। পরবর্তীকালে ভাণ্ডাণী দুর্গার ভিন্নরূপ হিসেবে পরিচিতি পায়।[১০৯] অনেকে মনে করেন দেবী দুর্গার সঙ্গে ভাণ্ডাণীর সম্পর্ক নেই। কেননা ভাণ্ডাণী শব্দটি এসেছে ভাণ্ডী শব্দ থেকে। যার অর্থ ভাল্লুক। মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত রাজবংশীরা আদিতে জঙ্গল ঘেরা শ্বাপদ সংকুল পরিবেশে বসবাস করতেন। প্রকৃতির উপরে অসহায়তা থেকেই ভাণ্ডাণী দেবীর পূজা প্রচলন হয়েছে। সবটা মিলিয়ে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে একদিকে প্রকৃতির অসহায়তা অন্যদিকে অভাবের যন্ত্রণা এ দুয়ের মধ্যে দেবী ভাণ্ডাণী বরাভয় মূর্তি নিয়ে শস্য দিয়ে ভাণ্ডার ভরিয়ে দেবেন এটাই ভক্তের আকুতি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে শস্যের দেবী কৃষির দেবী, বলতে আমাদের আপত্তি থাকে না।

ভাণ্ডাণী পূজাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মেলা জমে উঠে তার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করব - ময়নাগুড়ি রোড সংলগ্ন ভাণ্ডাণী মেলা। ময়নাগুড়ি রোড থেকে মেলার মাঠ পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার পথ জনজোয়ারে পরিণত হয়। এই পূজা তিন'শ বছরেরও অধিক প্রাচীন। সকাল থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত পাঁঠা ও পায়রা বলি হয়। মেটেলিতে ভাণ্ডাণী মেলা একাদশীর দিন ভোরবেলা থেকে শুরু হয়, চলে রাত পর্যন্ত। শালকুমারের হাটে ভাণ্ডাণী মেলাও শতবর্ষ প্রাচীন। ভাণ্ডাণী পূজাকে কেন্দ্র করে ফালাকাটা পাঁচমাইল -এ এই মেলা বসে বিকাল বেলা। ধূপগুড়ির অদূরে কালীরহাটে দেবীকে ঘিরে বিশাল মেলা বসে। মেখলিগঞ্জের দাঙ্গারহাট ও জামালদহে সারারাত ধরে পূজা চলে, মণ্ডপের সামনে বিশাল মেলা বসে। মাথাভাঙ্গার ক্ষেতিগ্রামে ভাণ্ডাণী পূজাকে কেন্দ্র করে হাইস্কুল মাঠে বিশাল মেলা বসে। এই মেলায় প্রায় পনের হাজার লোকের সমাগম ঘটে। আলিপুরদুয়ারের ভোলারডাবরী গ্রামে ভাণ্ডাণী মেলা বসে। এ মেলাটিও শতবর্ষ প্রাচীন।

বুড়াবুড়ি ঃ

বুড়াবুড়ি অনুষ্ঠানটি ধানকাটা হয়ে গেলে গোলাজাত করবার আগে করা হয়। ধানকাটার পর উঠানে মাড়া দেওয়া হয়। মাড়া অর্থাৎ কয়েকটি গরু দিয়ে ধান গাছ থেকে ধানগুলিকে বের করা হয়। তারপর ধানগাছ অর্থাৎ খড়গুলিকে সরিয়ে ধানগুলিকে ঝাড়াই বাছাই করে স্তূপীকৃত করে এই অনুষ্ঠানটি করা হয়। দুইজন ছেলে বুড়া আর বুড়ি সাজে এবং হাতে কাঠা বা দন নিয়ে স্তূপীকৃত ধানের চারপাশে তিনবার প্রদক্ষিণ করে। এটি আসলে আদিম কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচারের আধারে আদিম সংস্কৃতির পরম্পরা । বুড়া-বুড়ি পূজা প্রকারান্তরে এতদঞ্চলের কৃষি পূজা বা ভূমি পূজা মাত্র।[১১০] এখন প্রশ্ন হল এই বুড়াবুড়ি কে? কেনই বা এর পূজা করা হয়। আমাদের ধারণা এখানে বুড়া বলতে শিবঠাকুরকেই বোঝায় আর বুড়ি বলতে অবশ্যই পার্বতী। বুড়ি মোটিফটি উক্ত লৌকিক ব্রতে বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল। একটু তলিয়ে বিচার করলেই পাওয়া যাবে যে এতদঞ্চলে শিবঠাকুরের কি ব্যাপক প্রভাব ও বিস্তার। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শৈব ধাম মন্দির থেকে যা সহজেই অনুমান হয়। জল্পেশ্বর, জটিলেশ্বর, সর্বেশ্বর, নীলেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, বাণেশ্বর, এছাড়া মহাকাল, যখাঠাকুর, বুড়াঠাকুর প্রভৃতি নামেও শিব গ্রামঠাকুর হিসেবে পূজিত। মধ্য যুগে মঙ্গ লকাব্য গুলিতে আমরা শিবকে কোচ বা কৃষির দেবতা হিসাবে দেখি। এবিষয়ে ড. গিরিজাশঙ্কর রায়ের মন্তব্য — "শৈব প্রতীকগুলি বিশ্লেষণ করিলেও শিবকে অবশ্যই কৃষিদেবতা হিসাবে ধরিতে হয়। শিবের বাহন বৃষভ। শব্দটির ধাতুগত অর্থ বর্ষণ। বর্ষণ ও বৃষের সহিত কৃষির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বৃষ আবার প্রজননেরও প্রতীক। এই প্রজনন সন্তানোৎপাদন ও শস্যোৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে। শিবের অন্যতম ভূষণ সাপ। এই সাপও প্রজননের কাজেই কৃষির প্রতীক। শিবের অন্যতম প্রতীক লিঙ্গ। কলিযুগে শিবমূর্তি পূজা অপেক্ষা শিবের লিঙ্গ পূজাই অধিকতর প্রশস্ত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। লিঙ্গকে কেবলমাত্র যৌনায়নের রূপ ভাবিলে চলে না। ভূমির উর্বরতা আনয়নের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠতর যোগ থাকিতে পারে। কেননা 'লাঙ্গল' ও 'লিঙ্গ' দুইটিই অষ্ট্রিক শব্দ এবং দুই -এর মূল এক। আদিমযুগে লিঙ্গের মতো একধরনের পাথরের অস্ত্রে মাটি খোঁড়া ও কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত হত। অনেকে শস্য বৃদ্ধির আশায় ক্ষেত্রে লিঙ্গ পুঁতে দিত।"[১১১] কাজেই আমাদের ধারণা এই বুড়া পূজার মূলে বুড়া শিব রূপে এবং বুড়িকে পার্বতী রূপে কল্পনা করে কৃষিজীবী সমাজ সংসার জীবনে কৃষি দেবতা রূপে পূজা করবে এটাই স্বাভাবিক। ভালো ফসল উৎপাদন স্বরূপ কৃষিদেবতা শিব ও তার ঘরণী পার্বতীকে এখানে অন্তরের কৃতজ্ঞতা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

ব্যাঙের বিয়াও ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে এবার যে অনুষ্ঠানটি নিয়ে আলোচনা হবে তার নাম

শুনলে এই বিজ্ঞান দীপ্ত সমাজে যে কারও মনে কৌতূহল হওয়াটাই স্বাভাবিক, তা হল 'ব্যাঙের বিয়াও' বা ব্যাঙের বিবাহ। 'ব্যাঙের বিয়াও' অনুষ্ঠান ধর্মীয় ভাবনা, বিশ্বাস ও সংস্কার মতে অনুষ্ঠিত হয়।

অনাবৃষ্টি জনিত খরা দূর করে বৃষ্টি কামনায় যেমন 'হুদুমদেও' পূজো করা হয়, 'ব্যাঙের বিয়ার' ক্ষেত্রেও রাজবংশী জনসমাজে অনুরূপ ভাবনা ক্রিয়াশীল। মূলতঃ দেশে দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে বৃষ্টির আশায় ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয়। তবে এই অনুষ্ঠানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে, এতদঞ্চলের লোকায়ত সমাজ বিশ্বাস করে অনুষ্ঠান শেষে শীঘ্রই পৃথিবীর বুকে বাদলের ধারা নেমে আসবে। 'ব্যাঙের বিয়াও' অনুষ্ঠানে সামাজিক রীতিনীতিকেই ধর্মীয় নীতি অপেক্ষা বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সামাজিক রীতি মেনে একটি পুরুষ ব্যাঙ ও একটি স্ত্রী ব্যাঙ নির্বাচন করে নির্দিষ্ট দিনে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ে অনুষ্ঠানের পূর্বেই বরপক্ষ ও কনেপক্ষ কারা হবে তা স্থির করা হয়। তবে দু'পক্ষের লোকজন একই গ্রামের হতে পারে আবার ভিন্ন গ্রামেরও হতে পারে। বরপক্ষ পুরুষ ব্যাঙটিকে কাপড় পড়িয়ে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে, ঢাকঢোল সানাই বাজিয়ে নিয়ে যায় কনে ব্যাঙের বাড়িতে। অপরদিকে, কনেপক্ষ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে কখন বরপক্ষ বর নিয়ে আসবে। বরযাত্রী অবশ্যই মানুষ এবং বিয়ের শেষে মাংস, ভাত, দই, মিষ্টি দিয়ে বরযাত্রীদের আপ্যায়ন করা হয়। এই ভাবে 'ব্যাঙের বিয়াও' অনুষ্ঠান শেষ হলে ব্যাঙ দুটিকে পুকুর কিংবা নদীর জলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ড. গিরিজাশঙ্কর রায় এইরূপ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলেছেন — "...কৃষিকর্মে প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা কাটাইবার উদ্দেশ্য কৃষকের অসহায় আদিম মানসিকতা স্বাভাবিক ভাবে জাদু নিয়ন্ত্রিত কৃত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। রাজবংশীদিগের কৃষিকেন্দ্রিক অধিকাংশ পূজা উৎসবগুলির মধ্যে জাদুবিশ্বাসের তীব্রতা লক্ষ্য করিতে পারিব।"[১১২]

কাজেই, একথা বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে তিস্তা ও তোর্ষাপারের লোকায়ত সমাজে 'ব্যাঙের বিয়াও' অনুষ্ঠানটি ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবনার অন্তরালে কৃষিকর্মের মঙ্গল কামনার অনুষ্ঠান তথা কৃষিব্রতমূলক জাদু অনুষ্ঠান।

গোচরপোনা / গচিবুনা ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে গোচরপোনা অনুষ্ঠান যা কৃষিসংস্কৃতি বলে উল্লেখ করা যায়। কেননা, জমিতে চারা লাগাতে গেলে প্রথমে গচিবুনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়। ধানের চারা লাগানো পূর্ব, কিংবা তামাকের 'পুলি' লাগানোর পূর্বে গচিবুনা পর্ব সম্পন্ন হয়। একটি কালো কচুর গাছ ও একটি দেশি পাট গাছ প্রথমে একত্রে কাদায় রুইয়ে নিয়ে কালোকচু ও দেশি

পাটের পাশে পাঁচটি গুচি রোয়ানো হয়। অন্যদিকে তামাকের গচিবুনায় কালো কচু ও দেশী পাটের পরিবর্তে লাগে ডাটিসহ একটি মানার পাতা, কলার পাতার ডাটা ৮/৯ ইঞ্চি পরিমিত চারখণ্ড ও দশ/বারো ইঞ্চির এক খণ্ড মোট পাঁচ খণ্ডের বড়োটি মাঝে রেখে একটি হাতল বানিয়ে নিয়ে এতে কাজল সংগৃহীত করা হয়। এই কাজল সংগ্রহ হয় কালো হাতল ও মানকচুর ডাটি পুড়িয়ে। পাশে থাকে সলতে প্রদীপ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিরা প্রত্যেকে কাজল ফোটা দেবে কপালে। এরই পাশে পাঁচটি তামাকপুলি রোপিত হয়। এই লোকাচারের বিশ্বাসটি এরকম - কালোকচুর ডাটা দূষিত রক্ত পরিষ্কার করণে ঔষধির কাজ করে। পাট শাক রাজসাক্ষি। এই শাক বেঁচে থাকলে খায় আবার মরলেও শ্মশান বন্ধুরা ঘর ফেরৎ হয়ে এর শুকাতি পুড়িয়ে হাত সেঁকে নেয়। গোচরপোনার রাতে কোন স্থানে রাতে কুচিয়া মাছ খাবার রেওয়াজ আছে।[১১৩] আবার তিস্তা ও তোর্ষা পারের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন, বেরুবাড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে ধান রোপণের আগে একটি শুভদিন দেখে প্রথম যে জমি ধান রোপণের জন্য তৈরি হবে তার এক কোণে একটি বেদীর মতো বানিয়ে তাতে একটি পাট গাছ ও কচু গাছ লাগিয়ে তার সামনে কয়েকটি ধানের চারা লাগানো হয়। এবং অবশ্যই তেল, সিঁদুর ও ফুল, জলসহ পূজা দিয়ে। পুরো ঘটনাটির সাক্ষী রাখা হয় একটি কাঁকড়াকে। যাইহোক, গচিবুনা পূজা উপলক্ষে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা হয় তা তাৎপর্যপূর্ণ এবং নিচে তা আলোচনা করা হল —

বিশেষ কয়েকটি কারণের জন্য গচিবুনায় কলা গাছ, কচু ও দূর্বা ঘাস, পাট গাছ, কাঁকড়া, সিঁদুর ও কাজলের দাগ ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণতঃ কলা গাছ কল্পতরু হিসেবে কল্পিত হয়ে থাকে। গচিবুনা অনুষ্ঠানে কলা গাছকে জমিতে রোপণ করবার মধ্যে সংবৎসরের শস্য প্রাপ্তির কামনা নিহিত আছে। কলাগাছ বহুফল দাত্রী। একটি ধানগাছের গুচ্ছেও বহুফল ধরে। অধিক ফলন কামনা কলাগাছ ব্যবহার বিষয়টিতে সংগুপ্ত থাকা অসম্ভব নয়। কলাগাছ অতি দ্রুত বংশ বিস্তার করতে পারে বলে কৃষিকেন্দ্রিক পরিবেশে এর ব্যবহার হওয়া স্বাভাবিক। কলাগাছের মতো কচু ও দূর্বাঘাসও অতিদ্রুত রূপে বংশবিস্তার করতে পারে। লৌকিক বিশ্বাস এরা অমর। প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও ধান গাছ যাতে অমরতা লাভ করে এবং উৎপাদনের আধিক্য থাকে তারজন্যে কচু ও দূর্বা ঘাসের ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। অন্যদিকে, পাটগাছ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লম্বা হয়। এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে যাতে ধানগাছ পুষ্ট ও বর্ধিত হয় এই জাতীয় একটি বিশ্বাস পাট গাছ ব্যবহারের মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়। আবার অনুষ্ঠানে কাঁকড়ার পা-গুলি ভেঙে দিয়ে জমিতে ফেলে দেওয়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্ভবতঃ কাঁকড়াকে ভীতি প্রদর্শন। কেননা, কাঁকড়া ধান ক্ষেতের ক্ষতি করে। ধানক্ষেতের জল আটকানোর জন্য যে ছোট ছোট আল থাকে তার মধ্যে যে খাল করে বাস করে। ফলে ক্ষেতের জল বর্ষার পরেই শুকিয়ে যায়। যাতে জমিতে কাঁকড়ার উপদ্রব বন্ধ হয় সেজন্য এই প্রথাটি প্রচলিত হতে পারে। অপরদিকে কাজল ও সিঁদুরের

প্রত্যেকটির ৫টি বা ৭টি করে ফোঁটা দেওয়া হয়। পাঁচ ও সাত সংখ্যা দুটি রাজবংশী সমাজে খুবই শুভ বলে বিশ্বাস। বলা হয় 'সাত, পাঁচ কুশল বাত।' উপরন্তু সিঁদুরের সঙ্গে সন্তান তথা শস্য উৎপাদনের সুনিবিড় সম্পর্ক। তামাকে গচিবুনা অনুষ্ঠানে মানকচুর পাতা ও পান গুয়ার পিক ফেলার তাৎপর্যের মধ্যে কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। তামাকের পাতাগুলি যেন মানকচুর পাতার ন্যায় বড় আকারের হয় এবং তামাকের রঙ যেন গুয়াপানের পিকের মতো রক্তবর্ণ হয়ে উঠে।[১১৪]

আমাতি ঃ

অম্বুবাচীর অনুষ্ঠানকেই রাজবংশীরা আমাতি বলে থাকেন। এর রেশ সাধারণতঃ তিনদিন স্থায়ী হয়। সাধারণ কৃষক পরিবারের ছেলে-মেয়েরা হাটে যাওয়ার রাস্তায় কলা গাছ দিয়ে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে হাট ফেরৎ (হাটুয়া) মানুষদের থেকে আদায় করে নটকো, খেজুর, জাম ইত্যাদি ফল। আমাতির তিনদিনই এই লোকায়ত সমাজ রাত্রিবেলায় কচু পাতায় বাড়ির সকলে কাঁচা দই আবশ্যিক ভাবে সেবন করে। এতে নাকি সারাবছরে সর্পদংশনের আশঙ্কা থাকে না। এতদঞ্চলে এই তিনদিন কৃষকেরা হলকর্ষণ বন্ধ রাখে। পার্বণটি শস্যোৎপাদন ও সন্তানোৎপাদন বিশ্বাসের সঙ্গে যে জড়িত তা অনুমান করা যায়। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন — "ভারতবর্ষের সর্বত্রই বর্ষাঋতুতে বিধবা নারীদের ভিতর অম্বুবাচী নামে এক পার্বণ পালনের রীতি প্রচলিত। এই পার্বণের তিনদিন বা সাতদিন তাঁহারা অগ্নিপক্ক খাদ্য গ্রহণ করেন না, মাটি খুঁড়েন না, আগুন জ্বালেন না, রন্ধনাদি করেন না, এমন কিছু করেন না যাহাতে পৃথিবীর মাতা বসুধার অঙ্গে কোন আঘাত লাগে। কারণ প্রচলিত বিশ্বাস এই যে এই কয়দিন মাতা বসুধার ঋতুপর্ব এবং যতদিন তিনি ঋতুমতী থাকেন ততদিন তাঁহার অঙ্গে আঘাত লাগে, এমন কিছু করিতে নাই। এই বিশ্বাস এবং অম্বুবাচীর পার্বণ এই দুই-ই আদিম কৌম সমাজের প্রজনন শক্তি পূজা এবং তৎসম্পৃক্ত ধ্যান-ধারণা"।[১১৫] আমাতি পূজার সঙ্গে সাপেরও সম্পর্ক আছে। সাপ প্রজননের প্রতীক। ড. গিরিজাশঙ্কর রায় এ বিষয়ে বলেছেন — "আমাতি পূজার সঙ্গে সাপের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখা যাইতেছে। ইহার মূলে দুইটি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বেশি হয়। কাজেই গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীদের পক্ষে সর্পভয় নিবারণের জন্য ব্যাপকভাবে এই পূজা দেওয়া স্বাভাবিক হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ... অম্বুবাচী প্রজননী শক্তির পূজা, সাপও প্রজননের একটি বিশিষ্ট প্রতীক।[১১৬] ফলে যে Fertility Cult আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় তা এতদঞ্চলের বিভিন্ন পূজাপার্বণ অনুষ্ঠান আমাদের যুক্তির পক্ষে জোর সওয়াল করে বলেই ধারণা হয়।

সুবচনী ব্রত ঃ

সুবচনী পূজা সূর্য ওঠার আগে করা হয়। পূজা দু'ভাবে করা হয়। ঘটপূজা এবং মূর্তিপূজা। সাধারণতঃ বাড়ির উঠোন পরিষ্কার করে যেখানে পূজা হবে তার চারকোণে চারটি কলাগাছ লাগিয়ে প্রত্যেক কলাগাছের গোড়ায় একটি করে ঘট স্থাপন করতে হয়। প্রতিটি ঘট লাল শালু কাপড় দিয়ে ঢাকা দিতে হয়। এবং একটি করে আমের পল্লব দিতে হয়। কেউ মূর্তি পূজা করতে চাইলে মূর্তিটি পশ্চিমমুখে স্থাপন করে এমনভাবে রাখতে হবে যেন কলার পাতার শীষ মূর্তির দিকে থাকে। কিছু ধান ছিটিয়ে ঘট স্থাপন করতে হয়। ঘট জলভর্তি থাকে। তাতে দুটো গুয়া ও পান দিতে হয়। মূর্তি ও কলার নিমচ পাতের মাঝেএকটি কাটারি অর্দ্ধেক পুঁতে রাখতে হয়। নিমচ পাতে সিঁদুর দিতে হয়। ঘটের সামনে নেউচের উপরে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে কলার থাতি, আলোচাল, গুয়া পান, সিঁদুর, তেল, তামাক ইত্যাদি দেওয়া হয়। সাধ্যমত ফুল ফল দিয়ে পূজা করা হয়। পূজা সাধারণতঃ মেয়েরাই করে থাকে। কোন কোন জায়গায় বলির ব্যবস্থা থাকে। মানত মত পাঁঠা, কবুতর (পায়রা) বলি দেয়। মূর্তিমান পূজা হলে ব্রাহ্মণ এবং ঘটপূজা হলে মাড়েয়া পূজা করে। পূজা উপলক্ষে গীদালিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। নিমন্ত্রিত সকলের মুখেই শুনতে পাওয়া যায় —

"সুবচনীর বাড়ি যামো
পান, গুয়া, ত্যাল, সেন্দুর সগায় পামো।
সুবচনী মায় মোর
বড় দয়াময়
সুবচনী পূজলে পরে
হারা জিনিস পায়।" (সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ৩১০ দ্রষ্টব্য)

এই ব্রতকথার গান-গায়িকারাই দল বেঁধে বাড়ি-বাড়ি গেয়ে থাকে। গিদালী অর্থাৎ গায়িকারাই পূজার আয়োজন জোগাড়যন্তর সমস্তই করে দেয়। আয়োজন শেষ হলে দুজন অকুমারী অর্থাৎ অবিবাহিত মেয়ে সর্বপ্রথম মা-সুবচনীকে বরণ করে নেয়। এখানে বলে নেওয়া দরকার যে সুবচনী পূজার সঙ্গে ধর্ম্ম ঠাকুর ও শনিঠাকুর পূজা ঐ একই প্রকার উপাচারে অবশ্য করণীয় কর্তব্য। পূজা শুরু হওয়ার সাথে সাথে গিদালী (মূল গায়েন) সুর করে ব্রতকথা শুরু করে দেয়। শ্রোতারা হু হু করে জানানি দেয় যে তারা শুনছে। এই ধরনের ব্রতকথাকে 'হুকাতি ককাতি' বলে। যদি গানের আয়োজন থাকে তাহলে মূল গীদালী সুর করে ব্রতকথা গেয়ে যায়, সঙ্গে সহকারী দোহার সঙ্গীতে সহযোগিতা করে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে শুধু ঢাক ও কাঁসি। এই ঢাকের তালে কখনও কখনও দাঁড়িয়ে কখনও বা নৃত্য করে ব্রতকথা গেয়ে চলে।

পূজা শেষে গৃহিনী এলোচুলে একখানা থালা নিয়ে, নিমচ পাতের উপর থেকে ঘট নামিয়ে

অতি সাবধানে নিমচ পাতটি থালার উপরে টেনে নিয়ে ঘটটি পুনরায় নিমচপাতের উপরে রেখে কাটারিটি থালার পাশে নিয়ে নেবে। এরপর থালাটি বাস্তুঘরে রাখবে। ঘট নিয়ে যাওয়ার সময় একটি থালায় জল নিয়ে ঘরের চালে জল ছিটিয়ে দেবে। এরপর উপস্থিত এয়োতিদের মাথায় পূজার তেল, সিঁদুর, গুয়া, পান ইত্যাদি দিয়ে মঙ্গল কামনা করবে। ছেলে-মেয়েদের মাথায় তেল ও হাতে প্রসাদ বিতরণ করে পর্ব শেষ হয়। এই ব্রতকথা সূর্য উদয়ের পূর্বেই আরম্ভ হয় আর শেষ হয় বেলা আটটা ন'টার মধ্যে।

এখানে বলা আবশ্যক যে এই সুবচনী পূজা করলে নারদ পূজাও একই সাথে করা হয়। সুবচনীর ডানপাশে নিমচ পাতের উপর ধান, দূর্বা, তেল, গুয়া, পান ইত্যাদি নারদের নামে রাখা হয়। পূজা শেষ হলে একটি ছেলে পান-গুয়া নিয়ে বাড়ি থেকে অনেকদূরে পালিয়ে গিয়ে একাই খাবে। বাড়ির কেউই ঐ পান গুয়া খাবে না।

এই সমাজের মানুষ মনে করেন যে ঐ পান-গুয়া খেলে তার নারদের মতো স্বভাব হবে। সবশেষে যে গানগুলি করে পূজা সমাপন করা হয়, সেই গানগুলির অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হল।

১) ''দ্যাশে দ্যাশে সুবচনীর মহিমা প্রচার হইল।
সুবচনী দ্যাশে যায় কাটারি মারেয়া চায়।।

২) ''বেচুয়া (পাখি) করে ঝিলিমিলি কুকিলা করে রাও
শ্যাত কাউয়ার বচনে রজনী পোয়াও পোয়াও
স্বর্গের সুবচনী স্বর্গে চলি যায়
ঐ থাকি মাও সুবচনীর পূজা ঘরে ঘরে হয়।''

৩) ''মা এই দুক্কে মরণ না হয় ক্যানে
সুবচনী দ্যাকো যায় কলা পসাধ মাড়েয়া চায়।
দেমোনা দেমোনা দ্যাশে গেইলে পামো না।
এই দুক্কে মরণ না হয় ক্যানে।''

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ৩১১ দ্রষ্টব্য)

সমাজ ব্যবস্থার আদিতে ছিল মাতৃতান্ত্রিক এবং সভ্যতা ছিল কৃষি নির্ভর। ফলতঃ কৃষি ভিত্তিক এই সভ্যতায় কৃষিকর্মের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখার জন্য ভয় কিংবা ভক্তি থেকেই এইসব পূজা এবং ব্রতের প্রচলন। আর নারীরাই এর হোতা। কেননা সমাজে ও সংসারে সৃষ্টির উৎস তারাই। এবং সংসারের মঙ্গল কামনার দায়িত্ব তাদের উপর। উপরোক্ত 'ব্রত' কথাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীরা যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করে সংসারের মঙ্গলের জন্যই এই ব্রত উদ্‌যাপন করে। যাতে সৃষ্টির প্রবাহ চিরকালীন বহতা পায়।

বাঁশ পূজা ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা বলতে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলাকে বোঝায়। এতদঞ্চলে বোড়ো, রাভা, গারো, কোচ, রাজবংশী ও অভিবাসী মুসলমান সমাজের বাস। ফলে এতদঞ্চলে সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে অনায়াসে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, বৈষ্ণব ও শিব প্রভৃতি দেবদেবী যেমন পূজিত হয়, তেমনি বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীরও পূজা হয়ে থাকে। তবে আদিম অধিবাসী রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শক্তিরূপী বাঁশ পূজা মূলতঃ শক্তি ও লোকায়ত পূজার সমন্বিত রূপ। এই পূজা মূলতঃ শস্যের উৎপাদন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য করা হয়। মদন উৎসব সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায় যে অভিমত পোষণ করেন তা হল - "আদিতে হোলী ছিল কৃষি সমাজের পূজা। সুশস্য উৎপাদন কামনায় নরবলি ও যৌন লীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার প্রধান অঙ্গ তাহার পরের স্তরে কোন সময় নরবলির স্থান লইল পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ ইহার অঙ্গীভূত হইল। কিন্তু হোলীর সঙ্গে প্রধানত যে উৎসব অনুষ্ঠানের যোগ তাহা বসন্ত বা মদন বা কামোৎসবের। ... তৃতীয় চতুর্থ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতের সর্বত্রই বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব নামে একটি উৎসবের প্রচলন দেখা যায়। ... ষোড়শ শতকের পর কোন সময়ে চৈত্রীয় বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব ফাল্গুনী হোলী বা হোলক উৎসবের নামের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়।"[১১৭] উল্লেখ্য, যে মদনকামের গানের সঙ্গে যে পূজা জড়িত তা হল বাঁশ পূজা। বাঁশ পুরুষাঙ্গের প্রতীক। বাঁশ পূজার মাধ্যমে উর্বরতা ও সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরাধনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিকরূপ বাদ দিয়ে ব্যবহারিক দিক বিচারেও বাঁশের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সমীচীন। প্রাচীন কামরূপের বর্তমান উত্তরবঙ্গ ও আসামে বাঁশ অত্যন্ত মূল্যবন বস্তু। গ্রাম প্রধান এই অঞ্চলে ঘরবাড়ি তৈরি, কৃষিকাজ, মাছধরা প্রভৃতি অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবিকার প্রায় সবকিছুতেই প্রয়োজন বাঁশের। এই অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ জন্মে।[১১৮] বাঁশের এইরূপ গুরুত্বের কারণে অর্থকরী সম্পত হিসেবেও মূল্যবান। সম্ভবত এই কারণে এখানে বাঁশ পূজার প্রচলন। সুতরাং তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের বাঁশ পূজা যে প্রাচীন কামোৎসবেরই আধুনিক রূপ তা বোধ হয় বলাটা অত্যুক্তি হবে না।

মদনকাম দেবের বাঁশ পূজা যে ভাবে করা হয় শক্তিরূপী বাঁশ পূজা সে ভাবে করা হয় না। এ পূজায় সাধারণতঃ ৫/৭ অথবা ৯/১১ টি বাঁশ থাকে। এই বাঁশ থানের এক একটি দেবদেবীর প্রতীকী রূপ হিসেবে ধরা হয়। শক্তিরূপী বাঁশ পূজার সঙ্গে ভগবতী, কাঁচা খাই, শিতলী, মহামায়া, আই-সাকাতি, জটিয়া, ডাকাইত, রাখালঠাকুর, মদনকাম, বুঢ়াঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়। আবার কোথাও কোথাও শক্তিরূপী বাঁশ পূজার সঙ্গে কালী, শিতলী, কাঁচাখাই, শিব, মহামায়া ও বাস্তুঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়। প্রতিটি দেবদেবীরই এখানে কোন মূর্তি নেই। শুধু মাটির থান দিয়ে পূজা দেওয়া হয়।

শক্তিরূপী বাঁশ কাটার নিয়ম আছে। প্রথমে দেওরী শুদ্ধ হয়ে থানের ভগবতী মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবে। পূজার কয়দিন এই প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। তিনটি জবাফুল প্রদীপে দিয়ে সকলে মিলে বাঁশের গোড়ায় প্রসাদ ও মন্ত্র পাঠ করে এক চোটে (ঘা) বাঁশ কাটতে হয়। তারপর ভাল করে ধুয়ে নিয়ে এক একটা করে নিশান বেঁধে দেওয়া হয়। ভগবতী দেবীর জন্য লাল নিশান অন্যান্য দেবদেবীর জন্য সাদা কাপড়ের নিশান বেঁধে দেওয়া হয়। ভগবতী দেবীর লাল নিশানে সাতটি চক্র থাকে। তথ্যদাতার মতে, এটি বিভিন্ন দেবদেবীর সমন্বিত রূপ।[১১৯]

বাঁশ পূজার কয়েকদিন আগে মাড়েয়ার বাড়িতে শক্তি (ত্রিশূল) গাড়া (পোঁতা) হয়। ত্রিশূল শিবের প্রতীক। প্রতিদিন এ স্থানে কীর্তন করা হয়। শক্তিরূপী বাঁশ পূজার দিন (মঙ্গল অথবা শনিবার) মা কালীর মূর্তিকে শক্তিগাড়া স্থানে নিয়ে আসতে হয়। এই ধ্বজাধারী বাঁশ বা নিশান নিয়ে ঢাক, ঝুড়ি, ঝনঝনি, ঘেংতাল বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি মাগন তোলা হয়। এই শোভা যাত্রার সময় দেওরী ঘটিতে শুদ্ধ জল নিয়ে আগে আগে যায় তার পিছে পিছে নিশান বাহকেরা যাবে। এদেরকে বলা হয় 'বাশুয়া'। তথ্য দাতার মতে, এটি করা হয় মূলতঃ গ্রামের বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্যের সঙ্গে শক্তিদেবীর স্বীকৃতির জন্য।

শক্তিরূপী মাকালী মূতিটিকে প্রথমে বাড়ির মাড়েয়া বরণ করে নেবে। বরণ করার জন্যে দুটি চাইলোন থাকে, একটি দুনি তাতে থাকবে মনুয়া কলার ঝুকি, গুয়া পান, কলার পটুয়ার কাজল, সাদাফুল ও লাল ফুল। দ্বিতীয় চাইলোনে থাকবে নিমচ পাত, তিল, হরিতকি, শালি ধান, দুটি চাকী, পান (পান পাতা দিয়ে বরণ করবে), ধানের শিষ, তিন বা পাঁচ রকমের ফুল। শক্তি দেবীর জন্য চারখানা ফুলের মালা, শিবের জন্য বেলপাতার মালা প্রয়োজন। বরণ করবার পর তথ্যদাতার মতে —

১) পঞ্চদ্রব্য (চিনি, গুড়, দই, দুধ, ঘি) কলার মোচার মধ্যে রাখা দ্রব্যগুলিকে উলটে মাটিতে ঢেলে দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। মনে করা হয় এই দ্রব্যগুলি দিয়ে বসুমতীকে শান্তির পরশ দেওয়া হয়।

২) বরণ করা চাইলোন ধানের গোলায় কিছুক্ষণ রাখা হয়। একটি দশংগতি থানে নিয়ে যাওয়া হয়, অন্যটি রেখে দেওয়া হয়। তথ্যদাতা বলেন — এই সময় শক্তিরূপী দেবীকে মালক্ষ্মী রূপে দেখা হয়।

৩) মাড়েয়া বরণ করার সময় মাটিতে ভোগ চাল দিয়ে তিনবার মায়ের মাথার উপর ছিটিয়ে দেয়। এই সময় দেবীর নামে হরিধ্বনি দেওয়া হয়।

৪) দেবীকে বরণ করার সময় (প্রতি বাড়ি বাড়ি) কীর্তনীয়ারা ঢাক, খোল, ঘেংতাল সহযোগে ভৈরবী সুরে গান করে।

"আইসো আইসো ওগো মা আইসো আমার ঘরে

এরূপ যৈবন দিব মা গোবিন্দের চরণে।
সোনা শোভে, রূপা শোভে মা আর শোভে বালা
কপালে তিলক শোভে মা গলে বনমালা।''

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৯৬ দ্রষ্টব্য)

গ্রামীণ থানে কালীদেবীর পেছনে শক্তি ত্রিশূল গাড়া হয়। প্রতীকী শক্তিরূপী বাঁশগুলি থানের বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে রেখে দেওয়া হয়। ভগবতী দেবীর পূজার আগে মহামায়া, আই সাকাতি, রাখাল ঠাকুর ইত্যাদি দেবদেবীর পূজার সময় দেওয়া হয় দই, চিড়া, কলা ইত্যাদি। কাচাখাইয়ের প্রসাদ দই, চিড়া, কলার সঙ্গে পায়রা বলি দেওয়া হয়। হটিয়া, বুঢ়া ঠাকুরকে দই, চিড়া, কলার সঙ্গে গাঞ্জা, কলকি, মদ দেওয়া হয়। ভগবতী দেবীর পূজায় পূজার সমস্ত উপকরণ থাকে। কোথাও পাঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। কোথাও উৎসর্গ করা হয়। পূজা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীর্তনীয়া ও ডাকুয়ারা ভৈরবী তালে নেচে নেচে গান করে। গানগুলিতে দেবীর প্রণাম, চক্ষুদান, প্রতিষ্ঠা, রূপ বর্ণনা, গুণবর্ণনা, প্রার্থনা, দেবীদর্শন, বিদায়ী বিষয় থাকে। সর্বশেষে দেওয়া হয় বলি। বেতের চারটি লাঠি থাকে। কেউ যদি ভর উঠে তাহলে সেই লাঠি দিয়ে নিজে পিঠে নিজে ডাং দেয়। ভরযুক্ত ব্যক্তিটি ব্যক্তি বিশেষ ও গ্রামের ভালমন্দ বলে দেন। এই সময় একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মতো তা হল ডাকুয়ারের ঢাকের বাজন। তথ্যদাতার মতে, এইসময় ঢাক বাজাতে হয় পাইএ্যা তালে, চলতি 'গুরু ড্যাং', আর এইসময় নাচের বাজনা গুরু 'ড্যাং অ্যাটেং ড্যাং', বরণের বাজনা দেওয়া হয় ড্যাং অ্যাটেং তিনবার দিয়ে ঘিরানি ড্যাং তালে। বলি দেবার সময় 'ড্যাং অ্যাটেং ডেড্যাং' তিনবার, ঘিরানি 'ড্যাং' শেষে 'ড্যাডেং অ্যাটেং ডেটেং' তিনবার। ভোজের বাজনা ক্রো ড্যাং অ্যাটেং ডেং তিনবার তারপর আস্তে আস্তে বেশি ডাং দিতে হবে। বিসর্জনের বাজনা - 'ড্যাং আটেং ডোকের' শব্দের আওয়াজ চাপা থাকবে। নামানি বাজনা হবে - 'ড্যাং ডেংনা অ্যাটেং' তিনবার।

পূজার শেষ পাশা ভাসানি - দেওরী, পাইটালি ও গ্রামের সবাই থানে সমবেত থাকে। এখানে একটি বিশেষ দিক হল কলা গাছের ঢোঙ্গল দিয়ে ভেলা বানানো হয়, যাকে ভেলুয়া বলে। ভেলায় থাকবে একঝুকি কাঁচাকলা। দেওরী বিভিন্ন দেবদেবীর অঙ্গভঙ্গী নেচে দেখায়। থানের শ্যামা কালীর নিশানযুক্ত শক্তিরূপী বাঁশ ঝাকা দিয়ে বলির বিধান দেওয়া হয়। পরে অন্য প্রতীকী বাঁশগুলিকে ঝাকি দেওয়া হয়। এখানেই শক্তিরূপী দেবী ও বাঁশের সমন্বয় ঘটে। এরপর ভরযুক্ত ব্যক্তি বাঁশের লাঠি নিয়ে সমস্ত থানের চারদিকে ঘুরে সকল দেবদেবীকে 'খেদিয়ে' (তাড়িয়ে) কলার ভেলায় ভরে নিয়ে দুয়ার বন্ধ করে দেয়। কাঁচাখাই দেবীর বাঁশটি প্রথমে নিয়ে বাকি বাঁশগুলিকে বেঁধে ভেলা ও বাঁশগুলিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

এই পূজার আলোচনায় আমরা বলতে পারি দেবী ভগবতী কালীর সঙ্গে লোকায়ত বিভিন্ন

দেবদেবীর সমন্বয়ের প্রতীকী রূপ বাঁশ। বাঁশ লোক দেবদেবীর প্রতীকী সত্তার সঙ্গে পুং যৌনাঙ্গেরও প্রতীকী দ্যোতক। বলা যায় উর্বরতাবোধক। ফার্টিলিটি কাল্ট এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে নির্ভরশীল। এতদঞ্চলের বিশ্বাস, শক্তিরূপী বাঁশ পূজা করলে উর্বরতাতন্ত্রের পাশাপাশি সকল মানুষের মঙ্গলময়তা ও রক্ষাকারীতাও সুনিশ্চিত করে।

বৃক্ষপূজা ঃ

তিস্তা ও তোর্ষাপারের মানুষের মধ্যে যে পরিবেশগত ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল তা বৃক্ষপূজা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। আজকের 'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান' এই শ্লোগানটি যেন এতদঞ্চলের বৃক্ষপূজারই সার্থক আধুনিক রূপ। যাইহোক, তিস্তা ও তোর্ষাপারে যে সমস্ত বৃক্ষপূজা হয়ে থাকে তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

শালশিরি ঃ

শালবাগানে কোন একটি বড়গাছের নীচে মাটি দিয়ে বেদী নির্মাণ করা হয়। এই বেদীটি প্রতি বছর লেপামোছা করে পূজা দেওয়ার রীতি। পূজার উপকরণ হিসেবে ফুল, ধূপ, ধুনা, কলা, আতপচাল, দুধ, দৈ, চিনি, বাতাসা, প্রদীপ, সিন্দুর, তেল ব্যবহার হয়। অন্যান্য পূজার মতো এই পূজাটিও অধিকারী দ্বারা সম্পন্ন হয়। সাধারণতঃ বৈশাখ মাসে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজাটিকে আমরা বৃক্ষপূজা হিসেবে দেখতে পারি।

অরণ্য প্রান্তিক কৃষক সমাজ কৃষিক্ষেতের কাছাকাছি বাড়ি তৈরি করে থাকে। কৃষিকর্মের পাশাপাশি জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ ও বিক্রয় করে তাদের কিছুটা অর্থোপার্জন হয়ে থাকে। তাই বনে ঢুকার মুখে শালশিরিকে ভক্তি করে গেলে বনের দেবতা খুশি হবে এবং কাঠ সংগ্রহ কালে কোন হিংস্র জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হতে হয় না এই বিশ্বাস থেকেই শালশিরি পূজার আয়োজন বলে ধারণা হয়। কেননা, শালশিরির সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয়।[১২০] কারণ এতদঞ্চলের শাল বাগানগুলিতে হিংস্র বাঘের আনাগোনা প্রায় নিত্যদিনের ব্যাপার ছিল। তাছাড়া বনের হিংস্র জন্তু যাতে মানুষ ও গৃহপালিত পশুর এবং জমির ফসলের ক্ষতির করতে না পারে তার জন্য এই পূজার আয়োজন বলে ধরে নিতে অসুবিধা হয় না। এবিষয়ে ড. গিরিজাশঙ্কর রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য — "একদা উত্তরবঙ্গের জঙ্গলগুলিতে পাগলাহাতি, বন্যমহিষ, বন্য শুকর ইত্যাদি জন্তুর ভয়ানক উপদ্রবের কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যাইত। এই সকল ধান্যক্ষেত্রেরও ক্ষতিসাধন করিত। সুতরাং মানুষ ও তাহার গৃহপালিত পশুর জীবন তথা শস্যাদি রক্ষার তাগিদেই উত্তরবাংলার রাজবংশীগণ শালশিরি পূজার প্রবর্তন করিতে পারেন।"[১২১] পাশাপাশি একথা বলা বোধহয় অসঙ্গতহবে না যে শালের মতো সুঠাম ও দীর্ঘ ধান, পাট, তামাক ইত্যাদি কৃষিজাত ফসল কামনার

জাদুবিশ্বাস থেকেই এতদঞ্চলের কৃষিজীবী সমাজ শালশিরি পূজার আয়োজন করে থাকে।

জুড়াবান্দা ঠাকুর বা ঢেলখাওয়া ঠাকুর ঃ

রাস্তার পাশে বট, অশ্বত্থ কিংবা শেওড়া বা ঐজাতীয় কোন গাছই জুড়াবান্দা ঠাকুরের থান। হাট, বাজার মেলায় যাওয়ার পথে কিংবা আত্মীয় বাড়ি যাবার সময় সাধারণ মানুষ কিংবা (কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত) স্কুল যাবার পথে ছাত্ররা খড়, শুষ্ক ঘাস, লতাপাতা কিংবা নুড়ি পাথর ইত্যাদি গাছের ডালে বেঁধে দেয় কিংবা ঐ গাছে ঢিল মেরে থাকে। এতেই নাকি জুড়াবান্দা ঠাকুর খুশি হয়। আর ঢিল ছুঁড়ে মারার জন্য জুরাবান্দা ঠাকুরের কোথাও কোথাও ঢেলাখাওয়া ঠাকুর হিসেবে প্রচলিত হয়েছে। ধূপগুড়ির নিকটে দমদমায় এরূপ ঢেলখাওয়া ঠাকুরের থান আজও দেখা যায়।

জুড়াবান্দা বা ঢেলখাওয়া ঠাকুরকে আমরা পথ পূজা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কেননা, এতদঞ্চলের লোকবিশ্বাস পথে চলতে যাতে কোন আপদ বিপদ না ঘটে তার জন্য জুড়াবান্দা ঠাকুরকে প্রসন্ন রাখতে হয়। জুড়াবান্দা ঠাকুর অখুশি হলে পথে মারাত্মক বিপদ ঘটতে পারে। রাস্তায় ভূত-প্রেত ইত্যাদি আধিভৌতিক অপদেবতার হাত থেকে সুস্থ মতো বাড়ি ফিরে আসাটা নির্ভর করে জুড়াবান্দা ঠাকুরের সন্তুষ্টির উপর। এ সম্বন্ধে ড. গিরিজাশঙ্কর রায় বলেছেন — "যাত্রাপথে যাহাতে তাঁহার (মানুষের) কোন বিপদবিঘ্ন না আসে তাই এক বিশেষ দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি যাত্রাপথ সুগম করিবার কল্পনা করেন। রাস্তায় ভূত, প্রেত, অপদেবতা, বন্যজন্তু যাহাতে আক্রমণ না করে তাহার বিশ্বাসও ইহার মধ্যে গুপ্ত থাকিতে পারে। উপরন্তু হাটে পণ্য বিক্রেতারা লাভবান হইতে পারেন সেইজন্যও এই দেবতার পূজা প্রচলিত হইয়া থাকিতে পারে।"[১২২] ড. রায়ের 'পণ্য বিক্রেতা' বলতে আমরা কৃষকের কৃষিজাত পণ্যের কথা বোঝাতে পারি। অর্থাৎ কৃষক যাতে তাঁর উৎপন্ন ফসলের ভাল দাম পান এবং গৃহের সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এই জাদুবিশ্বাস থেকেই জুড়াবান্দা বা ঢেলখাওয়া ঠাকুরের পূজাটি সংঘটিত হয়ে থাকে বলে আমাদের ধরে নিতে অসুবিধা হয় না।

বটপাখিড়ির বিয়াও ঃ

গাছ পূজার ন্যায় গাছের বিবাহদান রাজবংশী সমাজে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে বটগাছ ও পাকুড়গাছকে পাত্র ও পাত্রী নির্বাচন করা হয়। রাস্তায় কেউ বট ও পাকুড় গাছকে পাশাপাশি রোপণ করে। চারাগুলি বড় হলে পরে অত্যন্ত ঘটা করে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ বিয়ের মতো বাজনা সহকারে আত্মীয়-স্বজন নিমন্ত্রণ করা ইত্যাদি সামাজিক নিয়মসহ অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। এই বিয়েতে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব পুরোহিত 'অধিকারী' যাবতীয় কর্ম

সম্পাদন করে থাকে।

অপুত্র ব্যক্তি এই বিয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে। বিশ্বাস, বট-পাখিড়ির পরিণয়ের মধ্য দিয়ে তাদের সাংসারিক জীবনে অচিরেই সন্তান সন্ততি গৃহ আলোকিত করবে। শুধুমাত্র রাজবংশী সমাজেই এই বিশ্বাস নয়, সারা পৃথিবী জুড়েই গাছ পূজার প্রচলন আছে। গাছের পরিণয়ের কারণ সম্পর্কে জেম্‌স ফ্রেজার বলেছেন — যেহেতু গাছকে সজীব পদার্থ বলে ধারণা করা হয়, সেইহেতু স্বাভাবিক ভাবে গাছকে নারী ও পুরুষ কল্পনা করা হয়ে থাকে এবং তারাও পরস্পর পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এই ভাবনাটি সম্পূর্ণতঃ কাল্পনিক নয়। মানুষের ন্যায় গাছেদেরও যৌনাঙ্গ আছে এবং তারাও পুরুষ ও নারীর সম্মিলনে সন্তান উৎপাদন করে থাকে।[১২৩] সুতরাং উর্বরতাতন্ত্র বা Fertility Cult এই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে সংগুপ্ত আছে তা ধরে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানো ঃ

যদি গর্ভের সন্তান পরপর ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা যায়, তাহলে পরবর্তী গর্ভ সঞ্চারের ছয় মাসের মধ্যে সন্তানের মাতা জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানোর জন্য অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠানে জিগা গাছকে নারী রূপে কল্পনা করে শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় এবং দুইটি সরু ডালে শাখা ও একজন স্ত্রী লোকের কপালের উচ্চতায় গাছের কাণ্ডে বা ডালে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। অনেক সধবা নারী অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকে এবং তাদের একজন জিগা গাছটির প্রতিনিধিত্ব করেন। পূজায় কোন 'অধিকারীর' প্রয়োজন পড়ে না, অনুষ্ঠানকারিণী নিজেই পূজার যাবতীয় কর্ম সমাধা করেন। জিগা গাছের নিচে নৈবেদ্য সাজিয়ে অনুষ্ঠানকারিণী তার কামনা ব্যক্ত করেন —

"সই জিগা, তুই তো অমর। মোর ছাওয়া জন্মের পর মরি যায়। সই তুই আশীর্বাদ কর মোর ছাওয়া ঝ্যান যুগ যুগ বাঁচি থাকে।"

এর উত্তরে জিগা গাছের প্রতিনিধি স্বরূপা স্ত্রী লোকটি বলেন — "সইত্য, সইত্য, তিন সইত্য। আজি হাতে তুই মোর সই হোলো। আর তোর ছাওয়া জন্মিয়া মরিবার না হয়, মুই আশীর্বাদ করিনু।"[১২৪] একথা বলার পর উভয়ে উভয়কে প্রণাম করে এবং প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠান শেষে যে যার বাড়ি চলে যায়।

অনুষ্ঠানের পর থেকে ঐ পরিবারের বা বংশের কেউ জ্বালানীর কাঠ হিসেবে কোন জিগা গাছের ডাল ব্যবহার করে না। অনুষ্ঠানকারিণীর সন্তানেরা এক্ষেত্রে জিগা গাছটিকে 'মাহৈ' সম্বোধন করে অর্থাৎ মায়ের মতন চোখে দেখে। শুধু তাই নয় বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হলে সেই অনুষ্ঠানের প্রসাদ কলাপাতায় করে গাছটির ডালে রেখে দেওয়া হয়। গাছটি কোন কারণে মারা গেলে ধারণা

করা হয় পরিবারে আশু কোন দুর্ঘটনা ঘটবে। তাই যথাশীঘ্র অন্য একটি জিগা গাছকে বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতা'লে মৃতবৎসা নারীর সন্তানগুলির অকালে মৃত্যু হয় না এই বিশ্বাস শুধুমাত্র রাজবংশী সমাজে নয়, এতদঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়, শুধু মৃৎবৎসা নারীই নয়, বন্ধ্যা নারীও সন্তান কামনায় অনুরূপ অনুষ্ঠান করে থাকে।[১২৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে সন্তান লাভ বা বংশবৃদ্ধি কামনায় জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানোর অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অতএব উর্বরাতান্ত্রিক ধর্মধারা যে উক্ত অনুষ্ঠানটির সঙ্গে সম্পর্কায়িত এ বিষয়ে আমাদের মনে কোন সংশয় থাকে না।

মাশান ঃ

মাশান একটি বৃহত্তর অঞ্চলের লৌকিক দেবতা। উত্তরবঙ্গ, নিম্ন অসম, মেঘালয়ের তুরা সন্নিহিত অঞ্চল, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ এবং নেপালের ঝাপা ও মরং জেলায় মাশান দেবতার লোকবিশ্বাস ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ কোচ রাজবংশী সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৃ-গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যধারায় মাশান পূজা ও রীতিনীতি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এভাবেই গড়ে উঠেছে লোকসংস্কৃতির ধারায় লৌকিক দেবতা মাশানের নানাতর বিশ্বাস, পূজা পদ্ধতি ও রীতিনীতি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাশান সম্পর্কিত বিশ্বাস নানাভাবে রূপান্তরিত, তাই কেউ কেউ মনে করেন মাশান শিবেরই অংশ। আঞ্চলিক ইতিহাসের সঙ্গেও এরূপ কিংবদন্তী সম্পৃক্ত হয়ে আছে।

দেবদেবী সম্পর্কিত ভাবনায় তিনটি ধারা লক্ষণীয়। প্রথমত, বৈদিক দেবতা, দ্বিতীয়ত, পৌরাণিক দেবতা এবং তৃতীয়ত, লৌকিক দেবতা। চণ্ডী একদা লৌকিক স্তর থেকে বিবর্তিত হয়ে পৌরাণিক স্তরে পৌঁছে গেছেন। তবে দেবতাদের এই স্তর বিন্যাস আসলে সামাজিক স্তর বিন্যাসেরই অন্যতম প্রতিচ্ছবি। কিন্তু মাশান লৌকিক স্তরে অবস্থান করেও একটি বৃহৎ বলয়ে তার প্রভাব পড়েছে; তাই গ্রামের গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন আঞ্চলিক দেবতা।

মাশানের মা কালী, পিতা ধর্ম এবং ১৮ প্রকার মাশানের মধ্যে প্রথমতঃ জলে জন্ম পিচলা মাশান বা জলুয়া মাশানের। উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গে এবং অসমে প্রচলিত মঙ্গলকাব্য ধারায় যে সৃষ্টিমাহাত্ম্য মূলক কাহিনি এবং কিংবদন্তী পাওয়া যায় তা মূলত ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা অনুসারী। অন্যদিকে প্রথম প্রাণের স্পন্দন যেহেতু জলে তাই মাশানের জন্ম কথাতেও জলের প্রসঙ্গ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে উঠে এসেছে। কুচবিহার জেলার দিনহাটা, আদাবাড়িঘাট, সিতাই প্রভৃতি অঞ্চলে কিংবদন্তী মাশানের মা বুড়ি ঠাকুর। তার পূজার্চনা প্রচলিত আছে। সাদা কাপড় পরিহিত বৃদ্ধা, হাতে লাঠি - বুড়ি ঠাকুরের এরূপ মৃন্ময় মূর্তিতে পূজো করার রীতি। জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং

জেলার তরাই অঞ্চলে একই রূপে তিস্তাবুড়ি দেবীকে পূজো করা হয়। এখানে বুড়ি মোটিফটি বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল।

দিনহাটা আলোকঝাড়ি অঞ্চলের গড়কাটা মাশান লোকবিশ্বাস অনুযায়ী জাগ্রত মাশান থান। এই মাশান পাঠ বা থানে অতীতে পূজারী ছিলেন অসমিয়া ব্রাহ্মণ। পরবর্তীকালে বাঙালী সমাজের ব্রাহ্মণ পূজার্চনা করছেন তাদের মতো করে; ফলে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নানা লোকাচার যুক্ত ও বিযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে পরিবারে বা গ্রামের কোন সার্বিক মঙ্গল কামনাতেও গড়কাটা মাশানের দ্বারস্থ হন লোকসমাজ। উক্ত অঞ্চলের কিংবদন্তী, একদা কামতাপুরের রাজা কান্তেশ্বরের দুর্গ তৈরি করতে সাহায্য করেন গড়কাটা মাশান। ভেটাগুড়ি অঞ্চলে লোকমুখে প্রচলিত আছে যে ইংরেজরা অনেক চেষ্টা করেও মাশান কুড়ার উপর দিয়ে রেল লাইন স্থাপন করতে পারেন নি।

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, বেলাকোবা, রাজগঞ্জ অঞ্চলের লোককাহিনিতে পাওয়া যায় যে, একদিন কালী তার 'পঞ্চ বইনি', অর্থাৎ 'পাঁচবোন'কে নিয়ে সরোবরে স্নান করছিলেন, হঠাৎ সেখানে ধর্মদেবের আবির্ভাব। অতঃপর কালীর সঙ্গে ধর্মদেব সরোবরের অতলে ডুবে যান। অবশেষে কালীর গর্ভে টেপামাছ আকৃতির মাশান দেবতার জন্ম। জন্মের পরে ধাই এসে মাশানের নাড়ী কুণ্ডলী কেটে জলে ফেলে দেন এবং সেই নাড়ী কুণ্ডলী থেকে জন্ম হয় কলমী শাকের। যেহেতু ভাদ্র মাসে মাশানের জন্ম এবং তার নাড়ী কুণ্ডলী থেকে কলমী শাকের জন্ম, সেহেতু রাজবংশী সমাজের বিধিনিষেধ হল ভাদ্র মাসে কলমী শাক খাওয়া যায় না।[১২৬] এই লোকবিশ্বাস উত্তরবঙ্গ এবং অসমের রাজবংশী সমাজে প্রচলিত আছে। প্রচলিত ছড়ায় বলা হয়েছে —

"ভাদ্র মাসে কলমু শাক যেবা জন খায়
মাশানের নাড়ী সে অবশ্য চোবায়।"[১২৭]

অঞ্চল বিশেষে মাশানের বিভিন্ন বাহন ও বাহন সম্পর্কিত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে শোলা দিয়ে মাশান মূর্তি তৈরি করেন রাজবংশী মালি ও মালাকার সমাজ। মাশানের বাহন এতদঞ্চলে ঘোড়া। ঘোড়ার মধ্যে নিহিত আছে গতির ব্যঞ্জনা। তথা চলমানতা। ভোটচিনাভাষীদের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকে অশ্বের ব্যবহার লক্ষ্য করি। আবার সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সূত্র ধরেও অশ্বের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তাই কুচবিহার জেলার লৌকিক দেবতা তোর্ষাপীরের বাহন ঘোড়া।

কুচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত শিকারপুরের ডাকমারা ঝাড় অঞ্চলে মাশানের (জলুয়া) বাহন শালমাছ। উক্ত জেলার দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ থেকে বামনহাট যেতে উত্তর লাউচাপাড়া গ্রামে ভ্যাংরা পুলের পাশে দোচালা টিনের ঘরে ভ্যাড়া মাশানের অধিষ্ঠান।

বাহন, ভ্যাড়া (ভেড়া)। মাশানের বাহন সম্পর্কিত লোকসংস্কার যেমন রক্ষা করা, হত্যা না করা, বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হিসেবে চিহ্নিত করা ইত্যাদির মধ্যে টোটেম সম্পর্কিত ধারণা ক্রিয়াশীল।

সমাজ সভ্যতা স্বাভাবিক নিয়মেই পরিবর্তনশীল। ফলে কৌম ভাবনা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃতিকেও নানা ভাবে রূপান্তরিত করেছে। উল্লেখ্য, সংস্কৃতি একেবারে হারিয়ে যায় না, রূপান্তরিত হয় নানা ভাবে। মাশান সম্পর্কিত কৌম ভাবনাও আর্য অনার্য সংস্কৃতির সম্মিলনে রূপান্তরিত। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির আধিপত্যে মাশান লৌকিক দেবতা থেকে চিহ্নিত হয়েছে অপদেবতা রূপে। অথচ শুভকারক ও অশুভ কারক দুই রূপই উক্ত দেবতা কল্পনায় নিহিত আছে। কোথাও মাশানকে বলা হয় কুবের দেবতার ভিন্ন রূপে, তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় রাজবংশী লোকজীবনের কিংবদন্তী।

অসমের ধুবড়ী জেলার অন্তর্গত আগমনী থেকে ৩/৪ কিমি উত্তরে গঙ্গাধর নদীর পাড়ে অবস্থিত কাটলি মাশানের ধাম। স্থানীয় রাজবংশী সমাজে কাট্‌লি মাশান শিব বা কালীর অনুচর। অর্থাৎ মাশান দেবতাকে এখানে শৈব ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকায়ত সমাজের সামাজিক বিবর্তনের ধারাতেই এ ধরনের কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। অবশেষে মাশান দেবতা উর্বরতা তন্ত্রের দেবতায় রূপান্তরিত।[১২৮] সন্তান কামনা থেকে শুরু করে রোগ ব্যাধি পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবন যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানত করা হয় মাশান দেবতাকে। একটি বৃহৎ বলয়ে মাশানের নৈবেদ্য দৈ, চিড়া, আঠিয়া কলা যা রাজবংশী সমাজের অন্যতম প্রিয় খাদ্যাভ্যাস। সুতরাং যে উর্বরতাতন্ত্র বা Fertility Cult আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় তা মাশান পূজার মধ্য দিয়ে তিস্তা ও তোর্ষা পারে উঠে এসেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

ভেড়ার ঘর ছবা ঃ

দোল পূর্ণিমার আগের দিন কাশ খড় দিয়ে একটি ছোট্ট আকরের ভেড়ার ঘর নির্মাণ করা হয়। দই, চিড়া, কলা ও অন্যান্য পূজার সামগ্রী দিয়ে পূজা দেওয়া হয় এই ঘরে। এখানে একজন মানুষ ভেড়া কল্পিত করে রেখে দেওয়া হয়। ভেড়া নৈবেদ্যর প্রসাদ খেতে থাকবে। এ সময় ভেড়ার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। দাউ দাউ করে জ্বলবে ঘরের আগুন। বেড়া ভেঙ্গে বিপদমুক্ত ভেড়াটি ভ্যা ভ্যা করে বেরিয়ে যাবে। পূর্ণিমার দিন থেকে অষ্টম দিন পর্যন্ত একটি খড়ের ঘর নির্মাণ করে এতে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি স্থাপিত হয়। ঘরটিতে একটি বাঁশদণ্ড লাগিয়ে এই ঘর ঘাড়ে করে সোয়ারী খেলা হয় বাড়ি বাড়ি। গৃহস্থরা সোয়ারী অংশগ্রহণকারীদের দক্ষিণা প্রদান করে। দোল পূর্ণিমায় দোলযাত্রা উপলক্ষে কুচবিহারের ঐতিহাসিক মদনমোহনবাড়ি ছাড়াও জেলার অগণিত তফসিলগুলিতে ভেড়ার ঘরপোড়া ও দোল উৎসব এখনও অব্যাহত।

বিষমা উৎসব, বাহো ও মৎস্য শিকার ঃ

কুচবিহার জনজাতির মধ্যে মৎস্যশিকারের জন্য চটকাজাল, ঝোকা, পলাই, জংগা, ডেরু, ফাঁসিজাল এমন অনেক যন্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। বর্তমানে নদীনালা, খাল, বিল লিজ প্রথায় প্রবর্তিত হওয়ায় দলবদ্ধভাবে মৎস্য শিকারীরা বাহোমারা থেকে বঞ্চিত। আজ থেকে ২৫/৩০ বছর আগেও শিঙ্গা ফুকা হত। গ্রামে শিঙ্গা ফুকালে বুঝতে হবে পার্শ্ববর্তী কোনও বিলে বাহো মারা হবে। হাটে ঢোল পিটিয়েও বাহোমারার প্রচার করা হয়। গ্রামবাসীগণ পরস্পর জেনে নেয় কোন বিলে বা নদীতে বাহো মারা হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ একটিই দীর্ঘ ১ কিলোমিটার বিলে গুটিকতক মৎস্যশিকারী বিলে নামলে মাছ ধরার সুযোগ ঘটে না তাই সেখানে তিন চারশত মৎস্যশিকারীর আগমন ঘটলে জলাভূমিতে যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হয়। বিলের কর্দমাক্ত জলে মৎস্যকুলের রাঘববোয়ালেরা যেন এমনিতেই আত্মসমর্পণ করে। এই বাহো মারতে শুধু পলাই, ঝকো ও জাল ব্যবহৃত হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন এভাবে মৎস্যশিকার ছাড়াও পশুশিকারে ঝাড় জঙ্গলে প্রবেশ করা হত। পশুশিকারে মুখ্যত লাঠি, বল্লমই ব্যবহৃত হত। পশু বলতে শেয়াল, বাঘডশা, ছ্যাদা, শেশা, সেইল্যা প্রভৃতি। বর্তমানে বনাঞ্চল না থাকায় শেয়াল ছাড়া অন্যান্য প্রাণী দৃষ্ট হয় না। এদিন পশুশিকার করতে পারলে সারা বছর শিকার মিলবে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল।

বিষমা পরবে বারোমিশেলি ভাজার নৈবেদ্য দেওয়া হয় তুলসী গোড়ায়। চাউল, মসুর, খেসারি, ঠাকুরি, বুট, সরিষা, গম, তিল প্রভৃতির আস্ত দানা ভেজে নেওয়া হয়। এই ভাজায় থাকে, ভেজে নেওয়া জাতি নিমের পাতা, মরিচ, রসুন, সর্ষের তেল, পিঁয়াজ, লবণ প্রভৃতি। নিবেদন শেষে বাটীস্থ সকল সদস্যের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। এছাড়া এদিন তিতা খাবার নিয়মও আছে। এদিন নরসিং, বিষকুটুলি, গঞ্জাই, আমের পল্লব, পানিমুতুরীর পাতা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। এই জল সমস্ত ঘরে ছিটানো হয়। এই জলকে বলে বিষপানি, এই বিষপানির ব্যবহার এখনো আছে। জলে ভেজা পাতাগুলি রসুনসহ দরজার উপরে বেঁধে রাখবার নিয়ম আছে।

ষাইটোল ঃ

ষোলটি কলা, বেলপাতা, ফুল, তুলসীপাতা, ফলাহার কলারপাতার নেওয়াইচে থাইত দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট, তিথি ছাড়াও বছরের ভালো দিন দেখে ষাইটোল পূজিত হয়। ষাইটোল পূজার ঢাক, বাজনা ও পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। ষাইটোল চণ্ডীর মূর্তিভেদ। ষাইটোলের মূর্তি মাটি ও শোলায় নির্মিত হয়।

ষাইটোল পূজা করলে বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী হয়। এই বিশ্বাস থেকে রাজবংশী লোকসমাজ আজও এই দেবীর পূজা করে থাকেন। (পরিশিষ্টে কাহিনি দ্রষ্টব্য।) সুতরাং উর্বরতাতন্ত্রের ধারণাটি যে ষাইটোল পূজার সঙ্গে সম্পৃক্ত এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না।

সোনারায়, রূপারায় ও মানিকরায় ঃ

সোনারায়, রূপারায় ও মানিকরায় এই তিন ভাই রায় উপাধিধারী এবং এরা হলেন ব্যাঘ্র দেবতা। 'সোনারায় বলে রূপারায় ভাই, / তিন জনে মিলি আমরা নরের পূজা খাই।' ছন্দোবদ্ধ পংক্তি দুটিতে মানিকরায় উহ্য। প্রচলিত কাহিনি থেকে সোনারায়, রূপারায়ের সঙ্গে মানিকরায়ও পরিচিত একজন ব্যাঘ্রদেবতা হিসেবে। উত্তরবঙ্গের সর্বত্র বনাঞ্চল থাকায় ব্যাঘ্র, ভালুক, হাতি ও গণ্ডারের অত্যাচার ছিল। উক্ত ভ্রাতৃত্রয় হয়ত বাঘের উপদ্রব দূরীকরণে ও প্রজা মঙ্গলার্থে ব্যাঘ্র বিরোধী প্রয়োজন সাধক কোনও ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, ব্যাঘ্রের সঙ্গে অন্যান্য পশু প্রাণিদের অত্যাচারও হয়ত কমেছিল। কালানুক্রমে এই ভ্রাতৃত্রয় দেবতুল্য হয়ে অবশেষে ব্যাঘ্র দেবতায় আখ্যাত হয়েছে। কুচবিহারে এখনও রাজবংশী জনজাতির মধ্যে সোনারায়ের পূজা দৃষ্ট হয়। খোল,করতাল, বাঁশিবাদক, শাড়ি পরে নারীবেশ ধারণ করে ৪/৫ জন ছোকরার দল, দলের মূলসহ অন্যদের নিয়ে ৮/১০ জনের দলটি সোনারায়ের গানের সঙ্গে নাচ করে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে দক্ষিণামাগে। গৃহস্থগণ উপস্থিত শিল্পীদের দক্ষিণা হিসেবে ধান, চাল অথবা নগদ টাকা প্রদান করে। ১০/১৫ দিন পর মাগনে বেড়ানো শেষ হলে অনুষ্ঠিত হয় পূজা। ব্যাঘ্রের উপর নরমূর্তি আরোহী থাকে। পূজামণ্ডপে মূর্তিটি স্থাপন করে পূজার ব্যবস্থা করা হয় মাগন পরিক্রমাকালীন সোনা রায়ের একটি পয়ার ঃ

"সৈয্যা বাড়িত ফেইস্যা কান্দে
তাংকু বাড়িত বাঘ,
ঘরের পাছোত বুড়ার ব্যাটা
করে বাপরে বাপ।
বলরে বলরে হরি রাম নারায়ণ
রাম ছাড়া গতি নাই
বল রাম নারায়ণ।
সব দোষ খণ্ডিবে বল রাম নারায়ণ।
সত্য ঠাকুর সোনারায় গাইরস্থক দিলে বর
ধনে বংশে বাড়ুক গিরি চন্দ্রদিবাংকর হে।।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ৩১০ দ্রষ্টব্য)

সোনারায়ের গান শেষে ছোকরাদের কণ্ঠে পৃথক গান শোনার প্রস্তাব আসে শ্রোতাদের কাছ থেকে। ছোকরাদের পরিবেশিত গানকে বলে খ্যামটা ও বন্ধুনাচারী। প্রচলিত অর্থে গানের 'ফেইস্যা' বাঘের আগমনী বার্তাবাহক। ফেউ ফেউ করে কাঁদলে গ্রামবাসীরা জেনে যাবে বাঘ আসছে। যার নাম চতুর শেয়াল। এই শেয়ালই কণ্ঠস্বর পালটিয়ে উপকারী হিসেবে মহৎ ভূমিকা পালন করে। গানে রামনারায়ণ, দিবাকর, সত্যঠাকুর প্রমুখ বিশেষণে ব্যবহৃত। ধনে, বংশে বৃদ্ধি

হোক গৃহস্থের সংসার গানে এই প্রার্থনা জানানো হয়েছে। ' সৈয্যা বাড়িত ফেইস্যা কান্দে, তাংকু বাড়ীত বাঘ' এই পংক্তিতে একটি ঐতিহাসিক নিদর্শনের ইঙ্গিত বহন করে। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজদের ভারতে আগমন ঘটে। অতঃপর কয়েক বছরের মধ্যে বাংলার সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুঠি ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ সময় বাংলায় ইউরোপিয় কৃষিজাত পণ্য তামাক উৎপন্ন আরম্ভ হয় বলে জানা যায়। অনেকের মতে এই চাষ প্রথা বাংলায় এরও বহুকাল পূর্বের। প্রথমোক্ত মত সঠিক হলে এবং এই মত বহুলাংশে গ্রহণ করলে সোনারায় ভ্রাতৃত্রয়ের আবির্ভাব সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই ধরে নেওয়া অমূলক হবে না।[১২৯]

ষাইট পূজা ঃ

জলাশয় থেকে আইটালো বা চিকনা (এঁটেল) মাটি বাড়িতে এনে ঢুকিয়ে এর গুঁড়ো বা ধুলো একটা পিঁড়ির উপরে যতটা সম্ভব ২/৩ ইঞ্চি পরিমিত একটা আস্তরণ তৈরি করা হয়। এই আস্তরণে ছিটানো হয় বারোমিশেলি শস্যদানা আবার এরই উপরে মাঝামাঝি থাকে জল ভর্তি আম্রপল্লবযুক্ত একটি ঘট। ঘটের পাশে থাকে ১টি কাটারি ও ১টি শাঁখা। প্রত্যেকটি পূজার সামগ্রিতে থাকে সিঁদুরের ফোঁটা। ৭ দিন ধরে ষাইট পূজা চলে। পূজা শেষে ষাইটের পিঁড়ি বাইরে বের করে নেওয়া হয়। অতঃপর ধুলোয় বপন করা বারোমিশেলি বীজ কিভাবে গড়িয়ে উঠেছে তা দেখে গৃহস্থ নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা ধারণা উপলব্ধি করে। ষাইট পূজার ব্রতকথার মায়েরা তুলসীপাতা জোড়হাতে মনোনিবেশ করে।

"ছুরি কাটারি জাগো ঝাঁকে ঝাঁকে লাগো
হারাইলে পাই মরিলে জীয়াই
দুপুরি আগুনে য্যালায় স্যালায় নিবাই।"[১৩০]

উপরের লৌকিক প্রথায় জেলার তফশিলগুলিতে পূজা-পার্বণ ব্রতকথাগুলির প্রতি বিশ্বাসভাজন ভক্তের সংখ্যা আর তেমন নেই। তবে রোগ-ব্যাধি, সাংসারিক অনটন, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত মহামারী, বন্যপ্রাণীর অত্যাচার, ভূত-প্রেতাত্মা, বৈবাহিক জীবনে নারীর বন্ধ্যাত্ব এ সবই ভাগ্য-পরিহাস-প্রসূত বিশ্বাস থেকেই ষাইট পূজার আয়োজন।[১৩১]

গাং বান্ধা ঃ

পৌষ সংক্রান্তির দিন এক নিঃশ্বাসে পোয়ালের পুঁজ পোয়াল পেঁচিয়ে ঘিরিয়ে নেওয়া হয়। ঘরের খুঁটি, ধানের গোলায়, দরজায় পোয়াল দিয়ে গিঁট দেওয়া হয়। লোকশ্রুতি হিসেবে জানা যায়, লক্ষ্মণ বনবাসে থাকাকালীন বনবিহারে যাওয়ার প্রাক্কালে সীতার বাসস্থানের চারদিকে

গণ্ডি নির্মাণ করতো, এর থেকে গাং বান্ধার প্রচলন বলে জানা যায়।[১৩২] পুঁটি মাছ, গোরসুন ও গুলটাই কুচি কুচি করে কেটে গরুকে খাওয়ানো হয়। এদিন আতপচালের গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে এতে সরিষার ফুল মিশিয়ে নিতে হয়। এই আতপ কলার ডাটার সাহায্যে গরুর কপালে ফোঁটা মেরে দিতে হয়। এদিন রাখাল গরুকে বলবে,

'তুই হাল বাবু কিনা'?

গরু বলবে,

'মুই লোহার গরম সহ্য করিম ত্যাং পুষ সংক্রান্তির দিনতে বসুমতীক না খুড়িম'।[১৩৩]

পুরাকালের এই ঘটনা থেকে গৃহস্থরা হালের বলদের কোমরে লৌহদণ্ড গরম করে লাগায়। একে 'গরুক দাগ দেওয়া' বলে।

যখা-যখিনী ঃ

জৈন ধর্মের যক্ষ/যক্ষী থেকে যখা-যখিনী এসেছে বলে মনে হয়। সন্তান প্রসব করার পর কোন কোন পোয়াতির সন্তান বাঁচে না। এক্ষেত্রে যখা-যখিনী-পূজিত হয়। পূজার নিয়মটি এ রকম, সন্তান প্রসব করার পর বেড়া ভেঙ্গে শিশুটিকে কেউ কোলে নিয়ে তিন পাক ঘরের চারদিকে ঘুরে পোয়াতির গলায় বেঁধে দেবে। অতঃপর শিশুটাকে ঘরের ভিতরে দরজার সামনে কুলায় শোয়াবে। এ সময় একটি শ্লোক / মন্ত্র ঃ

যখিনীর উদ্দেশে ঃ

"যখা না যখিনী মাও
শিগ্‌গির করি বাড়ি যাও
শাল খুটার শিমলার নাও
ছাওনি, ধাংড়ানি।
ধুলধুল ধুলেশ্বরী
ক্যানে থাকিস মাও
ছাইন্‌চাত পড়ি
রামের বান গীতার বর
আজি থাকি ছাওয়াক তুই
অমর কর।"

যখার উদ্দেশ্যে ঃ

"টোটো ম্যাগো যখা শালা
তোর বড় ফুটানি
ছুয়া ঘরোত সোন্দহিস তুই
খুচিমুচি করি।
রামের বান সীতার বর
আজি থাকি ছাওয়াক
তুই অমর কর।"

(সূত্র ঃ পরিশিষ্ট পৃ. ২৭০ দ্রষ্টব্য)

এই মন্ত্র বলার পর মধ্য উঠোনে একগুড়ি দেবে। সন্তানটিকে নিয়ে যে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে সেই উঠোনে গুড়ি দেবে। অন্যান্য মহিলা কন্যা সন্তান হলে ৫ বার উলুধ্বনি দেবে। তারা, কুন্তী, মন্দোদরী, অহল্যা, দ্রৌপদী পঞ্চসতী হলো শেষ। পুত্র সন্তান হলে ৫/৭ বার উলুধ্বনি দিবে,

সঙ্গে ঘরের বেড়ায় লাঠি দিয়ে বারি দেবে ৩ বার। উলুধ্বনি ও লাঠির বারির শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা জেনে যাবে প্রতিবেশীর বাড়িতে পুত্র সন্তান জন্মেছে। পুরুষের দশদশা নারীর একদশা। সন্তান প্রসবের সময় গর্ভবতী ঘরে ঢুকলে প্রতিবেশী মহিলারা স্থির থাকতে পারবে না। পরস্পর বলবে— "আইসো হৌর বেটি ছাওয়া—শুলা ননির মাও কাবু।" 'ফল্লা, ফুল্লী, তাইস্কাকে' হাকবে। ধাত্রীর কাজে পটু মহিলারা বাচ্চা খালাস করাতে ঘটনাস্থলে সমবেত হয়ে নারীকে সেই এক দশার হাত থেকে বাঁচাতেই প্রতিবেশিনীদের এই প্রচেষ্টা।

গছা দেওয়া (দীপান্বিতা, দেওয়ালি) ঃ

দুর্গোৎসবের পরে অমাবস্যার রাতে গছা দেওয়া পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। রাজবংশী জনজাতির ভিতর দেওয়ালি পর্বকে বাতি দেওয়াও বলা হয়। এদিন প্রত্যেকটি রাজবংশীর বাড়িতে গেড়ে নেবে একটি কলাগাছ। এই কলাগাছে ৮/১০ ইঞ্চি বাঁশের কাঠি ইংরেজি ইউ-এর মতো করে গেঁথে নেওয়া হবে। এতে মাটির দিয়াড়িতে তেল সলতে জ্বালিয়ে দিয়াড়ি মালা সজ্জা প্রস্তুত করা হয়। দেড় দু' ফুট লম্বা একত্রে ৩ খণ্ড পাটখড়ি একপাশে বেঁধে নেওয়া হয়। একত্রে ৩ খণ্ড পাট খড়ি, একটি প্রদীপ (lamp stand)। এ রকম প্রদীপ প্রদানের জন্য সাধ্য মতো স্ট্যাণ্ড বানিয়ে নেওয়া হয়। কলাগাছের পাশে পাট খড়ির প্রদীপগুলি সাজানো থাকে। এই পাট খড়ির প্রদীপ পার্শ্ববর্তী স্থানে প্রদত্ত হয় যাতে দেওয়ালির রাতটিতে অন্ধকার না থাকে। পাট খড়ির নির্মিত প্রদীপকে বলে 'ঠগা'। কলাগাছের গোড়াটি কচ্ছপাকৃতি মাটির ঢিপির মত করে লেপে নেওয়া হয়। এখানে ফলপ্রসাদ নিবেদন করা হয়। প্রদীপগুলি প্রয়াত পূর্ব পুরুষদের নাম স্মরণ করে প্রদত্ত হয়। আর 'ঠগায়' প্রদত্ত হয় যখা, যখিনী, মাশান, কালী ইত্যাদি ছত্রিশ কোটি দেবতার উদ্দেশ্যে। উঠোনে গাড়া কলাগাছটি সূর্যোদয়ের আগেই এক নিঃশ্বাসে উপড়িয়ে জলাশয়ে বিসর্জন দিতে হয়। অমাবস্যার রাতে চোরেরা 'সাইত' বা 'শুভযাত্রা' করে। রাতের অন্ধকারে গৃহস্থ বাড়িতে ঘুরে ঘুরে যে কোন একটা কিছু পেলে ব্যস কেল্লাফতে। একটা কিছু প্রাপ্তি মানেই সারা বছরের জন্য শুভ। এজন্য এই রাতে গৃহস্থরা সতর্কতার সঙ্গে বাটীস্থ ব্যবহার্য যে কোন জিনিস অসাবধানে যাতে কোথাও পড়ে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

তিস্তা তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান যথা, লোকক্রীড়া, লোকগান, লোকশিল্প, লোকপ্রযুক্তি, লোকসাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক, যেমন - ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, লোককথা, প্রয়োগধর্মী, শিল্পকলা, রীতিনীতি ইত্যাদি আলোচনার মধ্য দিয়ে যে সাংস্কৃতিক লোকজীবন ধারাকে আমরা খুঁজে পাই তা হল কৃষিজীবন ও সংস্কৃতি অর্থাৎ উক্ত অঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতির অন্যতম ভিত্তিভূমি হল কৃষিচারণা তথা কৃষিসংস্কৃতি। এই অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশে উদাহরণসহ তা উল্লেখ করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার - সম্পাদক, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ. ৩৮২।

২. রায়, ড. নীহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ২০০১, পৃ. ৪৮৭।

৩. সেনগুপ্ত, পল্লব - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, ২০০২, পৃ. ২৫১।

৪. রায়, ড. নীহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ২০০১, পৃ. ১৯৩।

৫. দাস, ড. অসীম - বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস, পৃ. ১২৭।

৬. সেনগুপ্ত, পল্লব - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, ২০০২, পৃ. ২৫০।

৭. ঐ, - পৃ. ২৪৯।

৮. ঐ, - পৃ. ২৬৭।

৯. ঐ, - পৃ. ২৪৮।

১০. ঐ, - পৃ. ২৪৮।

১১. দাস, ড. অসীম - বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস, পৃ. ১৯।

১২. সেনগুপ্ত পল্লব, - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, ২০০২, পৃ. ২৫০।

১৩. চৌধুরী, ড. দুলাল - সম্পাদিত, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, ২০০৪, পৃ. ৪২৪।

১৪. দাস, ড. অসীম - বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস, পৃ. ২৪।

১৫. সেনগুপ্ত,পল্লব - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, ২০০২, পৃ. ২৫১।

১৬. ব্যানার্জ্জী, অধ্যাপক অলোক - শরীরচর্চার আলোকে বাংলার লোকক্রীড়া, ও আলম, ড. জিয়াউল ২০০৪, পৃ. ৫১।

১৭. সেনগুপ্ত, পল্লব - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, ২০০২, পৃ. ২৫১-২৫২।

১৮. ঐ, - পৃ. ২৫০।

১৯. দাস, ড. অসীম - বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস, ১৯৯১, পৃ. ১৫৩।

২০. ঐ, - পৃ. ১৫৪।

২১. ঐ, - পৃ. ৮১।

২২. ঐ, - পৃ. ২৭।

২৩. ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ - বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০৯।

২৪. ভট্টাচার্য, ড. দেবাশিষ (সম্পাদক) - তরস্বী, এপ্রিল, ২০০৭, পৃ. ১১।
২৫. Hunter, W.W. - A statistical Account of Bengal, Vol - X, p. 378 ।
২৬. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদক) - বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ. ৫৬।
২৭. সাক্ষাৎকার - শ্রীবিভূতিভূষণ রায় (৪৭), পশ্চিম শালবাড়ি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।
২৮. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদক) - মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ. ৩১৭।
২৯. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৬।
৩০. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদক) - মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ. ৩১৭।
৩১. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর, - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ১৯৯৯, পৃ. ১৭৩।
৩২. Sanyal, Dr. Charu Ch. - The Rajbanshis of North Bengal, p. 141.
৩৩. দাস, সুখেন্দু (সম্পাদক) - পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলাসংখ্যা, পৃ. ১৩২।
৩৪. ঐ, - পৃ. ১৩২।
৩৫. ঐ, - পৃ. ১৩২।
৩৬. সরকার, পবিত্রভূষণ (সম্পাদক) - স্মরণিকা, ডুয়ার্স, ২০১০, আলিপুরদুয়ার, পৃ. ১৩।
৩৭. ঘোষ, প্রদ্যোত - বাংলার লোকশিল্প, ২০০৪, পৃ. ১৩১।
৩৮. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদক) - বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ. ৪২১।
৩৯. ঘোষ, প্রদ্যোত - বাংলার লোকশিল্প, ২০০৪, পৃ. ৯০।
৪০. ঐ, - পৃ. ৬১।
৪১. সেনগুপ্ত, পল্লব - পূজাপার্বণের উৎসকথা, ২০০১, পৃ. ১৪৭।
৪২. Sen, Prabhas - Crafts of West Bengal, Ahmedabad, 1994, p. 56.
৪৩. সেন, দীনেশচন্দ্র - বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ. ৪২৬।
৪৪. গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার - বাংলার লোকশিল্প, ১৩৬৮, পৃ. ৬৬।
৪৫. বসাক, শীলা - বাংলার নকশী কাঁথা, ২০০২, পৃ. ১৬।
৪৬. সেন, দীনেশচন্দ্র - বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ. ৪২২।
৪৭. বসাক, শীলা - বাংলার নকশী কাঁথা, ২০০২, পৃ. ৭১।
৪৮. ঐ, - পৃ. ৭৭।
৪৯. ঐ, - পৃ. ৭৯।
৫০. মজুমদার, শঙ্কর - শিল্পকলার পশ্চিম দিগন্ত, পৃ. ২।
৫১. ঐ, - পৃ. ২।
৫২. সেনগুপ্ত, পল্লব - পূজাপার্বণের উৎসকথা, ২০০১, পৃ. ৬০।
৫৩. মিত্র, ড. সনৎকুমার (সম্পাদক) - লোকসংস্কৃতি গবেষণা, 'আলপনা ও লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ২।
৫৪. ঐ, - পৃ. ২।

৫৫. সেনগুপ্ত, পল্লব - পূজাপার্বণের উৎসকথা, ২০০১, পৃ. ৬০।
৫৬. মিত্র, ড. সনৎকুমার (সম্পাদক) - লোকসংস্কৃতি গবেষণা, 'আলপনা ও লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ৭০।
৫৭. ঘোষ, প্রদ্যোত - বাংলার লোকশিল্প, ২০০৪, পৃ. ৮৬।
৫৮. ঐ, - পৃ. ৮৬।
৫৯. মিত্র, ড. সনৎকুমার (সম্পাদক) - লোকসংস্কৃতি গবেষণা, 'আলপনা ও লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ৭২।
৬০. ঐ, - পৃ. ৪।
৬১. ঐ, - পৃ. ৭৪।
৬২. ঐ, - পৃ. ৭৩।
৬৩. সেনগুপ্ত, পল্লব - পূজাপার্বণের উৎসকথা, ২০০১, পৃ. ৬০।
৬৪. মিত্র, ড. সনৎকুমার (সম্পাদক) - লোকসংস্কৃতি গবেষণা, 'আলপনা ও লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ৪।
৬৫. ঐ, - পৃ. ৩।
৬৬. ঐ, - পৃ.৭১।
৬৭. ঐ, - পৃ. ৬৭।
৬৮. ঐ, - পৃ. ৭২।
৬৯. ঐ, - পৃ. ৭৫।
৭০. Sanyal, Dr. Charu Ch. - The Rajbanshis of North Bengal, p. 60.
৭১. কুণ্ডু, মণীন্দ্রলাল - বঙ্গীয় রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন-ধাঁধা, ২০০৮, পৃ. ২৫।
৭২. বসাক, ড. শীলা - বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়, পৃ. ৫।
৭৩. বসাক, ড. শীলা - বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়, পৃ. ৫।
৭৪. ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ - বাংলা লোকসাহিত্য, ১৯৫৮, পৃ. ৩৯৬।
৭৫. 'স্মরণিকা', ২০তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা ও উত্তরবঙ্গ মেলা, ২০০৯, পৃ. ১২।
৭৬. Grunning, John. F. - Eastern Bengal & Assam District gazetteers, Jalpaiguri, 1891, p.80.
৭৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, তারিখ - ১২.৩.২০০৩।
৭৮. 'স্মরণিকা', ১৮তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা ও উত্তরবঙ্গ মেলা, ২০০৭, পৃ. ৩৫।
৭৯. ভট্টাচার্য, ড. দেবাশিষ (সম্পাদক) - তরস্বী, এপ্রিল, ২০০৭, পৃ. ২৫।
৮০. ঐ, - পৃ. ৩১।
৮১. মিত্র, ড. সনৎকুমার - লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, সার্ধ শতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, ১৪১৭, পৃ. ১২।

৮২. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি - বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, পৃ. ২২।
৮৩. ঐ, - পৃ. ৬।
৮৪. ঐ, - পৃ. ২২।
৮৫. চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার - লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা, পৃ. ১।
৮৬. আহমেদ, খাঁচৌধুরী আমানতউল্লা - কুচবিহারের ইতিহাস, পৃ. ৮৫।
৮৭. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ১৯৯৯, পৃ. ৫।
৮৮. রায়, গৌতমগুহ - দ্যোতনা, পৃ. ২১৫।
৮৯. কর, অরবিন্দ - কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলাসংকলন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৫।
৯০. ভট্টাচার্য, অজিতেশ - মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, পৃ. ৩০৯।
৯১. ভট্টাচার্য, অজিতেশ - মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, পৃ. ৩০৯।
৯২. কর, অরবিন্দ - কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলাসংকলন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৫।
৯৩. রায়, নিখিলেশ (সম্পাদক) - ডেগর, ২০০৬, পৃ. ৩৪।
৯৪. ঐ, - পৃ. ৩৩।
৯৫. Hunter, W.W. - A Statistical Account of Account of Bengal, Vol - X, p. 326.
৯৬. Sanyal, Dr. Charu Ch. - The Rajbansis of North Bengal, p. 170.
৯৭. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ১৯৯৯, পৃ. ২৮৩।
৯৮. রায়, গৌতমগুহ (সম্পাদক) - দ্যোতনা, পৃ. ২১৮।
৯৯. ঐ, - পৃ. ২১৮।
১০০. আহমেদ, খাঁচৌধুরী আমানতউল্লা - অধ্যাপক, হিতেন নাগ সম্পাদিত, কুচবিহারের ইতিহাস, ২০০৫, পৃ. ৫৮।
১০১. চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার - লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা, পৃ. ৪।
১০২. চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার - লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা, পৃ. ৪-৫।
১০৩. কর, অরবিন্দ - কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলাসংকলন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৪।
১০৪. ঐ, - পৃ. ৫৭৫ ।
১০৫. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ১৯৯৯, পৃ. ৬১।
১০৬. কর, অরবিন্দ - কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলাসংকলন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭০।
১০৭. ঐ, - পৃ. ৫৭১।
১০৮. ঐ, - পৃ. ৫৭১।
১০৯. আনন্দবাজার পত্রিকা, তারিখ- ১৮.১০.২০০৭।

১১০. পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, জুলাই, ২০০৬, পৃ. ১১৮।
১১১. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ১৯৯৯, পৃ. ১৩।
১১২. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ১৯৯৯, পৃ. ২৮।
১১৩. পশ্চিমবঙ্গ কুচবিহার জেলা সংখ্যা, জুলাই, ২০০৬, পৃ. ১২৮।
১১৪. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ১৯৯৯, পৃ. ১১০।
১১৫. রায়, নীহাররঞ্জন - বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ২০০১, পৃ. ৪৮৮।
১১৬. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ১৯৯৯, পৃ. ৭৯।
১১৭. রায়, নীহাররঞ্জন - বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ২০০১, পৃ. ৪৮৭।
১১৮. বর্মা, সুখবিলাস - জাগগান, ১৯৯৭, পৃ. ৮৫।
১১৯. সাক্ষাৎকার - শ্রীবিভূতিভূষণ রায় (৪৭), পশ্চিম শালবাড়ি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।
১২০. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ১৯৯৯, পৃ. ১৯২।
১২১. ঐ, - পৃ. ১৯২।
১২২. ঐ, - পৃ. ১৮৬।
১২৩. Frazer, Sir James - The Golden Bough, Vol - I, Part - II, p. 24.
১২৪. কর, অরবিন্দ - কিরাত ভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন, পৃ. ৪৫১।
১২৫. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ১৯৯৯, পৃ. ১৮৮।
১২৬. বর্মা, যতীন (সম্পাদক) - স্মরণিকা, মাশান ও অন্য, ২০১০, তুফানগঞ্জ, পৃ. ৫।
১২৭. ঐ, - পৃ. ৫
১২৮. ঐ, - পৃ. ৬।
১২৯. দাস, সুখেন্দু (সম্পাদক) - পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, জুলাই, ২০০৬, পৃ. ১৩১।
১৩০. ঐ, - পৃ. ১৩৩।
১৩১. ঐ, - পৃ. ১৩৩।
১৩২. ঐ, - পৃ. ১৩৩।
১৩৩. ঐ, - পৃ. ১৩৩।

****

উপসংহার

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চল ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক , সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য এলাকা থেকে অনেকটাই আলাদা। হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে অবস্থিত এই অববাহিকা অঞ্চলে একদিকে যেমন আছে বৃহত্তর কৃষিবলয় অন্যদিকে আছে চা-বাগান অঞ্চল। তদুপরি পালমাটি দিয়ে গড়া সমতলভূমি এবং প্রস্তরময় পাহাড়ী বন্ধুরতা এই অঞ্চলকে একটি স্বতন্ত্র অভিধায় চিহ্নিত করেছে। ভাষাগত অবস্থানে ভারতীয় আর্য, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং ভোটচীনা ভাষীদের সম্মিলিত সহাবস্থান এই অঞ্চলকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি এতদঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে; তা উল্লেখ করবার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণা পত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে।

প্রথম অধ্যায়ে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ঐহিসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে তুলে ধরা হয়েছে। যা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ছড়িয়ে আছে এবং তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকার জনজীবনকে প্রভাবিত করেছে। তৎসঙ্গে এতদঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক অবস্থানও তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সভ্যতার অগ্রগতিতে কৃষি ও উর্বরাতন্ত্র। লোকায়ত সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে যদি লক্ষ্য করি বা মর্গানীয় তত্ত্বের মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের ধারাকে যদি চিহ্নিত করি তাহলে দেখব যে খাদ্য সংগ্রহকারী আদিম সমাজ কিভাবে শিকারজীবী অবস্থান থেকে ধীরে ধীরে কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কৃষি সম্পর্কিত জীবনাচরণ এবং আদিমতম সমাজ ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত উর্বরাতন্ত্র এবং কৃষি কিভাবে এ অঞ্চলের সমাজ জীবন ও সংস্কৃতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি, যেমন - লাঙ্গল, মই, জোয়াল, কাস্তে, কোদাল, ঝুড়ি, বেধা, মাছ শিকারের বিভিন্ন উপকরণ গৃহে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, উপকরণাদি, অলংকার, বসনব্যসন, খাদ্যাভাস কিভাবে লোকসাহিত্যের মধ্যদিয়ে উঠে এসেছে তা তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে কীভাবে কৃষিজীবন এবং কৃষি সম্পর্কিত লোকাচার যুক্ত হয়ে আছে তা উল্লেখ করা হয়েছে

বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে। রাজবংশী সমাজ মূলতঃ কৃষিনির্ভর। কৃষি কাজের ফাঁকে ফাঁকে উঠে এসেছে দৈনন্দিন জীবনের ভালোলাগা, মন্দলাগা এবং বিভিন্ন কামনা-বাসনা। সেই কামনা-বাসনাগুলি কখনো ভাওয়াইয়া গানে, কখনো মেছেনী গানে, কখনো চোরচুন্নী গানে অথবা গোরক্ষনাথের গানে লোকায়ত নান্দনিক দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ এই অধ্যায়ে দৈহিক ক্রিয়াধর্মী লোকসংস্কৃতি, বাগ্‌ধর্মী লোকসংস্কৃতি, প্রয়োগধর্মী লোকসংস্কৃতি, শিল্পীধর্মী লোকসংস্কৃতি এবং বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কীভাবে কৃষি ও কৃষি প্রসঙ্গ মানুষের জীবনচর্যায় বা চর্চায় জড়িয়ে আছে তথা লোকাচার-লোকবিশ্বাস তদুপরি সামগ্রিক লোকঐতিহ্যে কিভাবে ফুটে উঠেছে তা তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

অবশেষে চতুর্থ অধ্যায় উপসংহার এবং পঞ্চম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে সংগৃহীত উপাদানগুলি। অর্থাৎ যে উপাদানগুলির মধ্য দিয়ে তিস্তা ও তোর্ষাপারের লোকায়ত সংস্কৃতিকে অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে বিচার বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে তুলে ধরা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে সংকলন অংশে বা পঞ্চম অধ্যায়ে।

গবেষণা শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে বিচার বিশ্লেষণের অবকাশ যেমন তৈরি হয়েছে তেমনি এতদঞ্চলের কৃষি সংস্কৃতি কীভাবে লোকসংস্কৃতির অঙ্গে বিভঙ্গে জড়িয়ে আছে সেটা দেখানো অথবা তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির মূল ভিত্তি যে কৃষি তা বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

———————

পরিশিষ্ট

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির সংগৃহীত উপাদান ঃ

বাগ্‌ধর্মী ঃ

ছড়া

(১)

হর হর গড় গড়
কালাই ভাঙ্গি ডাইল কর।
সেই কালাই খাবে তোর
মামা মামির ঘর।

(২)

নিন আয়রে নিন আয়
হামার বাউটা নিন যায়
বাঁশের পাতারি নড়েছে
হামার বাউটা হাসেছে,
হামার বাউটা ভাল কলাৎ নিন যায়।
বাউ, চুড়া থুইসু চোখির তলত্
নিন আয়, নিন আয়
বাউ, দুধের একটা খুড়ি থুইসু
নিন আয়, নিন আয়।

(৩)

হামার দাদা নাচন জানে ভাল
নাইচতে নাইচতে খাল খুড়ে।
আদন ধান বাইর করে।

নাইচতে নাইচতে খাল খুড়ে
মামার ঘরে পান্তা হাড়ি বাইর করে
হামার দাদা নাচন জানে আগোল পাগোল।
মাচার তলে পড়ি আছে ছয় কুড়ি ছাগল।

(৪)

হামার মাই নাচে।
ধান কুলাখান পাচে
উয়ার পিসাই নিলাজী
জাওলা ধরি আসে।
জাওলাৎ নাই ধান
ধর শালীর কান।

(৫)

নাচ বান্দোর নাচ
হাতের তুরতুরা
বাড়ির বাইগন তাক খায়্যা
বুড়ার ব্যাটা জুড়িসে নাচোন।

(সংগ্রহ ঃ ১-৫নং ছড়া শ্রীহরিদাস রায় (৭৫), গাঠিয়াগছ, ফাটাপুকুর, জলপাইগুড়ি)

(৬)

হামার মাই নাচে
আদোন ধান পাচে
মাথার চুলি ঝাপুর-ঝুপুর
বুড়া ভাতার পাচে।

(৭)

কাউয়া জোগায় খেড়খড়ি বগে আন্ধে ভাত,
হামার মাইটা ভাত খায় বগে ফেলায় পাত,

শুকিয়া গেলেক বাটার পান খাটা হৈলেক দৈ,
মোসীর বেটী দয়া জানে আনিল মুড়ি খই।

(৮)

ঝোঁ-চু-চু-চু, বাঁশ বাড়িৎ গু
কায় ফেলাবে গু, মামী ফেলাবে গু
মামা গেইসে হাল জুড়িবার
মামী জুড়িসে খলা,
মামীর মাথাত্ ওগুন নাগিল
বলো আল্লা।

(৯)

শাক তুলো মুই মুঠি মুঠি শাকের আগাল নাই।
মুই যে কর ভাতার ভাতার বাপের মনত্ নাই।
শাক তুলো মুই মুঠি মুঠি কোচা মতন ভরুক।
হোক কেনে কালা ভাতার আদর যতন করুক।

(১০)

নাল গাছের নাল সুপারি শুকান গাছের পান
কী দিয়া গুয়া খয়াইসেন বন্ধু ঘরে রয় না মন।

(১১)

মাকেলা বাঁশের পাতারি/ঐঠে দাদার কাচারি/
মুইও যাইম মুইও যাইম/ দৈয়ল দিদির বাড়ি/
বাপ শুনিলে চেঁচাবে/মাও শুনলে টানিয়া বসাবে/
না কান্দিস দাদা না কান্দিস দাদা/মুখত গামছা দিয়া/
আর বার তোর বিয়াও হবে/ জোড় কইনা দিয়া।

(সংগ্রহ ৬-১১ নং ছড়া শ্রীকিরণ রায় (৪০), ঝাঞ্জুপাড়া, ফাটাপুকুর, জলপাইগুড়ি)

(১২)

দাদা হাল ছাড়িয়া দে
নদীর পাড়ত্ কইনা কান্দে
মোকো বিয়াও দে।

(১৩)

চূয়া যায়া দ্যাখোতে নটা পড়িসে,
নদী যায়া দ্যাখোতে পাইক বসিসে।
পাইকের ঘর গুয়া খায়া ঘুমুনি উঠিসে।
তিন কনা পিতলের খুড়ি ভাসি উঠিসে।
একেনা নিগাইল ধরম ঠাকুর একেনা নিগাইল টিয়া
টিয়ার মাওর বিয়াও হছে নাল শাড়িখান দিয়া
বাপ দেছে হাল গরু পাল বান্ধিয়া।
মাও দেছে শাখা সিন্দুর কান্দি কাটিয়া
পরার বেটা নিগাছে কীর্তন করিয়া।

(১৪)

আবো আবো আবো
বাইগন বাড়িৎ ঘর
গলার মাটি চিকটা মাটি
চেংরা ভাতার ধর।

(১৫)

দাদার মাইয়া ভোজি
প্যালকে আন্ধে সজি
দাদা বোলে খায় না
ভোজি বলে পায় না।

(১৬)

বোনু বোনু বোনু
গুয়া বাড়িৎ কি?
হইড্ডাল পংখি।
পরার মাইয়া ধরিয়া
এত্তয় আত্তি।

(১৭)

বড় দিদি ও ছোট দিদিও
মোক ঝুমকা গড়েয়া দে
ঝুমকার তলাত্ পাকা ধান
বড় দিদির ভাতারটা মছরমান।

(১৮)

পালাণ্ডি মাইয়া পালায় রে
কালাই বাড়িৎ নুকায় রে।
ঐকিনা মাইয়া মোরে রে।

(সংগ্রহ ঃ ১২-১৮ নং ছড়া শ্রীরোহিনী মালাকার (৬০), গ্রাম ও পোঃ রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)

(১৯)

কথান্তর ঃ

আঠাত কাওয়া	আটহাত কাওয়া
দশাত নাওয়া	দশহাত নাওয়া
শোলাত বোল্লার চাক	ষোলহাত বোল্লার চাক
কুঁড়িয়াত (রোগ) বামনের নাক।	কুড়িহাত বামনের নাক।

(সংগ্রহ ঃ ১৬-১৯ নং ছড়া - শ্রীভূপালচন্দ্র রায় (৫২), রাঙ্গামাটি, শিবপুর, কুচবিহার)

(২০)

হুড়মুড় যাত্রা

যা করে বিধাতা

ধিরিম ধাক্‌কা ওঠেকানায় মক্কা

হুটলুস বুদ্ধি কার্যসিদ্ধি।

(২১)

ন্যামন্যাম থ্যাম থ্যাম গকলুং বাঁশ

যমে নিগিবার জন্যে থাকে পরবাস।

(২২)

মানষি সোজা হয় হুমকিত

গরু সোজা হয় পেন্টিত

মাইয়া সোজা হয় পেন্দনত

সাগাই সোজা হয় আন্দনত।

(সংগ্রহ ঃ ২০-২২ নম্বর ছড়া - শ্রীকৈলাসচন্দ্র বর্মণ (৪৭), খলিসামারি, কুচবিহার)

(২৩)

সংসার সাগররূপা

মীনরূপ মানবা

জঞ্জাল জালরূপা

কালরূপা ধীবরা।

(২৪)

সাধু যায় গুণ খুঁজে

মধু খুঁজে ভোমরা

মক্ষিকায় খুঁত খুঁজে

দোষ খুঁজে বর্বরা।

(সংগ্রহ ঃ ২৩-২৪ নম্বর ছড়া - শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (৬০), দেউনিয়া পাড়া, জলপাইগুড়ি)

(২৫)

পান খেলে লাল হয় না

লাল হয় তার চুনে

রূপ দেখিলে মন ভুলে না

মন ভুলে তার গুণে।

(২৬)

শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি

দিনা চারি ভারি ভূরি।

এটা কথার অর্থ কেমন

ছাই-এর ভিড়ায় কুত্তা যেমন।

(২৭)

টিডিডং সাগরে বক্তা

পূবে বক্তা ধীবরা

সন্ধ্যায় কালপেঁচা বক্তাং

শোভা বক্তাং নখরাং

(২৮)

শঙ্খের শন শনিতে টাকুয়ার সাত পাক

উদের মাছ দেখিয়া বিলাই মারলেক ঝাঁপ।

(সংগ্রহঃ ২৫-২৮ নম্বর ছড়া - শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায় (৪৭), পূর্বদুরামারি, জলপাইগুড়ি)

(২৯)

শিদলের মাহাত্ম্য

নমস্তে শিদল দেবায়ঃ কৃষ্ণকায়ামৃত প্রভং

পিতে মধুরং নাম মোর যেন চরাচরং

যদাত্বাং মিশ্রিতং ভৌতাং সহান্যে ব্যঞ্জনে চ

কদাচিং প্রফুল্ল স্বাদ বর্ণিতং না স্বরগামী
অতুলাঞ্চ প্রভাকরম শালগ্রাম রূপং তথা
মহাদেব স্বরূপান্তে দীর্ঘকায়া শুষ্ক মীনং
মানং কচ্চিদায় হরিদ্রায় মিশ্রানে সদর্প
তৈলং সংযুক্তং ত্বং শিদলং ত্বং নমাম্যহম্।

শিদলের মাহাত্ম্য (বাংলা)

নমস্কার করি মুই কালা শিদলের পায়
আহা কি মধুর নাম তোমার হইল দুনিয়ায়
ভাত তরকারির সাথে তোমার মিশাইনু করিলে
এত খুশি হইনু মুই বর্ণিবার কথা নাহি মেলে
ইচ্ছাকরি কেহ্ যদি শিদল খাইতে চায়
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল তার চারগুণে হয়
পোড়া খাও আওটা খাও মনে শান্তি পাবে
মরুচ কিছু বেশি দিলে সুস্বাদু হইবে
দুই আঙ্গুলে যদি ফের শিদল খাইবে।
ন্যারফের ড্যার ড্যার করি নাকের ঝোল ঝরিবে।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীগিরিন্দ্রনাথ বর্মণ (৮৫), ফুলবাড়ি, কুচবিহার)

(৩০)

আন্ধার ঘরৎ সন্দাইল চোর,
হাতে বেড়াও পয়ার গোড়।
জ্বালাও বাতি জ্বলে না,
চোর মরাটা মরে না
উঠ্ উঠ্ স্বামী ধন প্রাণ বাঁচে না।

(৩১)

আগশোর আগশোর হাট

পোকা মাকড় নেন্দুর ভেন্দুর দূর যা

সোনার নাঙ্গল উপার ঈশ্।

হামার ধানের বড় বড় শিষ।

কথান্তর ঃ

সগারে ধান আউল বাউল

হামার ধান সিদায় চাউল।

- - - - - - - - - - - - -

হাঁসের ডিমা কচুর ফুতি

আয়মা লক্ষ্মী হামার ভিতি।

সগারে ধান টোনামোনা

হামার ধান কাইঞ্চা সোনা

- - - - - - - - - - - - - -

আশ্বিন কার্তিক ভোগার ডাং

নাড়া ফাটি বিরাক ধান।

(সংগ্রহ ঃ ৩০-৩১নং ছড়া শ্রীদয়ালচন্দ্র রায় (৬০) দেউনিয়া পাড়া, জলপাইগুড়ি)

(৩২)

গিরজি আয়রে ঝরি

মানার পাতত ধরি।

(৩৩)

আয়রে পানি ঝিম্‌ঝিম্

পাটা কাটে দিম্‌দিম্।

(৩৪)

যারে পানি ঘুরিয়া

সিদল দিম পুরিয়া।

(৩৫)

"ফুলোনো ফুলোমাটি
একোটে দোলোনোটি
তেলোনোটি
ঝামোনোটি
একটি পয়সা তেলের দাম
মনোরঞ্জন বামন
পদ্মফুলের সদ্য বাঁশি
হে সূর্য তোমার সাক্ষী
ষাড়ের গলায় পাঁচ পট্টি
তোল ঝাট্টি।"

(সংগ্রহ ঃ ইন্দ্রমাধব দাস (৩৩), ভাটিবাড়ি, জলপাইগুড়ি)

(৩৬)

"ইচন বিচন ধাউরি বিচন
তাতে আছে মঙ্গলকাঁটা।
মঙ্গলকাঁটা নড়েচড়ে
আইকুমারি ডাক পাড়ে,
এলেরে বেলেরে
ফুলতুলিবার গেলেরে
ফুলের মানডালা পাত
ছিরি আংটি হাত কাট।"

কথান্তর ঃ

ইচন বিচন ধাপুরি বিচন
তাতে আছে মদন কাঁটা
মদন কাঁটা নড়ে চড়ে
আই কুমারি ডাক পারে।
অ্যালেরে ব্যালেরে
ফুল তুলিবার গেলোরে
ফুলের ধাপুরা পাত
ছিরি আংটি হাত কাট।

(৩৭)

ডোম্‌নারে ডুম্‌নী
নিচা মাছের ঘুমনী
শাক খায় শুকাতি খায়
ডোমনা ব্যাটা কুঠে নুকায়?
চুপ্‌চুপ্‌ নিচ্‌চুপ
(ঢাপঢুপ নিচচুপ)
কানাকুকুরী ভুটুলুস।

কথান্তর ঃ - ১

ডোম্‌নারে ডুমুনি
নিচা মাছের ঘুমুনি
শাক খায় সুকাতি খায়
ডোমনার ব্যাটা কুন্‌ঠে নুকায়
ঢাপঢুপ নিচচুপ
কুকুরের পুজ।

কথান্তর ঃ - ২

ডমনারে ডুমুনি
সরা মাছের ঘুমুনি
সর খায় শুকাতি খায়
ডমনার বেটা কুনঠে নুকায়?
ঢাপঢুপ নিশ্চুপ কানাকুকুরী ভুচ্চুলুৎ
কান্দে কাউয়া কুন্ঠে
হাগি দ্যাও তোর ঠোঁটে।

কথান্তর ঃ - ৩

ডুম্‌নারে ডুমনি
সরা মাছের ঘুমনি
সর খায় সুকাতি খায়
ডোমনার ব্যাটা কোঠে নুকায়
করে কাউয়া ক
নিচুপ ঢাপঢুপ
ডোমনার ব্যাটা কোঠে নুকায়
নিচুপ চুপচুপ
চুয়াত ডুপ্‌
কুনঠে আছে সেইটে বুচ।

(৩৮)

গুদু গুদু মানার পাত
জল আনিতে হইল ভাত
অয় খাউক অয় খাউক
করুক কুক করুক কুক
আতি পোহাইলে তুরুক।
ভাত গিলা কায় খাইল?
ভন্দা বিলাই।
এ্যাও মারু বেও মারু

কুনঠে গেইল ভন্দা বিলাই
কুত্‌কুতায় মারু।

(সংগ্রহ ঃ ৩৬-৩৮ নং ছড়া শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ (৩৮), তুফানগঞ্জ, কুচবিহার)

(৩৯)

মাটিরে মাটি
চাটিরে চাটি
কাঁচা কাঁঠাল মোকা তোলা দ্যায়
রাজার বেটির বেহা হবে।
লম্বা লম্বা শাড়ি পিন্দেছে
শাড়ির উপুরা গহমা সাপ
চম্‌কি উঠিল কইনার বাপ
কইনার বাপের নাম কি?
থাপুরি দিয়া উঠিল কি?

(৪০)

"অস্‌কস্‌ সিন্‌জা বুলবুলি মস্তকস্‌।"

কথান্তর ঃ

রস্‌কস্‌ সিঙ্‌ড়া বুলবুলি মস্তক।

(৪১)

"আবু দশ কুড়ি নাড়ি ভুরি
চিংড়ি মাছের চরচরি
কে নিবে কত আনা
বলে দেও না।"

(সংগ্রহ ঃ ৩৯-৪১ নং ছড়া কুমারী নন্দিতা রায় (১৮), পশ্চিম শালবাড়ি, জলপাইগুড়ি)

(৪২)

'হাইস্প্রিং'
'ক্লাস থ্রি'
'একতালা বাই (ভাই) বল্টু।'
'ডবল ডবল দুই তালা।'

'আপনা মনি সপনা কাটে।'

'বাদল কি বট্‌কে
কানের দুল চট্‌কে
বাদলকি বট্‌কে।'

'কেড়েণ্ডার ফুল
কানের দুল
কেড়েণ্ডার ফুল।'

'ঐ যে হর
তলির বর
তলির তলে
চিকন মাটি
ডাডুম ডাডুম বাজে।'

'খটু বাড়ি যাব না
কাটা মাছ খাব না
কাটা মাছের গন্দ
হাই স্কুল বন্দ।'

'রঞ্জনা সরকার
গাছে ওটা দরকার
গাছ থেকে পড়ে গেলে
ওষুধের দরকার
ওষুধ নাই ঘরে
টাকা চুরি করে
সাতদিন পরে
জেল খেটে মরে।'

(সংগ্রহ ঃ শ্রীগোপেশচন্দ্র রায় (২৭), শালুগাড়া, জলপাইগুড়ি)

(৪৩)

একে ইন্দুর / দুইয়ে দাঁত
তিনে তেল্লি / চারে চোর
পাঁচে প্যাঁচা / ছয়ে ছুচ্চোর
সাতে শালিক / আটে আঁটি

নয়ে নাপিত / দশে ধোপা

এগারোয় অধিবাস / বারোয় বিয়া

তেরোয় বৌভাত / চোদ্দয় ( ) [সহবাস]

পনেরোয় পোয়াতি / ষোলোয় সাধ

সতের একছাওয়ার মাও / আঠারোয় দুই ছাওয়ার মাও

উনিশে অন্নপ্রাশন / কুড়িতে বুড়ি ইত্যাদি।

(সংগ্রহ ঃ শ্রী ধজেন রায় (৩৮), পূর্ব শালবাড়ি, জলপাইগুড়ি)

মন্ত্র

(১)

মলসূত্র ত্যাগে মন্ত্র —

বনরে বন সর্ রে সর্/তোর উপর পরেচে হর হরিয়া বজর/

খাও ধরতি হও পাশ / মুই নেও নিকাশ প্রকাশ।

(২)

স্নানান্তে তুলসী মন্ত্র

হেলেচিত্ দুলেচিত না করিস ভয়/তোমঞায় তুলসির পাত দিয়া/

মাগো কৃষ্ণ পূজা হয়।

(৩)

সন্ধ্যাবাতি দেওয়ার মন্ত্র

বেলা গেইল অষ্টকালে

ধেনু সন্ধাইল ঘরে

তোমঞার চরণে প্রভু

মোর ভবদণ্ডপতি।

(৪)

মাশান পূজার মন্ত্র

বার চাষ দিলেক গোঁসাই/ তের চাষ মুই কেন্ন।

বেছিয়া চাষ করলেক ভুঁই/ গোঁসাই বলে নারদ

শুন মোর কাথা / এক দন সইষা দে জমিতে

ফেলাইয়া গোঁসাই-র কাথায় নারদ সইর্ষা ফেলাইল/

কাটিয়া মারিয়া সইর্ষা গুনিয়া দিল/ সইষা নিয়া হাতত্ গুনিয়া/

পূবের দোষ দুষি আনিলেক ধরিয়া/এক কেনা সইষা দিল দক্ষিণক

নাগিয়া/দক্ষিণের দোষদুষি আনিলেক ধরিয়া।

(৫)

তেলপড়া মন্ত্র

ইজুজু, বি, জুজু ফ্যান্নার আসিল্ জিউ

মন্তে হাং-কিনু মনতে পাংকিনু

স্বপনের ত্যালেতে ফ্যান্নার জিউ বসানু।

(৬)

ভূত তাড়াবর মন্ত্র-সর্ষে পড়া

ছুচ্ মুচ্ ছুচিয়া তিত্তর জাতি/কুনঠে ছুচিয়া তোর উধোপতি/

বাপ তোর ধরম মাও তোর কালী/ তোর গভ্যে হইলেন মাসান/

শুন তোর জমের শিলুক/শুনেক কান পাতিয়া/ফ্যান্নার অষ্টাং দেহা

ছাড়িয়া/যা তুই কৈলাস নাগিয়া।

(সংগ্রহ ঃ ১- ৬ নম্বর মন্ত্র - শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়(৫৭), শিবমন্দির, দার্জিলিং)

(৭)

পেট ফুলে গেলে কিংবা স্বপ্নে খেলে

নুন নুন নুনিয়া সাগরে জন্মিলেক নুন

ওই নুন আনিলুং কিনিয়া

মাও দিলেক তুল দিয়া নাপিয়া

রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই দিলেক পুরিয়া

ঘাড়ে বসিল ঘরে বসিল

বত্রিশ লোমে লোমে বসিল।

এই পদ বড় ধায় মোর প্যাট ফোলা
দ্যাও দেবতা ভস্ম কর।

(৮)

বাহান ঝাড়া (বান)

হিরা হিরা পর্বত চিরা
দরিয়া নাসয় টান
আজি হইতে হিরা মোর
ধার হইল কম্পমান
এই হিরা মোর শরীলে নাগানি ঝাপানি
বেত বাহান কাটিয়া করিনু খান খান
উনে বাটে দারু দর্পন মহাদেবে খায়
জিহ্বার পাগলে ভস্ম হইয়া যায়।

(৯)

মুহিনী (মোহিনী)

মুহনি মুহনি গজমতি হার
হিন্দু মুহনি তুরুক মুহনি
এই মুহনি সার, এই মুহনি ফেলিয়া
দিলুক মুই রাজদরবার
কালাটারী বরণ বাঘ মোর সতে কিসের
রাগ তাপ মোর চ্যাটের গোরত থাক।

(১০)

তেল কষা

বারো হাত কাপড় তেরো হাত দষি
আয় ফন্যা তুই মুই একটে বসি।
তুই ছাগল মুই বাঘ সাথে।

তোর কিসের রাগ ধাপ তাপ
মোর চ্যাটের গোরে থাক।

(১১)

সভা বন্ধন

আগে ধূত পাছে ধূত মুই ফন্যা যানছে।
যম রাজার পুত। দাঁতের নিশি মুখের হাসি
চক্ষু দিলুং পাক। মোর ফন্যা দেখিয়া
সভার দশজন টুকটুক করিয়া থাক থাক।

(১২)

মিলন করা

নীল চুয়া নীল পানি ওইটে আছে মহারানী
মহারানীর হুকুমেতে জলের নোটা দিলুং মুখে
জল করে চিকমিকি জতা এই জল কষি
খায় মাছ মাংসের পিত
জলে এমনিতে আছরে যেমন ওইকোন করিয়া
ছাড়াছাড়ি না হবু কখনো।

(১৩)

মিলন করা

বিচ চুয়া বিচ পানি
বিস খায় দড়ি খান
সাপে ব্যাঙে জল খায়
ফেন্যা ফেন্যি মিলন হয়।

(১৪)

বাড়ি বন্ধন

অহক বন তহক বন

চৌচাকা বিছানা বন

বাড়ি বন ঘর বন দুয়ার বন

আকাশ বন পাতাল বন চোর বন শত্রু বন

যে চড়াবে ঘাও

শিবশিলা শম্ভু মাথায় মুছিবে দুই পাও।

(সংগ্রহ ঃ ৭-১৪ নম্বর মন্ত্র - শ্রীবিভূতিভূষণ রায় (৪৭), পশ্চিম শালবাড়ি, জলপাইগুড়ি)

(১৫)

গচিবুনা মন্ত্র /ভুঁই জোরা মন্ত্র

দহি দুগ্ধ ঘৃত্য চিনি নানা উপহার

ভোজন করিয়া প্রভু তুষ্ঠ কর মন

পান সুপারি দিসে প্রভু মুখ শুদ্ধির কারণ

আমের উখরাইল কেবা লক্ষ্মণে দিলেক গারি

তাকে দিয়া মুছিসে শ্রীবৃন্দাবনী।

(১৬)

দেহের জলকষা

আকাশ বান্ধং পাতাল বান্ধং আরো বান্ধং হাং

তিনকোণ পৃথিবী বান্ধং কালিমায়ের মাং

কালি মায়ের ট্যাংগালী জলকষা মোর

ফন্যার জলকষা ধর্মজ পেজল ব্রম্মা জপে পানি

এই জলকষা খায়া মোর ফন্যার আপন বিঘিনি

কুমন্ত্রনি দেহের বাহন ক্লীং কৃষ্ণ সহায়।

(১৭)

বাড়িবন

চোর চক্রবর্তী যে চোর আইসে তার মাথা কাটি
দুয়ার আগে বাঁশ চোর বিদ্যা সর্বনাশা
ঘরের পাছে মানা চোর হইল কানা
সারারাতি ইচিরা আরো সারা রাতি বিচিরা
থাক থাক আটিয়া কলায় জাগিয়া থাক
যদি মহাপ্রভুর সেবা করিয়া বিহানে উঠিয়া
মারিনু তিনচড় তেমনি পাবে বাড়ির খবর
দোহাই ধর্মের ফন্যার বাড়িঘর করিনু বন্ধন।

(১৮)

দেহা বিষের মন্ত্র

উদাই মাধাই পর্বত বিষের অধিপতি
নাজানি বিদ্রুণ গুণ জাতি
ঘর না হইতে মায় কত দন্ত
ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় সাত ভাই ছাতুয়া এই বিষ যায়
কঙ্করা বোঝাই পড়িসে দুনিয়া হর বিষ হর
গদ্য আকারে ফন্যার দেহার বিষ মাটিতে ঝরি পর
কেশব কোন কোন সাপ জলেতেনামিয়া করলেক আহার
তার কামড়ে নাই নিশ্চয় হর বিষ হর নির্ঝর ঝর
গদ্যাকারে ফন্যার দেহার বিষ ঝরি পর
রামের ওঁং-কার ধর্মের ছিপ ছাড়ি যায় ফন্যার দেহার বিষ।

(১৯)

ভাণ্ডার শুদ্ধি

আন্ধারে চুলকিল ধন চ্যাটে চুলকিল মাং
শামুক শালা আসিল মৎস্য পান
ধানমাই ছিল পড়িয়া ছিল ধানতে
ধবলী শবলী ছিল শবলি গাইনাম
বান্ধ কোটি লক্ষ্মী তিপান্ন কোটি ধান
ধর্মে দিলেক টান
আং সাং মাং ধরিত্রী ছান্দি বান্ধ গোলা ছাম শুদ্ধি
ভাণ্ডার পূর্ণ শুদ্ধি।

(২০)

গাছ বাঁচা মন্ত্র

তুমি তো পরমেশ্বর ঋষি তুমি তো পরম ধন
অগতির গতি তুমি গতি নারায়ণ
মৃত্যুর মুখে দেবদেবতা আকাল তো ছাড়ি চলিছিস।
নেলোমধ্য ধন/আদি ধিত্য কালি ধিত্য ধিত্য হরির নাম
জিয়ারে তুলিছে জিয়াত্মা আং সাং মাং
আয়ানা ওয়ালা রাধা বিসমাল্লা হাজার হাজার
ওঁ কৃষ্ণ জিও কৃষ্ণ জিও সীতার নামে শিবমরা
নাই পর্বত দিয়া গেল ধিত্যাং ধিত্যাং জিও রাইপার্বতী
কৃষ্ণ ধিতাং রাম ধিতাং হর ধিতাং আদিকার ধিতাং
লক্ষ্মণ শক্তিশেল ধিতাং ওঁংকার ভংকার নির্ণয়
সতিকায় শিবশক্তি ব্রহ্মা সাবিত্রী লক্ষ্মী আদ্যদেব ধিতাং
হরচন্দ্র কাল ত্বং সিদ্ধ মাতাল হরে কৃষ্ণ রামের পিতা
হরে কৃষ্ণ ওঁং কৃষ্ণ আইসেন তো বইসেন তো শুইছেন তো
মহাদেব জি কৃষ্ণ জি বিষ্ণু বিষ্ণু বিষ্ণু জিও জিও

বিষ্ণু বিষ্ণু আদ্যি শুকান গাছ জিয়া
হ্রীং ব্রীং ক্রীং।

(সংগ্রহ ঃ ১৫-২০ নম্বর মন্ত্র - শ্রীকেনাপ্রসাদ রায় (১১০), দেউনিয়া পাড়া, জলপাইগুড়ি)

(২১)

ফাল লাগা মন্ত্র ঃ

'ধনন্তীর বরে বনরীয়া নামাও মৈ
ফাল লাগা বিষ
হর বিটং হর পদ্মার হুংকারে বিষ
নামিয়া পর।'

(২২)

কাকতাড়ুয়া মন্ত্র

জাগি জাগি জাগি
যেই কামের কাম
সেই কামতে নাগিস।

(সংগ্রহ ঃ ২১-২২ শ্রী দয়ালচন্দ্র রায় (৫৭), দেউনিয়াপাড়া, জলপাইগুড়ি)

(২৩)

যখ-যখিনীর মন্ত্র ঃ

যখিনীর উদ্দেশে ঃ

যখা না জখিনী মাও
শিগ্‌গির করি বাড়ি যাও
শাল খুটার শিমলার নাও
ছাওনি, ধাংড়ানি।
ধুলধুল ধুলেশ্বরী
ক্যানে থাকিস মাও

যখার উদ্দেশ্যে ঃ

টোটো ম্যাগো যখা শালা
তোর বড় ফুটানি
ছুয়া ঘরোত সোন্দহিস তুই
খুচিমুচি করি।
রামের বান সীতার বর
আজি থাকি ছাওয়াক

ছাইন্‌চাত পড়ি তুই অমর কর।
রামের বান গীতার বর
আজি থাকি ছাওয়াক তুই
অমর কর।

(সংগ্রহঃ শ্রীরমণীমোহন বর্মা (৭০), দিনহাটা, কুচবিহার)

ধাঁধা

(১)

বুক ধল ধল বিচন কালা
মুখ নাইতে বলে ভালা
চোখ নাইতে যায় কুচবিহার জেলা। উঃ চিঠি।

(২)

জল নাই খালে বিলে
জল যায়া আছে গাছের ডালে। উঃ ডাব।

(৩)

জলে জন্ম স্থলে কর্ম
মালাকারে গড়ে
ঠাকুর না হয় ঠুকুর না হয়
মাথায় উপরে চড়ে। উঃ শোলা।

(৪)

মুখ দিয়া পাড়ে ডিম
পুকটি দিয়া হয় বাচ্চা। উঃ কলাগাছ।

(৫)

এ কথার নাই মাথা

ব্যাঙে দইচুড়া খায়

বাপের বিয়াও না হইতে

বেটায় বৈরাত যায়। উঃ কলাগাছ।

(সংগ্রহ ঃ ১-৫ শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় (৫৮), দেউনিয়াপাড়া, জলপাইগুড়ি)

(৬)

অড্ডিম পঙ্খি অফুলা শাক

কোন জীবটার আঠারটা নাক। উঃ বাদুর, ঢেঁকিয়া, টাকি মাছ।

(৭)

ভ্যাঙ্গেলাৎ ভুঙ্গুলু নাচে

তোমার বাড়ি কয়টা আছে। উঃ ছামগাহান।

(৮)

কাষ্ঠের ওষ্ঠ ছাড়া

পাঠার ছাড়া পা

লবঙ্গের বঙ্গ ছাড়া

কিনিয়া আনিবেন তা। উঃ কাঁঠাল।

(৯)

উঠিতে যাং যাং বসিতে পাহাড়

লক্ষ লক্ষ জীব মারে না করে আহার। উঃ জাল।

(১০)

খনাতে ঢুকাও ফনীতে দেও গিটো

পাঁচ হাত জীবটা তৈয়ার করতে নাগে চাইরশ গ্রাম সুতো। উঃ জাল।

(১১)

বগ বগ বগিলা ঠক ঠক ঠগিলা

চাইর মাথা বারো ঠ্যাং

কাহা দেখিলা উঃ গাই-ছ্যাকা/গরুর দুধ দোয়ানো।

(১২)

মাথায় টুপি প্যাটে আগুন জ্বলে

সময় সময় ছিপ্পি গুচুর গুচুর করে। উঃ হ্যাজাক।

(সংগ্রহ ঃ ৬-১২ নং ধাঁধা শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায় (৪৫), দেউনিয়াপাড়া, জলপাইগুড়ি)

(১৩)

তিরিত করিয়া দুইহাত দিয়া ধরিয়া

গুচুর গুচুর করিয়া কাজ কিনা হইল।

ঘর ডুবিয়া থুইল। উঃ সাইকেল।

(১৪)

এক ঘরের এক পই

বুঝি দেরে বাপই। উঃ ছাতা।

(১৫)

কেহনা রাখে সর্বদা জীবশয়

মরিলে নেয় আমায় দেবেরই পূজায়

রমণী সহকারে থাকি আমি সঙ্গিনী হইয়া

পতি অস্ত্র ধরা মাত্র আমারে তাড়ায়

বল দেখি কে আমি জন্ম কোথায়। উঃ শঙ্খ।

(১৬)

ঘর ছোবা যায় মাঝিয়া নিগাল চোরে

সাত সমুদ্র তিষ্ণায় মরে ব্রহ্মায় মরে জ্বরে। উঃ দেহ।

(১৭)

কাটো গুয়া খাও পান
স্বামী স্ত্রীর বাইশটা কান। উঃ রাবণ-মন্দোধরী।

(১৮)

প্রশ্ন ঃ

নালনীল রক্তবরণ চাইরটা চক্ষু চোদ্দচরণ
যাইতে জম্বু আসতে শম্ভু
খাইতে মধুমধু করে
ভাইগ্যে থাকিলে একদিন দেখা হইতে পারে।

জবাব ঃ

তোমার বাড়ি পান বাড়ি আমার বাড়ি দুরামারি
মধ্যে আছে জলঢাকা নদী
দিঘি থাকি উঠিল বাঁশ বাড়ি থাকি বাইর হইল
উইটে নাগিসে মারামারি। উঃ কাঁকড়া-গুঁইসাপ।

(১৯)

বিশ্বকর্মার সৃষ্টি সে
প্রাণী হিংসা করে
নাভী তার টান দিলে
বিশ্রাম ডাক ছাড়ে। উঃ বন্দুক।

(২০)

হাট গেলেন তোমরা পাইসা দিলি হামরা
হামার জন্য কিনি আনেন সাততরল চামেরা। উঃ পিঁয়াজ।

(২১)

মধ্যনদী ফেলাইনু ছাই
দৌড়ি আসিল কালাগাই। উঃ জোঁক।

(২২)

একভাই সাগরোত
এক াই নাগরোত
একভাই টিং টিং আগালোত। উঃ পান সুপারী চুন।

(সংগ্রহ ঃ ১৩-২২ নং ধাঁধা শ্রীমতী সাবলি রায় (২৫), দেউনিয়াপাড়া, জলপাইগুড়ি)

(২৩)

এত্তি গেলুং ওত্তি গেলুং
গেলুং মরারঘাট
এক্কে নিকাস আসি দেখং
একে কানা দাঁত। উঃ গোছা বাতি।

(২৪)

হাতির মতন গণ্ডারটা
খাইতে খাইতে এত্তনা। উঃ খড়ের গাদা।

(২৫)

প্রশ্ন ঃ

পাতা চিল চিল পাতা চিল চিল
ফলে ধরে কাঁটা
মধুর রসে খায় বিচি গোটা গোটা
হাট্টিমাটিম টিম
এই কথার জবাব না পাইলে
পাছাত মরিচ ভাঙ্গি দিম।

জবাব ঃ

দারাং দিরিং হারাং হিরিং
সর্বগায়ে সিং
ভগবানে দিসে মধ্যে একখান লিং
ভালমানুষের ছাওয়া হইলে সুমসাম করিয়া খায়
গেদেরি মানষির ছাওয়া হইলে নেড়ফেড়া লাগায়। উঃ কাঁঠাল।

কথান্তর ঃ

একনা বাপই
সারা গায় অঠোই। উঃ কাঁঠাল।

(২৬)

চৈতে মাথে টুপি
দ্বাপরে মজাইল গুপি
রাবণ মৈল রামের হাতে
সেই তরকারি আমরা পাতে। উঃ বাঁশ।

(২৭)

হাট গেলেন তোমরা পাইসা দিলি হামরা
কুনলা জিনিস দরকার কিনিয়া আনেন তোমরা। উঃ কুলা

(২৮)

পাপিষ্ঠ মাথাটা
দুই হাত কুড়ি আঙ্গুল তার নাকটা
চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাই
এইটা কোন জীব মোক বুঝি দেবে ভাই। উঃ মানুষ।

(২৯)

দেখিতে শুনিতে সুন্দরী কইন্যা
নাড়লে কাড়ে আও
ছাওয়াটা তার নৃত্য করে
গান গায় উয়ার মাও। উঃ গরুর গলার ঘন্টা।

(৩০)

খুঁজিয়া খাই কারো দুয়ারে যাই না
চুরি করি কিন্তু কারো অন্যায় করি না। উঃ ঈশ্বর।

(৩১)

মরাটা মরিয়া আছে
করিয়া যাছে আও
মরাটাক যায় নিগাছে
তার নাই হাত পাও। উঃ সাপ-ব্যাঙ।

(৩২)

কাঠের গাই মাটির বাছুর
দুধ পড়ে টাপার টুপুর। উঃ খেজুর গাছের রস ও হাঁড়ি।

(সংগ্রহ ঃ ২৩-৩২ নং ধাঁধা শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (৫৫), দেউনিয়াপাড়া, জলপাইগুড়ি)

(৩৩)

পাণি পাণি ঘুরে বটে নয় পানিমাছ
তাল নাম ধরে সে নয় কোন গাছ
পৈতা আছে গলায় নয় ব্রাহ্মণের সূত
ডাং দিলে কথা কয় এ বড় অদ্ভুত। উঃ করতাল।

(৩৪)

চিকা চিকা ভুঁইনিকা

তিন পুটকি ছয় চৌকা। উঃ গাইছ্যাকা।

(৩৫)

হাড়ের গরু চামের শিং

নড়া দিলে গরু নিন পারে না

নড়া দিলে গরু যাইবারই থাকে। উঃ শামুক।

(৩৬)

চার কলসি মধু ভরা

ঢাকনি ছাড়া উবুত করা। উঃ গরুর বাট।

(সংগ্রহ ঃ ৩৩-৩৬ নং ধাঁধা শ্রীভূপালচন্দ্র রায় (৫২), রাঙামাটি, কুচবিহার)

(৩৭)

এত্তি গেনু ওত্তি গেনু গেনু ধূপগুড়ির হাট

আপন চখু দিয়া দেখিনু ফলের উপর পাত।

উঃ আনারস।

(৩৮)

উপর থাকি পড়িল ঢ্যাপ

ঢ্যাপ কয় মোর প্যাট কাট।

উঃ সুপারি।

(৩৯)

বাঁচিলে এক মরিলে দুই

কাম কাজ করিয়া তুলিয়া থুই।

উঃ ঝিনুক।

(৪০)

ক দেখি ভাই ঘর কোণা আছে

তার দুয়োর কোণা নাই।

উঃ ডিম।

(৪১)

ধরিয়া উবুত করিয়া চিত

ভিতর গেইলে মন পিরীত। উঃ ভাত।

(সংগ্রহ ঃ ৩৭-৪১ নং ধাঁধা শ্রীহরকান্ত রায় (৬৫), পশ্চিম শালবাড়ি, জলপাইগুড়ি)

প্রবাদ-প্রবচন

(১)

চারের বাড়ির ধান

মল্লিক বাড়ির পান।

(২)

দুধের বাটি

হালুয়ার লাঠি।

(৩)

পূবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ

উত্তরে গুয়া দক্ষিণে ধুয়া।

(৪)

যায় না গাড়ে কচু

তায় আদত পশু

যায় না গাড়ে আদা

তায় দুনিয়ার গাধা।

(৫)

ভাদোর মাসিয়া ধান

শ্বশুর বাড়ির দান।

(৬)

আছে গরু না বোয়ায় হাল

তার দুঃখ চিরকাল।

(৭)

উজান ভুঁই যার ভাট্টি মাল্লি তার।

(৮)

ধান পান গাই

তিনটা হোলে কাহারো দুয়ারে না যাই।

(৯)

আগ চায়া বান্দে আলি

তায় খায় শোল বোয়ালি।

(সংগ্রহ ঃ ১-৯ নং প্রবাদ-প্রবচন শ্রীবিপিনচন্দ্র রায় (৬৫), পূর্ব শালবাড়ি, জলপাইগুড়ি)

(১০)

দই কিনো তার মাঝৎ খাল

কইনা জুড়ো তো তার মাও ভাল।

(১১)

দই ভাঙ্গিলে পানি

টাকা ভাঙ্গিলে হানি।

(১২)

নদীক না কইস আটো

নারীক না কইস খাটো।

(১৩)

সাওনের পাছিয়া বাও

তিল কালাই ফেলাও।

(১৪)

আষাঢ় আইসে ফাসার ফাসার

শাওন যায় ধায়া

ভাদোর মাসের তেরো দিন গেইলে

চাষা থাকে চায়-য়া।

কথান্তর ঃ

আষাঢ় আইসে ফাসার ফুসুর

শাওন যায় ধায়া

ভাদোর মাসের তেরো দিন যায়া

কিষ্যাণ নবে চায়া।

(১৫)

ভরসা নাই নদীর পারোত বাড়ি

ভরসা নাই গাবুর ব'সের আড়ি।

(১৬)

সাওনের বারো ভাদরের তেরো

এর মধ্যে যত পারো।

(সংগ্রহ ঃ ১০-১৬ নং প্রবাদ-প্রবচন শ্রীবাচ্চামোহন রায় (৭০), আমগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

(১৭)

পাঁচ চাষে ধান, বিনা চাষে পান

মূলার ভুঁই তুলা, তানকুর ভূঁই ধুলা।

(১৮)

এলুয়া ফুটিল আসিল্ বাইষ্যা
কাশিয়া ফুটিল গেইল বাইষ্যা।

(২১)

কালাইয়ের মধ্যে ঠাকুরী
সাগাইয়ের মধ্যে শাশুড়ি।

(২২)

খাবার জানলে ধানুয়া চুড়া
বসিবার জানলে মাটির পিড়া।

(সংগ্রহ ঃ ১৭-২২ নং প্রবাদ-প্রবচন শ্রীমহেশ বর্মণ (৮২), টাউরিকাটা, কুচবিহার)

(২৩)

ধান নাই
তার দোন্টা বড়।

(২৪)

ধানে ধন
কিছু ধন সোনা উপা
আর সবে পাতান।

(২৫)

মান্ষি মরে দো-আশাত
গরু মরে আইল ভাসাত।

(২৬)

সারে হয় তামাকের পাত

টাকায় হয় মান্‌ষির জাত।

(২৭)

আসিলেক মাইয়ার ভাই
কি খায় কি না খায়
আসিলেক ভাতারের ভাই
খাইল খাইল না খাইল না খাইল।

(২৮)

চাষা চিনে মঙ্গল বার
পুঁজিপাতি না নাগে আর।

(২৯)

খোর খোর চাষা
ওইলছে ধানের বাসা।

(৩০)

অমাবস্যা পূর্ণিমা যে বয় হাল
তার হয় সর্বনাশ।

(সংগ্রহ ঃ ২৩-৩০ নং প্রবাদ-প্রবচন শ্রীনগেন সর্দার (৯০), টাউরিকাটা, কুচবিহার)

হুদুমদেও-এর গান ঃ

(১)

'সিল সিলাইছে কমড়টা মোর
শির শিরাইছে মোর গাও
কুণ্ঠে কেনা গেইলে এলা
হুদমার দেখা পাও।
পাটানিখান পড়িছে খসিয়া
আইসেক রে হুদুমা দেও

কথান্তর ঃ

হিল হিলা কমড়টা মোর
শিরশিরাছে গাও
কুন্‌ঠে গেলে ওগে দিদি
হুদুমার দেখা পাও।
পাটানিকখান গেইলেকখসিয়া
আয়রে হুদুম দ্যাও

তোর বাদে মুই আছোরে বসিয়া	তোর বাদে মুই আছোরে বসিয়া
ডিংশালি ডিংশালি কমড়টা	ডিংশালি ডিংশালি কমড়টা
তাতে নাই মোর ভাতারটা	তাতে নাই মোর ভাতারটা
কর কি মুই কায় বা কয়	করো কি মুই কায় এ্যালা কয়
কোনটে গেইলে দেখা হয়	কোন্‌ঠে গেলে হুদমার দেখা পাও
দেখা হোলে দেহাটা জুড়ায়।'	দেখা হইলে দেহাটা জুড়াও।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীমতী বত্তেশ্বরী রায় (৬০), দুরামারি, জলপাইগুড়ি)

মেছেনী গান ঃ

(১)

আসিয়া নখনির মাও মোক
দুয়ারে দিলেক পাও
আগো বাড়ি শুদ্ধ কর
বিধু বাপ মাও
শুনগে দিদি ওগে ভাই
শ্বাশুড়ি রে অলম ঝলম
ননদীরে বোল
সহিতে না পারো মুই সতীনের বোল
গীত্তানি যে ধুইয়া দিসে চোখ করিয়া পীড়া
তাতে না বসিছে মেছেনি আসন
শরম না মানিয়া কৌটা ভরা সিদুর দিসে
দাড়ি ভরা ত্যাল
তাতে না পিন্দিয়া মেছেনী নাচে হ্যাধ্যালধ্যালে
শুনগে দিদিওগে ভাই।

(২)

"তিস্তা বুড়ির নামান গে হচে।
বড়য় হাউসালী।।
আলন্দে বরিয়া নেহ গে

দুমার পাঞ্চ কাহিনী।।
লক্ষ্মীর নামান গে হচে
বড়য় হাউসালী।।
ডাক লক্ষ্মীর নামান গে হচে
বড়য় হাউসালী।।
অখন লক্ষ্মীর নামান গে হচে
বড়য় হাউসালী।।"

(সংগ্রহ ঃ ১-২ নং মেছেনী গান শ্রীমতী বত্তেশ্বরী রায় (৬০), দক্ষিণ শালবাড়ি, জলপাইগুড়ি)

বিয়ার গান ঃ

(১)

সিদ্ ভাঙ্গিয়া আলুরে বরু, নীওর ভাঙ্গিয়া কোন দোষ, পায়া বরু জোকার দ্যাওরে আলু তোর বইনোক যদি আনলু হয়,বড় ঘরটা পালু হয়। (বউ)

তোলা মাটির কইল্লা হালিয়া দুলিয়া পাড়ে, বালির ভাইটা ছ্যাচরা কইল্লা চুরি করে, বরের ভাই তৌশিলদার কইল্লা হাজির করে। বরের খুড়া চৌকিদার থানায় নালিশ করে। (বরের)

কি দেখিস বরু (বর) তুই এই চাইলোনের ভিতি। এই চাইলোন চিতি বেইজে তোর বোইন ধাগরি।
উঃ আমার বোন ধাগরী তোমরা জানেন ক্যামনে, আমরা শুনছি ধাগরী আছে গোসানী হাটের মাঝে।

যেমন গাছের গুয়ার বাঁধা বাবা ঝাইরাবা ঝাইরাবা পড়ে, কায় আইছেন বরের ভাই ডুলির নকান প্যাট, তাতে ধরে একমন চাইলের ভাত। ডাইল ঘাটা নাকরি দিয়া ঘাটি ফেটাং তোর প্যাট।

বর বাড়ির হাটোতে বড় বড় মূলা, কায় আইসজে বরের বওনাই (ভগ্নীপতি), টোগুারা ফুলা। শনিবারে মঙ্গলবারে খাইস আটিয়া কলা, তোর টোগুরা খসি পজির ঝাড়া দুপুরবেলা।

একলা ক্যানে বরু, পন্থতে, ধানের পাতান ক্যানে উড়াইছে, তোমার দেশে বওনাই নাই, সঙ্গে

লইয়া ক্যানে আসেন নাই, আছে আছে ভওনাই, মাথাটায় নাই, তারে নজ্জায় বওনাই, আইসে নাই। তোমার দেশে কি টালা নাই, তবে মাথা বানে, ক্যানে আইসে নাই।

তুইয়ে না কতোয় তোর বাবারে দুলিলা, তুই গেইলে কতোয় তোর বাবার মন্দির হইবে খালি। তুই না কতোয় তোর বাবা কান্দে ধুলায় গইরদিয়া, তুই না কতোয় তোর মায়ের দুলালী, তোর মাও কাদে কতোয় তকতাৎ পড়িয়া।

বাচ্চা হাতে পুশিলুং ময়না দুধভাত খোয়া, যাবার সময় গেলু ময়না বুকে শ্যালো দিয়া।

(২)

চিন্তায় চিন্তায় হলুং সারা কায় আসিয়া
দ্যাকে রে বিয়াও না দে দয়ার
বাপে মায়ে ...।।
গাবুর বয়স মোর যায় গত হয়া ...
বন্ধুর কথা মনে ভাবং বসিয়া রে ...
এনা যৈবন চলিয়া গেইলে (২)
আর না পাবো ফিরি রে বিয়াও ...
দারুণ বিধি লেখিছে জোড়া ... কর্ম
দোষে কপাল পোড়া রে
কানা ঘোড়া ঘ্যাগা কুজা তারো জোড়া
মিলেরে বিয়াও ...বাপে মায়ে।।

(৩)

তুই মোর প্রাণের কালা তুই মোর গলার মালা
অসময় না বাজান রে বাঁশী ঘাটে বসিয়া ... ।।
যখন শুনং তোর বাঁশীর গান ...
আওলিয়া যায় মোর নারীর মন ওকি কালা রে
বাঁশীর সুরে মন উড়াং বাইড়াং করে

ঐ বাঁশীরই মধুর সুরে ...

নারীর মন মোর না রয় ঘরে রে

কালারে ... বাঁশীর সুরে সুরে মনে মোর উড়াং বাইড়াং

করে ...

(সংগ্রহ ঃ ১-৩ নম্বর গান - মামনী বর্মণ (৩০), গোসানিমারী, কুচবিহার।)

ভাঁঝ ছাওয়ানির গীত (অন্নপ্রাশন)

(১)

বিছানা আটো, বালিশ খাটো, তুই কালা মোর মনের মতো, তুই কালা মোর আউলা মাতার ক্যাশ, আইলের মাথাৎ বাঁশি থুইয়া কালায় মারে মাছ, তুই কালা মোর অউলা মাথার ক্যাশ (চুল)

(সংগ্রহ ঃ মামনী বর্মণ (৩০), গোসানিমারী, কুচবিহার।)

আসর বন্দনা গান

(১)

আমি জনম কাঙাল ওই কারণ দীন ভিখারী

গৌর হে।

আমার মরণ কালে স্মরণ দিও গৌর হে

ওই কারণ দীন ভিখারী গৌর

আমি হইলাম কাঙাল।

তোমায় সবে বলে পতিত পাবন গৌর হে

ওই কারণ দীন ভিখারী গৌর

আমি জনম কাঙাল ওই কারণ দীন ভিখারী গৌর হে

আমি সাধন ভজন নাহি জানি গৌর হে

ওই কারণ ভিখারীরে গৌর

আমি তো হইলাম কাঙাল।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীসুষেণ রায় (৪০), দুরামারি, জলপাইগুড়ি)

মাছের বিয়াও

(১)

দীঘিতে সরোবর দীঘির শোভা ফুল
বামনের পৈতা শোভা নারীর শোভা চুল।
মাগুর মাছ মাইলানী হয়্যা নিল ফুলের সাজি
চান্দা চাইলোন বাতিটা হেলাইছে আজি।
কইয়া মাছটি সন্ধ্যা হইয়া জ্বালিয়া দিল বাতি।
বোয়াল মাছে বামন হয়্যা প্যাট পুরাইল
বামনি মাছে নাওয়া হয়্যা মাথা কামাইল।
ওরে সাটিমাছে ওঠিয়া কয় শোল মোরে ভাই
চলচল বালিয়া রাজার চল বৈরাত যাই।
শোল মাছে সিন্দুর দিলে কে পায় না পায়
শামুকের বাহেরা টেপা পেট দুলিয়া যায়।
দুরি মাছ উঠিয়া বলে গচি মোরে ভাই
চলচল টেপাশালার প্যাট ফাড়িবার যাই
চ্যাং বড় নঠুয়া রে ভাই নঠ বড়িবার জানে
চ্যাং এর নাচন দেখিয়া ফেকা মুখ মেলিয়া হাসে,
পানি মাছের চারটা ঠ্যাং ঠ্যাং মেলি দিল
কুচিয়া মাছে বেরুয়া বাইন্ধ্যা পানসি সাজাইল
খাটা মাছের লম্বা ঠোঁট ঠোঁটে পালকি নিল
সংক্ষেপেতে মাছের গান খান সাড়া হয়্যা গেল।

(সংগ্রহঃ শ্রীসুষেণ রায় (৪০), দুরামারি, জলপাইগুড়ি)

ডাংগুয়া গান

(১)

ওরে ধনীয়ারীর ঢক দেখিয়া সন্ধ্যানু ডাংগুয়া
জমি পানু টিনের বাড়ি নাম হৈলেক দেউনিয়া
তৈয়ার বেটার বাপ হনু বায় না ডেকায় বাপ করি

কাম কাজ না কর এলা মুই বেড়াও ঘুরিফিরি
আছিনু দুখিয়া এলা মুই হনুরে দেউনিয়া
বড়ই সুখে দিন যাছে মোর প্রজায় পালি দিয়া
সকালে উঠিয়া হালুয়াক হাল নিগিবার কয়্যা পজ্জা পাড়া যাও সেলা মুই হগ তালাস করিবার
মুখ দেখিয়া নয়ানয়া পজ্জার যত মাইয়্যা
চটি পারিয়া দেয় সেলা মোক হাউউদাস করিয়া
ঢক দেখিয়া পজ্জা গিলাক বগলোতে ডাকিয়া
গাও সাত্তিয়া করনু দাড়ি দুইটা চুল দেই উখরিয়া
খাতির করে কথাও ধরে মানে মোক সগায়
মুইও চালাও হুসির মুসকিল যায় দেখি না চায়
চা খাইতে গুয়া খাইতে হয়্যা যায় বেলা
আসিবে হালুয়া মাইকে কামের ঝামেলা
বাড়ি আসিলে ডাংগুয়ানী কয় গাও ধোও আসিয়া।
তোলা জলে ত্যাল মাখিয়া গাও ধোও সাবান দিয়া।
ভাত তরকারি মাছের ঝোল দই ও দুধ পায়্যা
খায়্যা দায়্যা সেলা মুই ছেওয়্যা খুজং যায়্যা
পান বিড়ি দিয়া ডাংগুয়া বগলোত বসিয়া
আস্তে ধীরে দেহাটা মোর দেয় টিপিয়া
আস্তে ধীরে দেহা মোর দেয় টিপিয়া ওদিয়া যাও নিদ।
বড়ই সুখের কপাল খান মোর ভালয় যাছে দিন।
এদিকে ঢকোর বেটা বায় হয়্যা যায় গাবুর
মোর নগদ কোন্দল করে এ্যায় বড় চতুর
মারি ধরিম সদায় কয় চোদন গজন ছাড়ে
বাড়ি হতে বিরিবার কয় ইয়্যায় কেমন বাড়ে
ঢকুর বেটার কাথা শুনিয়া ডাংগুয়ানী ডেকিয়া কও মুই
মোর গতি কি হইবে কোঠে গেলা তুই
মোর কাথা শুনিয়া ডাংগুয়ানী ডাঙ্গি ছিড়িয়া কয়
না নাগে মোর ভাতার এলা চলিয়া গেলে হয়।

(সংগ্রহঃ শ্রীসুষেণ রায় (৪০), দুরামারি, জলপাইগুড়ি)

চোরচুন্নী গান ঃ

(১)

এলা হঠাৎ করিয়া আও করছি কোনটে তোমার বাড়িঘর
ওরে চিনা জানা দিয়া আগে পরে আলাপ কর
আর কোন বা চোরের বেটা তুমিরে
ওবা কিবা তোমার নাম
ওরে - কি চুরি করেন তোমরা দিবেন পরিচয়।
এলা - হঠাৎ করিয়া আও করছি কোনঠে তোমার বাড়িঘর
ওরে - চিনা জানা দিয়া আগে পরে আলাপ কর।
ওরে - তারপরে জিজ্ঞাসা করেন কোন বাথানে বাড়ি
ওরে - বাগানী না নারীচুরা
ধনচুরা না মনচুরা জবাব দে তাড়াতাড়ি
এলা - হঠাৎ করিয়া আও করছি কোনঠে তোমার বাড়িঘর
ওরে - চিনা জানা দিয়া আগে পরে আলাপ কর।
এলা - কিবা কব দুঃখের কথা বুক যাছে মোর ভাঙ্গিয়া
আ ওরে - কারাগারে বন্দী আছে মোর পিতা মাতা
আর - বাসুদেব মোররে পিতা ও মোর দৈবকি মাতা
ওরে - মথুরাতে জন্ম আমার শুনেন ঘটনা
মোর মামা কংস রাজা।
ওরে - কংসের ভয়ে পিতা মোর রেখে এলেন নন্দালয়ে
যশোদা মায়ের কোলে পালন হইলাম ওইঠেটা
পালন পিতা মাতা হইল নন্দযশোদা
এলা - কিবা কব দুঃখের কথা বুক যাছে মোর ভাঙ্গিয়া
আ ওরে- কারাগারে বন্দী আছে মোর পিতা-মাতা।
আর এলায় খেলায় খেলায় তোমার বাড়ি
ও মুই বেড়াবার যে যাও।
ওরে কোন কথাতে গোঁসা হয়্যা মোক না করেন আও
কোন দিকে যে যাও দিশাই না যে পাও

ওরে দধি দুগ্ধ মাথায় করি ঘাট পারেতে কতই নারী
মুই কাণ্ডারী করি যুগে পার
ওরে চিনা মানষি হাত ধরিছে গোসা না হইস আর।
এলা কিবা কব দুঃখের কথা বুক যাছে মোর ভাঙ্গিয়া
আ ওরে কারাগারে বন্দী আছে মোর পিতা মাতা।

(সংগ্রহঃ শ্রীসুষেণ রায় (৪০) ও সম্প্রদায়, দুরামারি, জলপাইগুড়ি)

(২)
ও আই মোক দিলেন কি দেখি
মোর কপালে মিলিল চোরা সোয়ামী এক।।
আগ পাছ না দেখিলেন;
আই পাশ পড়শী না পুছিলেন।।
চোর যাছে চুরি করির
মোক নাগেছে জিগির জিগির
ক্যামনে পোহাইম আই আন্ধার আতি।

(৩)
আজি আন্ধার আতি যাছিৎ ভেলা কুত্তি চুরি করিবার।
ওকি ও চরারে, ও তুই চুরি করা ছাড়েক ছাড়,
কিষ্যিকাম করিবার ধর,
য্যামন হইছে পাটার দর, ধরেক হাল বাবার।

(সংগ্রহঃ ২-৩ নং গান শ্রী বিশ্বজিৎ রায় (২৭), জোড়াপানী, জলপাইগুড়ি)

গমীরা গান ঃ

(১)
ও আই টাকার লোভে বুড়াক দিলেন
আর মুলুকত বর নাই পালেন
মোকে কি সগায় যে বুড়ি আই
সগায় কছে জেঠাই খুড়াই

কাহো কছে বুড়ি আই বুড়ি আই
নদারী করার গে মান্‌ষি নাই
ও আই সাজি বুড়ি গুয়া পান
ও বুড়া বরের ফেদেলান
গুয়া ভুকাইতে যাবে জান।
হামরা হলাম চাষি মান্‌ষি
যে বুলাইছে সেই বুইল্যাছি
আইয়াছে ভোটের পালে
খ্যায়া খ্যায়া দিনু কাঁচা কলা।

(২)
লক্ষ্মী পাঁচালী শুন হে
গর্ভবতী নারী
পুত্রখানি হলে হয়
ধনের অধিকারী
কইন্যা খানি হলে হয়
রাজ পাটেশ্বরী
তেউরি আতা তেউরি পাতা
তেউড়ি আমূল মূল
তাহার ফর ফুল ফুটিয়ে বেয়াল্লিসা ফুল
ধলো ধলো ফুল দিয়া
শিবের পূজা হইল।

(সংগ্রহ ঃ ১-২ নং গান শ্রীপ্রেমানন্দ রায় (৪২), জলপাইগুড়ি)

বাঁশ পূজার গান ঃ

(১)

জয় বন্দং জয় বন্দং জয় বন্দং রাম
জয় দিয়া বান্দিয়া কং আনন্দ ধরম।
উপজিল মদনঠাকুর হাতে সুন্দি ফুল

হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম পদ্ম নভোস্থল।
সুবর্ণের পাছরা মদন গায়ের উরণ
বারো শত দেবতা নিয়া বসিল দেওয়ান।
বারো মাসে বারো তীর্থ নিল তো বাটিয়া
চৈত্র মাস না নিল কেহ্ বড় আকালিয়া।
যদিরে মদন ঠাকুর এ নাম বাড়াং
আশিকালিয়া বুড়া মুই তিন ঝাপ ঝাপাং।
কলিত্ উপজিল মালীর ছাওয়া না জানে ডাইন বাম
বাপ মায়ে বাছিয়া থুইল মালা গিরি নাম।
তোক্ বলোং ওরে বাছা, মালা গিরি বর
পৃথিবীতে বাঁশ নাই তুই বাঁশ সৃজন কর।
কতেক দূর যায়য়া মালা আরো দূর যায়
আর কতেক দূর যায়য়া মালা ব্রহ্মার লাগ পায়।
ব্রহ্মার সেবা করে মালা ভিজা বস্ত্র লইয়া
মালার সেবা দেখিয়া ব্রহ্মার মনে হইল দয়া।
এত্তি চাপি বইস্ মালা এত্তি চাপি বইস্
কি কারণে করিস সেবা স্বরূপ করিয়া কইস্।
সুন্দর সুঠাম তনু মদন গোপাল
চৈত্র মাস আকালিয়া যার হৈল ছাওয়াল।
এ তিন ভুবনে প্রভু বাঁশের পুলি নাই
তে কারণে মদন গোঁসাই পাইাইল তোমার ঠাঁই।
তোক্ বলোং ওরে বাছা মালা গিরি বর।
মোর সেবা ছাড়িয়া তুই বিষ্ণুর সেবা কর।
অথাও দরিয়ার পানী সেও থাও হইল
নানা জাতি বাঁশের পুলি পাইতে লাগিল।
ইরু বাঁশ, বিরু বাঁশ তুলিল বিস্তর
মাকলা বড়ো বাঁশ তুলি সাজাইল ভার।
ভার সাজাইল মালা গিরি আনন্দিত মন

আপোনার বাড়ি বুলি করিল গমন।
মালা গিরি খোঁড়ে গাত্ মদন কামে রোয়
বাঁশ নিয়া মদন গোঁসাই সারি সারি বসায়।
কি কারণে হে কিষাণ নিশ্চিন্তে বসিয়া
টারি চায়া বাঙ্গার খেত কিষাণ করো যায়া।
ভাদর মাসে ঘোর রৈদে বাঙ্গার চক্র ফুটে।
তাক্ দেখিয়া কিষাণের বেটার মুখের হাসি ফোটে
কেরকেয়া ধুনিয়া বাঙ্গার গড়েয়া নিল পাইজ
এক সূতা ছাড়িয়া দিল আটিয়া কলার মাইজ।
মথুরার হাটত্ সূতা নিয়া বেড়ায় বেচেয়া
জোলা সব দেখিয়া সূতা নিল তো কিনিয়া।
সূতা পায়া জোলা সব আনন্দিত মন
আপোনার বাড়ি বুলি করিল গমন।
কি করিস রে জোলানি তুই নিশ্চিন্তে বসিয়া।
সব চরকি ধরি শীঘ্র টানা খসাও আসিয়া।
দৈর্ঘ্যে দিল পঁচিশ হাত প্রস্থে কম দিল
বাঁশের মুখোত্ কাপড় নিয়া বেড়ায় বেচেয়া
বাশুয়ায় দেখিয়া কাপড় নিল তো কিনিয়া।
তোক্ বলোং ওরে বাছা মালা গিরি বর
ঝরি পরি গেইল আশিন কাতি পূজার জাগা কর।
এক কুড়াল কান্ধে লইয়া গিরি গেল ধায়া
কথা শুনিল মালা গিরি না থাকিল রয়া।
ইরু বাঁশের গোড়ত্ মালা ভিরিয়া দিল পাও
ইরু বাঁশ তেতেক্ষণে চেঁচেয়া করে রাও
খাটো খাটো পোর মোর তরল তরল গাও
মুই তো সহিতে নাপাং শ্বেত চঙোরে বাও।
বিরু বাঁশের গোরত্ মালা ভিরিয়া দিল পাও।
বিরু বাঁশও শবার নাপায় শ্বেত চঙোরের বাও।

মাকলা বাঁশ উঠিয়া বলে মুই বড় বীর
মোর উপরত্ করিচে ভর আশি হাজার পীর।
বড় বাঁশ উঠিয়া তখন মালাক করিল রাও।
খাটো খাটো পোর মোর ভারি ভারি গাও।
কথা শুনি মালা গিরি বাঁশের দিকে চায়
কান্ধে কুড়াল ধরিয়া মালা গোড়ত্ ছেও দেয়।
গোরখান্ ছেদিল বাঁশের আগাল ঢুলিল
হরি হরি বলিয়া বাঁশ ভূমিতে পড়িল।
গোড়খান ফেলাইল বাঁশের গুড়ুয়া বলিয়া
আগালখান ফেলাইল বাঁশের আগালি বলিয়া
ব্রহ্মার ঝালত্ বাঁশের গাও করিল ঠারু
সুবর্ণের কাটারি দিয়া গাইট করিল সরু।
নদীত্ ফ্যালেয়া বাঁশক্ আনিলেক ধুইয়া
গাভী দুগ্ধে গঙ্গার জল নিল সিনান করিয়া।
বাঁশের আগালে বান্ধে হাড়িয়া চঙোর
তাহার উপরে বান্ধে ধবল বস্তর।
আম ডালি দিয়া বান্ধে গুয়া একজোড়
তারে পাছে কি করিল মালা গিরি বর।
সুবর্ণের পাছরা আনি দিল ফোটা মালা
হরি হরি বলিয়া বাঁশক তুলিল খেলেয়া।
তোক বলোং ওরে বাছা মালা গিরি বর
বাঁশ তুলিলু ভালে করিলু ঘটের খবর কর।
কথা শুনি বুড়া কুমার না থাকিল রয়া।
মদন কামের পূজার ঘট দিল তো গড়েয়া।
তোক বলোং ওরে বাছা মালা গিরিবর
ঘট আনিলু ভালে করিলু, বাইজের খবর কর।
কি করেনরে বাজনি ভাই নিশ্চিন্তে বসিয়া
মদন কামের বাঁশ তুলিছং বাইজ বাজান আসিয়া।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীবিজয়চন্দ্র রায় (৬০), গাদং, নতুনবাজার, জলপাইগুড়ি)

(২)

আইসো আইসো ওগো মা আইসো আমার ঘরে
এরূপ যৈবন দিব মা গোবিন্দের চরণে।
সোনা শোভে, রূপা শোভে মা আর শোভে বালা
কপালে তিলক শোভে মা গলে বনমালা।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত রায় (৩৮), গকুলনগর, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি)

হাইচাও গান ঃ

(১)

বল ভাই সুবে -
ভাইরে ঘর থাকিয়া
বিড়াইল হুলু। মাথাৎ নাগিল চাল।
কাইসাও বাঙকা, নিয়া হলুর। খ্যাড় কাটি বেড়ায়
খ্যাড় কাটি এলুয়া কাটি
আর কাটে কাশিয়া
একথুপ বিন্দার তলত জিরায়ও বসিয়া
এদি আসি ভাণ্ডি শালা, ধরিছে ঠাসিয়া
হুড়াগুড়ি জুড়াজুড়ি বেলা একদুপুর
তবুও তো না আইসে হলুর বাড়ির খবর।
ভীষণ যুদ্ধ লাগিল ভাইরে
সিংহ মারা গেল।
ওহে ঠাকুর গোর্খনাথ তুমি ভাল কর
গোর্খনাথের ধান দেবে উপরে সিঁদুর
তাহইলে কৃপা করবে গোর্খনাথ ঠাকুর।
বল ভাই সুবে।

(সংগ্রহ ঃ মহিন্দ্র চন্দ্র রায় (৫১), রাঙ্গামাটি, শিবপুর, কুচবিহার)

গোরক্ষনাথের পাঁচালী ঃ

(১)

বন্দনা যে করি মাগো বন্দনা যে করি
মা ভগবতী জন্ম নিল গাভীরূপ ধরি
গোবর ফেলাইতে যে গো করে ঘিন ঘিন
তার গোয়াইলের গরু মাগো বাঁচে আড়াইদিন
গোবর ফেলাইতে যে বা ফেলি যায়রে চেনা
তার গোয়ালের গরুর মাগো মুখে উঠে ফেনা
কলা খেয়ে কলার চোচা গোয়ালেতে দেয়
তার গোয়ালের গরুর মাগো মুখে খুড়ে পোকা নেগে যায়
শনি বারে মঙ্গলবারে হলুদ বিলায়
তার ঘরের লক্ষী মাগো ছাড়িয়া পালায়
ওহে ঠাকুর গোর্খনাথ যথায় গিয়ে বস
ধনে বংশে বাড়ুক গিরি সুখে করুক বাস।

(সংগ্রহ ঃ ভূপালচন্দ্র রায় (৫২), রাঙ্গামাটি, শিবপুর, কুচবিহার)

ব্যাঙের বড়াই ঃ

(১)

ব্যাঙ কয় লঙ্কাতে যাব
আমি ঝম্প দিয়ে লঙ্কা গিয়ে রাবণ মেরে রাজা হব
ব্যাঙে কয় লঙ্কাতে যাব
শুনিয়া বলে খেঁকশিয়ালী আমি থাকি আলি আলিগো
আমি কংসের জঙ্গলে গিয়া সিংহ মেরে রাজা হব
এবারে শুনিয়া বলে টেপারে মাছে
আমার একটা বন্দুক আছে গো
কেহ আমার পেটে পারা দিলে
অ্যাটোম বোমের আওয়াজ দিব।

ব্যাঙে কয় লঙ্কাতে যাব

এবার কাঁকড়া বলে শুনরে শুনরে

কেনা জানে আমার গুণ গো

আমি দুহাতে মাটি তুলিয়া

রাঙামাটিতে দালান দিব

ব্যাঙে কয় লঙ্কাতে যাব

আমি ঝম্প দিয়া লঙ্কা গিয়া রাবণ মেরে রাজা হব

ব্যাঙে কয়

ও ব্যাঙে কয় লঙ্কাতে যাব।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীমহিমচন্দ্র বর্মণ (৫০), রাঙ্গামাটি, শিবপুর, কুচবিহার)

ক্ষেপা গান ঃ

(১)

ওরে ভাবিয়া দেখ রে মন

কেহ্ কারো নয় দুটি নয়ন মুঞ্জিলে অন্ধকার

যেমন কাথাও হয় কথাও না হয়রে

কথার বড় দায় রে মন কথার বড় দায়

পিরিতি ভাঙ্গিয়া গেলে কেহ্ কারো নয়

দুটি নয়ন মুঞ্জিলে অন্ধকার।

ভাবিয়া দেখরে মন ... ।

যেমন সবার হালুয়া হাল বুয়ায়রে

মোর হালুয়া কইরে মন মোর হালুয়া কই

ওরে হালুয়া কইরে মন মোর হালুয়া কই

ওরে হালুয়া খাইলেক বনের বাঘে

শিয়াল নিগাইল দুটি মই মনরে

যেমন বাঘের দুধ হরিণে আওটেরে

বিড়াল বসি জাগেরে মন বিড়াল বসি জাগে

সব দুধ মাকেড়া খাইল পিঁপড়ায় দেখি হাসেরে

নয়ন মুঞ্জিলে অন্ধকার।

ভাবিয়া দেখরে মন ...।

যেমন আমের গাছে বেল মনরে সজিনার গাছে বেল

টুনি পক্ষীর হাড় ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিল দুটি কুড়াল

ভাবিয়া দেখরে মন...

নয়ন মুঞ্জিলে অন্ধকার।

(সংগ্রহ ঃ ভুপালচন্দ্র রায় (৫২), রাঙ্গামাটি, শিবপুর, কুচবিহার)

লোক গান ঃ

(১)

ও মোর হালুয়া চাষী ভাই ও মোর দিনমজুরী ভাই

চল লাঙ্গল জোংগল ঘাড়ৎ লইয়া ক্ষেতৎ চলিয়া যাই।

আনন্দে ভাই বুয়াইব হাল ফসল হইবে ভাল

সুখে সুখে থাকিমু সবাই

হাল না বুলাইলে হামার বাঁচার উপায় নাই।

লাঙ্গল জোংগল ঘাড়ৎ লইয়া ক্ষেতৎ চলিয়া যাই।

নয়া খান আসিলে ঘরে খুশিতে ভাই মনটা ভরে

হাউসে হাউসে ক্ষেতৎ করিরে কাম

ওরে কর্ম ছাড়া জীবন ভাইরে সবারই সমান

কৃষক ভাইও মোর হালুয়া চাষী ভাই

লাঙ্গল জোংগাল ...।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীমহিমচন্দ্র বর্মণ (৫০), রাঙ্গামাটি, শিবপুর, কুচবিহার)

(২)

আসিল আগুন মাস পাকিল নয়া ধান

ধান কাটিয়া চিড়া ভুকি করিব নবান

ওরে গাই এর নয়া দই নয়া গাছের কলা

নয়া চাউলের মুড়ি দিয়া বানামু নবান।

ওরে নয়া সাগাই আসছে বাড়ি

আনছে দই এর ভাড়

মুড়ি মুড়কির টোপলাখান

দেখতে চিৎকার ওরে নয়া সাগাইনয়া আদর নয়া ধানের ভাত

পাতে পাতে দিমু আরো

মনভোগের প্রসাদ

নয়া চাউলের নয়া ভাত নয়া নাফা শাক

নয়া ঢেপা বাইগনের ভাজা খুয়াইমু সাগাইলাক

নয়া ধানের শীষ দেখিয়া নাচের হামার মন

নবান করি আজ পড়শিক করিব নিমন্ত্রণ।

আসিল আগুন মাস ...।

(৩)

হাল বুয়ান হাল হালুয়া বন্ধুরে

বন্ধু মাথা হেট করি

বাইরা খোলান বান্ধং খোঁপা

না দেখেন মুখ তুলি রে/হাল বুয়ান হাল হালুয়া বন্ধুরে।

গরু খেদান ধীরে ধীরে

লাঙ্গল ধরেন ঠাসি

গুনগুনানি গান শুনা যায়

দেখং মুখের হাসিরে

হাল বুয়ান হাল হালুয়া বন্ধুরে।

আলে ছলে যায়া বন্ধু বান্ধাং মাথার বেণী

কান পাতিয়া শুনং তোমার

সুখের কত নামী রে

হাল বুয়ান হাল হালুয়া বন্ধুরে

হাল ছাড়িয়া যানরে বন্ধু বাড়ির বগল দিয়া

একনা কথা কবার বাদে ঘাটাৎ রং বসিয়ারে

হাল বুয়ান হাল হালুয়া বন্ধুরে।

(সংগ্রহ ঃ ২-৩ নম্বর গান - শুক্লা পাল, রাঙামাটি, শিবপুর, কুচবিহার।)

(৪)

মুই হাল বুয়াং রে ভ্যাকরা নাঙ্গল দিয়া
হাল বশকি বাউ বশকি ডাইন ডাইন করিয়া।

ফল ফলাং মুই সোনার ফসল দিবা রাত্রি খাটিয়া
তাও কেনে মোর মাইয়া ছাওয়ারে থাকে কচুর মুরা খাইয়া
শাকের সিজা খাইয়া।
ও মুই হাল বুয়াং রে ...।

(৫)

ওকি বিছানা ছাড়ি ওঠ মোর প্রাণপতি ধন হে
ওঠ ওঠ প্রাণপতি ধন জুড় যাইয়া হাল ...।
কি ওরে হালুয়া শোভা হাল কৃষি, জালুয়া জালরে
হাল ধরি যাও প্রাণপতি ধন লাঙল ঘাড়ে নিয়া,
কি ওরে মুই নারীটা বিছন তুলিম হাসিয়া খেলিয়া রে।

(৬)

ও বাপই রে কারবা কথাত ডর
কোমরেতে গামছা বান্ধি হালের মুঠি ধর বাপুইরে
জোর করিয়া হাল বুয়াও রে বাপই
জমিত ফলাও ধান।
আসিবে কত কইন্যার খবর বাড়িবে মান বাপইর।

(৭)

পতিধন হাল বইয়া আসিলেন বাড়ি

হাপসিয়া খাপসিয়া।

গাছের গুড়াতে পিড়া থুইসো বইসো লাঙল থুইয়া।

আগোত বসি দম নেও পাছত বসি গাওখান ধোও।

গাও হাতাইম মুই বগলত বসিয়া।

(৮)

মৈষ চড়ান মোর মৈষাল বন্ধুরে

মৈষাল মুজনাই নদীর পারে

ঘুন্টির বাইজন শুনিয়া মৈষাল

মন না রয় মোর ঘরে মৈষালরে

তোক মইষাল দেখিবার বাদেরে

মৈষাল গেনু জলের ঘাটে

জঙ্গলের আড়ালে বাজান দোতরা

দেখা না দ্যান ক্যানে মৈষালরে।

তোর দোতরার উল্টা ডাঙ্গেরে

মৈষাল মন নিলেন হরিয়া

কেমন করিয়া পার হইয়া যাইম

বিষম দরিয়া মৈষাল রে।

ওপারে তোমরা এপারে আমি রে

মৈষাল মধ্যে মুজনাই নদী

কেমন করিয়া দেখা করিব

পাংখায় না দেয় বিধি

মৈষাল রে।

(সংগ্রহঃ ৪-৮ নম্বর গান - ধনেশ্বর রায়(৭৫), জটেশ্বর, জলপাইগুড়ি)

(৯)

ও মোর নদীরে তিস্তা নদী

তুই ভাঙ্গিলু মোর সোনা বন্ধুর বাড়ি রে।

ছিল মোর ভিটা মাটি নদীরে

আরো ছিল মোর বসত বাড়িরে

ও মোর নদীরে তিস্তা নদী
তুই করিলু মোক পন্থের ভিখারি রে
শোনেক ওরে তিস্তা নদী নদীরে
সদায় দেখং তোর পাগলা মতিরে।।
ও মোর নদীরে তিস্তা নদী
তুই ভাঙ্গিলু মোর নবীন পিরিতিরে।

(১০)
সুখ নাইরে ও মোর চাষার কপাল
বারমাসে যায় হাল বুয়াইতে
উঠিয়া সকালে সুখ নাই চাষার কপালে

বারো মাসে নানান ফসল
তাওনা যায় মোর আকাল হায়রে
ওরে ঢেক্কাইতে না হাটে ও মোর বুড়া গরুর হাল
ও মোর গড়িয়া কপাল।
আবাদ করি কত ফসল তাওনা খাবার কুলায়
হায়রে, বউ ছেলে মেয়ে কান্দি বসি ক্ষুধার জ্বালায়
চাষার দুরিয়া কপাল।
বান বরিষায় নাইরে ছাতা শীতে কাপড় নাই
হায়রে নিন্ না ধরে জ্বরের ঠেলায় বসি
থুর থুরুই হামার গড়িয়া কপাল।
ধনীর ঘরে লেপ তোশক ভাই শীতে না পায় তাল
চাষী ভাইদের ঘরে ঘরে বিছিনায় দেয় পোহাল
হামার গড়িয়া কপাল।

(১১)
সুটুৎ করিয়া আইসিল কবিরাজ
ও কবিরাজ পায় ঘুঙ্ঘুরা বাজে
হামার বাড়িতে ভুটুয়া কুকুর

পড়িতে ঝাপিয়া পড়ে কবিরাজও
সিমো সিমো দেওয়ার ঝরিও
ও কবিরাজ কাইঞ্চ্যা ভিজে গাও
ঘরের পাছোত মানার ডেরা
কাটিয়া মাথাৎ দেও কবিরাজও
বিছিনার ওপর বান্ধা হুকা ও
ও কবিরাজ সিকিয়াত থুইচুং নাড়ু
মোর হাতোত সরু শাখা
সতীনের হাতোত খারু কবিরাজ ও।

(সংগ্রহ ঃ ৯-১১ নং গান শ্রীমতীশুক্লা পাল, রাঙামাটি, শিবপুর, কুচবিহার।)

গোরক্ষনাথের গান ঃ

(১)

আসর বন্দনা

ও মুই অধম এই আসরে ওঠিয়া
দশ বাপ ভাইয়ের চরণরজ নেও মাথে করিয়া
মাগো বসিয়া আছেন তোমরা ধর্মের বাপ মাও
আমাক দেখি যায় হিংসিবে ধর্মের দোহাই
ভাইরে তোমরা আমার মাতা পিতা তোমারা আমার ভাই...
শতকোটি প্রণাম আমি তোমারে জানাই
মাগো ও মা জননী গো... ও মোর মাইয়ারে
তোমরাই আমার মাসি পিসি তোমরাই আমার ভাই ...।
কোটি কোটি প্রণাম আমি চরণে জানাই ... ।

(২)

সোনামনরে একবার মুখে হরিগুণ গাও
হরিগুণ গাও ভোলামন কৃষ্ণ গুণ গাও
আজ হরির গুণগান গাইতে গাইতে সোনামন

পূর্বে চলিয়া যাও রে
সোনামনরে একবার ...
যেই না মুখে খাওরে সোনামন
জ্বলন্ত আগুনি রে
সোনামনরে একবার ...।
সেই না মাথা শ্মশানে পড়িয়া শুন সোনামন
যাবে গড়াগড়িরে
সোনামন একবার ...।
শিশু থাকি কামাই করিছি সোনামন
লক্ষটাকা সোনা
মরণকালে সঙ্গে না যাবে সোনামন
আড়াইহাতি তেনা রে
ও একবার মুখে হরিগুণ গাও।

(৩)

ও এসো হে প্রভু গোরক্ষনাথ এসো আসরে
প্রভুগো প্রভু তোমার নাম লইয়া প্রভু করি খেলা ধুলা
অধম বলিয়া প্রভু মোরে করো তুমি দয়া
আমার আসর ছাড়ি যদি প্রভু অন্যের আসর যাও
সিংহের পিঠে চড়ি প্রভু তুমি করো আরোহণ
এসো হে প্রভু অধমের এই আসরে দীন হীন কাঙাল।
প্রভু গো অধম বলিয়া যদি তুমি দয়া না করিব
পতিত পাবন নামে আমি কেমনে ধরিব
প্রভু গো প্রভু গোরক্ষনাথ।
তুমি বাদ্য তুমি যন্ত্র উপলক্ষ আমি তুমি তাল তুমি যন্ত্র উপলক্ষ আমি
আজ ভর সমাজ ভাঙ্গিয়া গেলে নজ্জা পাইব আমি।

(৪)

ঘর খানি তোর চৌর চালা খন বাঁশের রূয়া।
বার কর গার্হস্থ্য ভাইরে বাট্টাভরা গুয়া
বাট্টা ভরা গুয়ারে তোর গোরক্ষনাথে খায়
গোরক্ষনাথের বাঘরে ভালুক ছাড়িয়া পালায়
না পালাইস বাঘ ভালুক না পালাইস তুমি
খানিক জাগা ছাড়িয়া দেও আসন করি আমি
আসনের তলে গোঁসাই বাসোয়া বান্দিল
বাসোয়া বান্দিয়া গোঁসাই বাঁশি দিল সান
যত মন মেছেনী গুলার আওলাইল পরাণ
হায়রে এক মেছেনী ওঠিয়া গোঁসাই হামার বাড়ি যায়
হাড়ি দিব পাতিলা দিব অন্ন রান্দি খায়
বিধিগো নেংটির মাথায় চাল আনিয়া দিমু অন্ন রান্দি খান
বিধিগো ঝাম্পাও মাছের শুটকা দিব অন্ন রান্দি খান
আজি গাও খান মোর ন্যাথের প্যাথের
ন্যালচা বিছন তুলিয়া
বইস বন্ধু আইসং গাও ধুইয়া।

(৫)

গুরুর ভাব মোর তরঙ্গ নদী
যেই জন গুরুর ভাব রাখিবে রে মন
তায় হবে মোর প্রাণগুণ নিধি
গুরুরভাব মোর তরঙ্গ নদী
জোড়া নৌকা জোড়া বৈঠা রে মন
ওইনা-জোড়া প্রদীপ জ্বইলাছে রতন রে
গুরুর ভাব মোর তরঙ্গ নদী
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সুশলিত হইল
সাতকানি মেঘ ভাইরে ইন্দ্রিয়ে সাজিল হায় হায়রে।

সাতরাতি নয় দিন গোকুলেতে ঝড়
আগোম দরিয়া মাঝে মাছের বাড়ি ঘর হায় হায় রে
মাছে মধ্যে ইলসা মাছ রাজা ভালা জানে
শোল মাছ কোটাল হইয়া হুলিয়া গতিয়া আনে
বিধিহে, মাগুর মাছ ঘটকি হইয়া পথে ছিঁড়ে ফাড়ি
মাগুর মাছ মাইলানি হইয়া সাজায় ফুলের সাজি
চান্দা হইল চাইলোন বাতিটা আহেলা আলিপন
গোতা মাছ সলিতা হইয়া জ্বলিসে রতন
ছোট পুটি বড় পুটি পুটি নানান জাতি
বালিয়া মাছের বিয়াও হবে খট্টি পুটির বেটি
বিধিহে- হে হে হে -
চ্যাং মাছ ওঠিয়া কচে মুই বড় ইতর
বালিয়া মাছের বিয়াও হবে মুই ধরিম মিস্তর
বিধিরে - হে হে হে -
টেপা বাজায় কুরতারে কু কুরসায় বাজায় ঢোল
আর চ্যাংয়ে বাজায় সানাই করে গণ্ডগোল
বিধিরে - হে হে হে -
বাইম মাছটি দিগলা তারাটা পাত কাটি বেড়ায়
গচি মাছের নেটপেটি শালিটা আঙ্গিনা মুছিয়া দেয়
বিধিহে পোগদায় যে পার্শে ভাত আসে আরো পাছে
তাক দেখিয়া নেন্দলগালি মুখ মেলিয়া হাসে
সবায় যে পাইলেক ভাত টেপায় না পায়
সগার আগে টেপা শালার পেট ফুলি বেড়ায়
বিধিরে -
টাকি বলে ওরে মুই টুককুনি ব্যাঙের ভাই
ধরি আনো টেপা শালাক নাগরা বাজাই
আজি গাও খান ন্যাতের প্যাতের ন্যালচা বিছন তুলিয়া
বইস বন্ধু আইসং গাও ধুইয়া।

(৬)

কালরাত্রি যে প্রভাত হইল পূর্বে উঠল ভানু
মা যশোদ ডাক পাড়ে উঠ রামকানু
মায়ের বচনে যাদু উঠিয়া বসিল
মেলিতে না পারে আঁখি ঘসিতে লাগিল
ছোট ঘসে বড় ঘসে আরো ঘসে সরু
বৃন্দাবন বলিয়া কৃষ্ণ ডাঙেয়া দিল ধেনু - আচ্ছা বেশ-বেশ-বেশ
ধেনু চড়াইতে পাল গোটাইতে বেলা হয় দুপুর-আচ্ছা বেশ-বেশ-বেশ
ডাঙেয়া তুলিয়া ধেনু বাথানের উপর-আচ্ছা বেশ-বেশ-বেশ
কাকো বান্দে কাকো ছান্দে কারো ছেকে দুধ-আচ্ছা বেশ-বেশ-বেশ
কালো গাভী ধবল বাছুর ছেকতে বড় সুখ-আচ্ছা বেশ-বেশ-বেশ
যেদিন কালে দুগ্ধঘটি উমানিতে পায়
আইমা বলিয়া গাভীটাক আইল চড়া দেয়
যেদিন কালে দুগ্ধঘটি উমানি না পায়
দুধ চুরনি ধুমালি বলিয়া ঢুঢডিয়া ডাংগায়
তোমারই ধন হে প্রভু আপনি হইলেন চোর
দুধচুরনি ধুমালি হইয়া পাঞ্জর ভাঙিলেন মোর
ওকি হায় হায় রে দারুণ বিধি হায় হায় হায়।

(৭)

ও মোর বিধাতা গো ও মোর গোরক্ষনাথ আম বাড়ি মোরহে রাধে কাঁঠাল বাড়ি মোর
ঘাটায় ঘাটায় চৌকিদার নাগাল না পাই তোর
নিত্যে নিত্যে যাও হে রাধে এ ঘাট মারিয়া
আইজ নিব তোর ঘাটের কড়ি উসুল করিয়া
আজি নয় বুড়ি ঘাটের কড়ি দিলেন তো গুনিয়া
নৌকা চড়িল রাধে ঠসক মারিয়া
আগে চড়ে কানাইয়া চড়ে পিছে
শ্রীরাধিকার পায়ের নূপুর হাঁটিয়া যাইতে বাজে।

(৯)

আর সত্যঠাকুর গোরক্ষনাথ গার্হস্থ্য দেও মোক বর
ধনে বংশে বাড়ুক গিরি চন্দ্র দিবাঙ্কর
গিরিবে দুয়ারে দেখি একেনা চিকন মাটি
মানুষ গরুর রোগ ব্যারাধি যাউক দক্ষিণ ভিতি
ও মোর বিধাতা গো ও মোর গোরক্ষনাথ

নামানি

(১০)

আজি চুপ করিয়া ঘরে আছং বসিয়া
কাজলা পাখিটার কান্দং শুনিয়া
হটেকটেকা কান্দেছে হটেট্যাক হটেকট্যাক করিয়া
ও আজি চুপ করিয়া ঘরে আছং বসিয়া
কাজলা পাখিটার কান্দং শুনিয়া।
শুভে-শুভে।

(সংগ্রহঃ শ্রীবিপিনচন্দ্র রায় (৬৫), কালিদাস অধিকারী (৪০), ভারতচন্দ্র রায় (৪৬), পূর্বশালবাড়ি, জলপাইগুড়ি)

(১১)

নন্দ গেল বাথানে যশোদা গেল জলে
শূন্য গৃহ পাইয়া গোপাল ননী চুরি করে
নদী খাইল কেরে বাছা ননী খাইল কে
এ হেন ভাণ্ডারের ননী গোপাল খাইয়াছে।
হস্তী নরি লইয়া যশোদা গোপাল মারিতে যায়
দৌড়ি দৌড়ি যায় রে গোপাল ফিরে ফিরে চায়।
দৌড়ি যায়া চড়িল গোপাল খিল কদমের গাছে
ডাল পাল ছাড়িয়া বাছা পাতার উপর নাচে
তাহা দেখি যশোরাণীর মনে হইল ভয়
সেইখান থেকে পড়িলে বাছার মরণ নিশ্চয়

নামরে বাছা যদুমনি পারেয়া দেছ ফুল
বিনি সুতোর গাঁথিব মালা পরাব বকুল।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীকালিদাস অধিকারী (৪০), খালপাড়া, জলপাইগুড়ি)

সোনারায়ের গান ঃ

(১)

সৈষ্যা বাড়িত ফেইস্যা কান্দে
তাংকু বাড়িত বাঘ,
ঘরের পাছোত বুড়ার ব্যাটা
করে বাপরে বাপ।
বলরে বলরে হরি রাম নারায়ণ
রাম ছাড়া গতি নাই
বল রাম নারায়ণ।
সব দোষ খণ্ডিবে বল রাম নারায়ণ।
সত্য ঠাকুর সোনারায় গাইরস্থক দিলেক বর
ধনে বংশে বাড়ুক গিরি চন্দ্রদিবাংকর হে।।

(সংগ্রহ ঃ রমণীমোহন বর্মা (৭০), দিনহাটা, কুচবিহার)

সুবচনীর গান ঃ

(১)

"সুবচনীর বাড়ি যামো
পান, গুয়া, ত্যাল, সেন্দুর সগায় পামো।
সুবচনী মায় মোর
বড় দয়াময়
সুবচনী পূজলে পরে
হারা জিনিস পায়।"

(২)

"দ্যাশে দ্যাশে সুবচনীর মহিমা প্রচার হইল।
সুবচনী দ্যাশে যায় কাটারি মারেয়া চায়।।

(৩)

"বেচুয়া (পাখি) করে ঝিলিমিলি কুকিলা করে রাও
শ্যাত কাউয়ার বচনে রজনী পোয়াও পোয়াও
স্বর্গের সুবচনী স্বর্গে চলি যায়
ঐ থাকি মাও সুবচনীর পূজা ঘরে ঘরে হয়।"

(৪)

"মা এই দুক্কে মরণ না হয় ক্যানে
সুবচনী দ্যাকো যায় কলা পসাধ মাড়েয়া চায়।
দেমোনা দেমোনা দ্যাশে গেইলে পামো না।
এই দুক্কে মরণ না হয় ক্যানে।"

(সংগ্রহ ঃ শ্রীমতী স্বরবালা বর্মণ (৬৭), টাকিমারি, দিনহাটা, কুচবিহার)

ভাওয়াইয়া গান ঃ

আজি মৈষাল বন্ধু মোর হারেয়া গেইসে রে
আজি গাড়িয়াল বন্ধু মোর হারেয়া গেইসে রে
আজি কাজল ভোমরা বন্ধু মোর হারেয়া গেইসে রে

নদীর পারোত কাশিয়া নাই
কাশিয়া বাড়ি মইষ নাই
মইষের গলায় ঘন্টি নাই
সেই মইষের মৈষাল নাই রে
আজি মৈষাল বন্ধু মোর হারেয়া গেইসে রে।

গরু মোষের গাড়ি নাই
গাড়ির উপুরা ছই নাই

ছইয়ের ভিতর কইন্যা নাই
সেই গাড়ির গাড়িয়াল নাই রে
আজি গাড়িয়াল বন্ধু মোর হারেয়া গেইসে রে।

(সংগ্রহ ঃ শ্রী ধনেশ্বর রায় (৭৩), জটেশ্বর, জলপাইগুড়ি)

লোককথা ঃ

(১)

নাকাল শিয়ালের কথা

নড়বড় থর বোঁটা বড় দর
নড় বড়িয়ার কাছে যাইয়া নজ্জা পাইলাম বড়
বহুদিন প্যাটের ভোগে যদি থাকং উপবাস
তবু আর না যাইম মুই নড়বড়িয়ার পাছ।

একটা ধূর্ত শিয়াল জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে এসে দেখে সবুজ মাঠে হৃষ্টপুষ্ট গাছাগরু (ষাঁড়) ঘাস খেয়ে চলেছে। শিয়াল ভাবে, যা নাদুস নুদুস চোহারা না জানি কতরস ওতে আছে, যদি একবার ওকে খেতে পেতাম পেটটা ভরে যেত। একথা ভাবতে ভাবতে ষাঁড়টা তার পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গেল। এবার তার নজর গিয়ে পড়ল ষাঁড়ের অণ্ডকোষে। নড়বড়ে অণ্ডকোষ দেখে সে ভাবল সমস্ত রস বোধহয় ওই 'নড়বড় থর'র' মধ্যেই আছে। মনে মনে ফন্দি আটে যদি ওখানে একবার কামড় দেওয়া যায় তাহলে সমস্ত রস মাটিতে ঝড়ে পড়বে এবং মাটির সেই রস চেটেপুটে খেলে জঙ্গলে গিয়ে দু'দিন আরাম করা যাবে।

এরকম মতলব করে সে পরেরদিন ষাড়টার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করে। ক্রমাগত চেষ্টায় ষাঁড়টার সঙ্গে ভাব হলে সে ষাঁড়টার পা চাটে, মাথা চাটে, গলা চাটে। এইভাবে চাটার ফলে ষাঁড়টাও কিঞ্চিত আরামবোধ করে, আর ষাঁড়টাও ভালমত আরাম পাওয়ার আশায় শিয়ালের সামনে সমস্ত শরীরটা ছেড়ে দেয়।

তখন শিয়ালটা তার পিট চাটে, পেট চাটে, চরু চাটে। চাটতে চাটতে শিয়ালটার নজর যায় অণ্ডকোষের দিকে। ক্রমাগত দোদ্যুল্যমান অণ্ডকোষটা তার চোখের সামনে দেখে ভাবে- 'মারব নাকি কামড় ?'

যেমন ভাবা তেমন কাজ-মেরেছে কামড়। আর ষাঁড়টা যন্ত্রণায় এমন ল্যাং মেরেছে যে শিয়ালটার সব দাঁত ভেঙ্গে চুরমার-রক্তারক্তি কাণ্ড। এ অবস্থায় যখন সে বাসায় ফিরেছে তখন

শিয়ালিনী জিজ্ঞাসা করে - 'হ্যারে তোর এরকম দশা কি করে হল?'

শিয়ালটি তখন উপরোক্ত মন্তব্যটি করে।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীগিরিন্দ্রনাথ বর্মণ (৮৫), ফুলবাড়ি, কুচবিহার)

(২)

মৈষাল ও কইন্যা ঃ

একগ্রামে এক মেয়ে ছিল, সে খুব কথা বলে। সহজে তাকে কথায় হারানো যায় না। মেয়েটির কথা হল, যে তাকে কথায় হারাতে পারবে তাকে সে বিয়ে করবে।

ওই গ্রামেই এক মৈষাল ছিল, সে মেয়েটির সমস্ত কথা জানে। সে মনে মনে মেয়েটিকে হারানোর পরিকল্পনা করে। একদিন বারুণী স্নানের মেলায় দুইজনের সাক্ষাত হলে মৈষাল মেয়েটিকে একটি গল্প শুনায় -

"এক মৈষাল এক গৃহস্থ বাড়িতে পাঁচবছর কাজ করে। পাঁচ বছরের জমানো টাকা একসঙ্গে পেয়ে একখানি মোষ খরিদ করে।

মেয়েটি বলে - তারপর?

মৈষাল - একখানা মোষ থেকে হল বহু মোষ।

মেয়ে - তারপর?

মৈষাল - তামাম মোষ বিক্রি করে সে মেলা জমি কিনল।

মেয়ে - তারপর?

মৈষাল - সেই জমিতে মৈষাল ধান লাগাল।

মেয়ে - তারপর?

মৈষাল - ধান পাকলে সেই ধান ক্ষেতে আগুন ধরিয়ে দিল।

মেয়ে - তারপর?

মৈষাল - আগুনে তামাম ধান খই হয়ে গেল।

মেয়ে - তারপর?

মৈষাল - প্রচুর খই দেখে বহু পাখি তা খেতে এলো।

মেয়ে - তারপর?

মৈষাল - তখন মৈষাল বিশাল একটা বর্মজাল দিয়ে পাখিগুলিকে বন্দী করল।

মেয়ে - তারপর?

মৈষাল - তারপর একটি পাখি ফুড়ুৎ করে ছেড়ে দেয়।

মেয়ে - তারপর?

মৈষাল - তারপর আর একটি ফুড়ুৎ।

মেয়ে - তারপর?

মৈষাল - ফুড়ুৎ।''

মেয়েটির 'তারপর' শেষ হয় না, এদিকে মৈষালের 'ফুড়ুৎ' আর শেষ হয় না। এরপর মেয়েটি নিজের হার স্বীকার করে এবং কথামতো মৈষালের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। আমার গল্পটির এখানে শেষ হয়।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীহরকান্ত রায় (৬৫), পশ্চিম শালবাড়ি, জলপাইগুড়ি)

(৩)

এক স্বয়ংসম্পূর্ণ গৃহস্থ খুবই কম কথা বলে। একদিন হয়েছে কি - সে বাড়ির পাশের এক জমিতে কাজ করছে। এমন সময় নাপিত ঠাকুর এসে উপস্থিত হয়েছে, আবার পাশের বাড়ি থেকে একজন লেবু চাইতে এসেছে, ওদিকে তার বৌ ছেলেকে বলল যা তো জিজ্ঞাসা করে আয় ভাত খাবে কিনা - এমতাবস্থায় সে একটি উত্তর করল - 'বাড়ুক'। তাতে তিনজনই উত্তর পেয়ে গেল।

চুল বাড়ুক

লেবু বাড়ুক (কচি আছে)

ভাত বাড়ুক।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায় (৪৫), দেউনিয়া পাড়া, জলপাইগুড়ি)

(৪)

চিরদিন পোষপোষ

এলা হইল মোর পুকটি খানের দোষ ঃ

পানিকৌড়ির বাসায় কাকে ডিম দিয়ে যায়। পানিকৌড়ি নিজের ডিম ভেবে তাকে বড় করে। বড় হওয়ার পর সে যখন মাছ সংগ্রহে বিল বা জলের ধারে যায়, তখন বাচ্চাটিকে বিলের পাশে রেখে মাছ শিকার করে। মাছ শিকার কালে জলে ডুব দিলে তার পুকটি (পিছন) দেখা যায়। এরপর যখন সে মাছ এনে বাচ্চাটিকে খেতে দেয় তখন আর বাচ্চাটি মাছ খায় না। এই অবস্থায় পানিকৌড়ি উপরোক্ত মন্তব্যটি করে।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (৫৫), দেউনিয়া পাড়া, জলপাইগুড়ি)

(৫)

ছাপান্নটা গরু ঃ

একজন কৃষক তিনটি গরু বেঁধে এলো তার নিজের জমিতে। কিছুক্ষণ পর একটি গরু দড়ি ছিড়েঁ পাশের জমির ফসল নষ্ট করলে সেই জমির মালিক সারা গ্রাম মাথায় তুলে। গরুর মালিককে বলতে থাকে তোর ছাপান্নটা গরু আমার জমির ফসল খেয়ে ফেলেছে। অতএব এর একটা বিহিত চাই।

একথা শুনে তো গরুর মালিক আকাশ থেকে পড়ল। সে গ্রামবাসীদের বলল - 'একি করে সম্ভব। আমার গরুই তো মাত্র তিনটি, একটির রং লাল, একটি কালো আর একটি সাদা। আপনারাই বলুন এমন অভিযোগের কোনো মানে হয়?

গ্রামবাসীরা সবাই বলল - ঠিক ! ঠিক !

ফসলের মালিক বলল - ''আমি মোটেই মিথ্যা বলিনি। আমাকে অত বোকা ভেবো না। ওর সাদা গরুটা আমার জমির ধান খেয়েছে। এখন সাদা গরুটা মানে 'সাদাটা'। আর 'সাত আটা' মানে ছাপান্ন' -এখন তোমরাই বল এখানে আমি কোথায় মিথ্যা বললাম।

এবার গ্রামবাসীরা সবাই বলল - ঠিক ! ঠিক !

(সংগ্রহ ঃ শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায় (৪৫), দেউনিয়া পাড়া, জলপাইগুড়ি)

(৬)

এক গ্রামে এক মস্ত বড় জমিদার ছিল। জমিদারের দাপটে প্রজারা 'টু' শব্দটি পর্যন্ত করতে পারত না। ধনে-জনে-মানে তার জুড়ি মেলা ভার। এই জমিদারের অনেক প্রজাপালি ছিল। তবে জমিদারের বউটি ছিল পাগলি টাইপের। তাই তার বউ তার মন ভরাতে পারত না, জমিদারও তার উপর খুশি ছিল না।

এদিকে তার জমিদারীর এক প্রজার খুব সুন্দরী বউ ছিল। তাকে রাজার খুব পছন্দ। এবং সেকথা বলতে তার দ্বিধাও নেই। প্রজার সুন্দরী বউকে রাস্তাঘাটে যেখানেই দেখা পায় সেখানেই বলে - ' তোমাকে আমার খুব পছন্দ। ইচ্ছে হয় তোমাকে নিয়ে রাত কাটাই।' - এ কথা বলতেই মনের বাসনা তার আরও বৃদ্ধি পায়। এদিকে প্রজার সুন্দরী বউ এ কথা গিয়ে তার স্বামীকে বললে স্বামী বলে - 'আরে এ জিনিস কি ক্ষয় হবার জিনিস? এটা ক্ষয় হয় শুধুমাত্র বয়সের ভারে। যৌবনে এ জিনিস যেমন তেমনই থাকে। আর রাজা যদি তোমার যৌবন উপভোগ করতে চায় তাতে ক্ষতি কি? তুমি শুধু তার মনোরঞ্জনের পরিবর্তে জমিদারের সমস্ত ধানের গোলা জমিসহ

তোমার নামে রেজিস্ট্রি করে দিতে বলবে। যদি সে রাজী হয় তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।' এই কথা বলে সে ভাত খেয়ে জমি চাষ করতে চলে যায়।

এরপর রাজা এলে যথারীতি বউ স্বামীর শিখানো মতো শর্ত রাজার সামনে বললে - রাজা বলে - 'বেশ তো তাই হবে।' রাজা মনে ভাবে কয়েকটা ধানের গোলা লিখে দিলে দোষ কি? এর পরের বার ফসল ফললেই না আবার এইরকম কতগোলা ধান আমার হবে। যাইহোক, প্রস্তাবে রাজী হয়ে সে প্রজার সুন্দরী বউকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজা আটকে দেয় এবং সুন্দরী নারীর সান্নিধ্য লাভ করে।

নারীর সংসর্গ শেষে রাজার আক্ষেপ, আরে বাইরের রূপটাই আলাদা কিন্তু অন্দরটা সকল নারীর একই। না না-না না আমি কি ভুল করলাম — এর সঙ্গে তো আমার পাগলি স্ত্রী কোনো পার্থক্য নাই।' শেষে রাজা বলতে বাধ্য হয় —

'যেই ন্যাকন্যাক সেই থ্যাকথ্যাক
সেই মোর পাগলির খান
তার জন্য হারালুং মুই
চৌদ্দগোলা ধান।'

(৭)

মানুষ হও ঃ

পুরাকালে ছড়রা গ্রামে ভোলানাথ নামে এক কৃষক বাস করত। কৃষক ও কৃষক বউ এক সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তদের বাড়িতে সেবার আয়োজন করে। গুরুকে প্রণাম করলে গুরু আশির্বাদ করে বলে - 'মানুষ হও'।

একবার ছড়রা গ্রামে গুরুদেব এলে সেখানে প্রচুর গ্রামবাসী গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়। তবে যে বাড়িতেই গুরু যাক না কেন প্রথমেই গুরুদেব এসে ভোলানাথের বাড়িতে উঠে। ভোলানাথ গুরুদেবকে প্রণাম করলে গুরুদেব আশীর্বাদের সঙ্গে বলে - 'মানুষ হও'।

এই 'মানুষ হও' কথাটিতেই ভোলনাথের আপত্তি। সে স্ত্রীকে বলে - 'গুরুদেবকে প্রণাম করলেই গুরুদেব শুধু বলে - 'মানুষ হও'। কেন আমি কি এখনও মানুষ হই নি। আমি বুড়ো হয়ে গেলাম চুল দাড়ি পেকে গেল - দাঁতও দু'একটা পড়েছে এখনও আমি মানুষ হই নি? কোথায় ধন মানের আশীর্বাদ করবে তা নয় শুধু বলে 'মানুষ হও'। এ কেমন গুরু? না-না, গুরুকে আর সেবা আত্তি করব না। তুইও গুরুকে আর আমার বাড়িতে ডাকবি না। ডাকলে তোকেও আমি আর আস্ত

রাখব না। যত্তসব 'মানুষ হও'।

এদিকে গুরুদেব ভাবে কি ব্যাপার ভোলানাথ কিংবা ভোলানাথের স্ত্রী আমাকে আর ডাকে না খোঁজও নেয় না ব্যাপার কি?

একদিন হয়েছে কি — ভোলানাথ তার স্ত্রীকে বলে গেল - 'আজকে ভাত তরকারী রান্না করে জমিতেই নিয়ে যাবি। ধান বাড়িতেই ভাত খাব। ধান সব পেকে গেছে বাড়িতে এসে খেতে গেলে সময় নষ্ট।

একথা বলে সে ধান বাড়িতে চলে যায়। এদিকে বউ তাড়াতাড়ি রান্না করার জন্য ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে স্নানের জন্য কুয়ার পারে যাবে - তখন দেখে কুয়ার পাড়ে গুরুদেব স্নান করার জন্য বসে আছে। আসলে তখনকার দিনে একটি কুয়াতে অনেক লোক জল খেত। প্রতিবেশির বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করে গুরুও কুয়ার পারে এসেছে। কুয়ার পারে গুরুকে দেখে সে কুয়ার পারে যেতে পারছে না - গেলেই তো কথা বলতে হবে। স্বামী বলেছে কথা বলা বারণ। এদিকে স্নান করতে দেরী হলে আবার রান্নার দেরি হয় তাই সে মনে মনে ভাবল, 'যাহোক কুয়ায় যাব এবং একটা ভক্তি দেব।'

ভক্তি দিলে গুরুদেব আবারও পূর্বের মত আশীর্বাদ করে বলে - 'মানুষ হও'। আর কি ব্যাপার! তোমরা আমার খোঁজ খবর নাও না কি ব্যাপার?

তখন বউ বলে, 'এই জন্যেই করি না। তোমার ওই এক কথা 'মানুষ হও'। আমরা কি এখনও মানুষ হইনি। আমার স্বামীও তাই বলে - বুড়ো হয়ে গেলাম এখনও গুরুদেব ধন-সম্পত্তির, সুখ-শান্তির আশীর্বাদ করে না, শুধু বলে 'মানুষ হও'। তাই স্বামী রাগ করে তোমাকে আর সেবা দেয় না।'

একথা শুনে গুরুদেব বলে - 'ও এইকথা ঠিক আছে আজকে তোর স্বামীকে ডাক দেখি। এই 'মানুষ হওয়া'র লীলা আজকে তোদের দেখাব। কেন আমি বলি 'মানুষ হও'।'

গুরুর কথা শুনে একদৌড়ে সে ধানবাড়ি গিয়ে স্বামীকে বলে - 'এই শুন? '

স্বামী বলে - 'কি হল?'

'এই - শুন-নো - শু-নো।'

স্বামী বলে - 'কি হয়েছে ভাত কোথায়?'

বউ বলে - 'ভাত পড়ে হবে। গুরুদেব আসছে শুন।'

'আবার গুরুদেব? তোকে যে বলেছি গুরুদেবের সঙ্গে কোন কথা হবে না।'

বউ বলে - 'আরে শুন, আমরা যে 'মানুষ হও' নিয়ে রাগ করি, গুরুদেব বলছে - আজকে সেটা

তিনি প্রমাণ করে দেখাবেন।'

তখন ভোলানাথ ও বউ বাড়ি এলে গুরুকে ভোলা প্রণাম করে এবং যথারীতি গুরুদেব আশীর্বাদ করে বলে - 'মানুষ হও'।

ভোলানাথ মনে মনে বিরক্ত হয়। ভোলানাথের মনের কথা বুঝতে পেরে গুরুদেব বলে - এই শুনো আমি তোমাকে একটা চশমা দিলাম। এই চশমা পড়ে হিন্দুস্তান মোড়ে বাজার করতে যাবে। বাজারে গিয়ে দশ টাকায় - ধূপ, কলা, দই নিয়ে আসবে। তবে হ্যা! এগুলি আনতে হবে মানুষের কাছ থেকে। এগুলি নিয়ে এলে আমি তোমাকে লীলা করে দেখাব।'

ভোলানাথ গুরুর আদেশমত বাজারে গেলে চশমা পড়ে মুখে বলে ওঠে - 'ওরে বাপ - এখানে তো কেউ মানুষ নেই - সব কুকুর, ছাগল, বাঘ, শুয়োর, শিয়াল বিভিন্ন জীবজন্তু পসার সাজিয়ে বসে আছে।'

আর বিভিন্ন জন্তুর বিকট শব্দের বাজারে কান পাতা দায়। অনেক কষ্টে ভিতরে এগিয়ে গেলে দেখে - একজন বৃদ্ধ ধূপ নিয়ে বসে আছে। সে তার কাছ থেকে ধূপ সংগ্রহ করে। পাশে গিয়ে দেখে একজন প্রায় ৯০ বছরের বৃদ্ধ কলা নিয়ে বসে আছে। এবার সে চশমাটা খুলে সেখানে কলা ক্রয় করে। কলা ক্রয় করার পর সে গেল দই হাটি। দই হাটি গিয়ে চশমা দিয়ে দেখে বিভিন্ন জীবজন্তু দই বিক্রি করছে। এবার মনে মনে ভাবে, 'রাম-রাম-রাম খালি চোখে মানুষ অথচ চশমা পড়লে দেখা যায় এরা কেউই মানুষ নয়। আরে রাম-রাম-রাম।'

হঠাৎ তার মনে হল সে তো নিজেকে দেখে নি, সে নিজেকে একবার দেখবার জন্য যেই চশমা পড়েছে অমনি ভিরমি খেয়ে পড়ে গেলো, দেখে কিনা নিজে একটা বিশাল পাঁঠা ছাগল। ভয় পেয়ে দই হাটিতে পড়ে গেলে বিভিন্ন দই এর ভাণ্ড ভেঙ্গে যায় তখন সমস্ত দই এর মালিক বাঁক দিয়ে তাকে এমন পেটাই করে যে তার পিঠ দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে।

যাইহোক, এমন করে ধূপ-দই-কলা যোগাড় করে সে বাড়িতে এসে বউকে বলে, 'বাপরে -বাপ এই দশা। দেখতো কত জায়গায় মোক দোকানিরা ডাঙ্গাইছে। আর হ্যাঁ, বাজারে খালি তিনটি মানষি। আর সগায় জীবজন্তু। বাপরে-বাপ। এতলা মানষি অথচ কাহয় মানষি না হয়। হারে, আয় তো তোক দেখং তুই কি?

একথা বলে যেই চশমাটা পড়েছে বউকে দেখে তো চক্ষু চড়ক গাছ। দেখে বউটা একটি ভুটি কুকুর।

তখন স্বামী বলে 'ছি-ছি-ছি তোর মতো একটা ভুটি কুকুরের সঙ্গে মুই থাকিছি - ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা।'

এদিকে বউটা বলে 'হারে দেখং তুই কি?' একথা বলে চশমা নিয়ে পড়ে সেতো মুর্চ্ছা যায়।

মুর্চ্ছা থেকে উঠে গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলে, 'গুরুদেব আমাকে বাঁচান! এরকম একটা পাঁঠা ছাগলের সঙ্গে আমার ঘরকন্যা - ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা জীবনটাই মোর বৃথা হয়ে গেল।'

তখন গুরুদেব বলে, 'কেন আমি তোমাদের আশীর্বাদের ছলে বলি 'মানুষ হও' এবার বুঝলে তো। তবে আমি বলছি তোমাদের এই পশুত্বদশা আর বেশিদিন থাকবে না। আগামী জন্মেই তোমরা 'মানুষ হবে'।'

(৮)

হেদা নেদার গল্প ঃ

রবাব না পায় ডাগিরি

রবার না পায় ঝগুড়ি

আর রবার না পায় গুদুড়ি

এক গ্রামে হেদা আর নেদা নামে দুই জন মানুষ বাস করতো। উভয়েরই সংসার আছে। নেদার বউটা গ্রামের কারোর সঙ্গে সদ্ভাব করে চলতে পারে না। বেশ ঝগড়াটে স্বভাবের। এদিকে পাড়ায় একটাই রাস্তা। ঐ রাস্তা দিয়েই সবাইকে নদীতে স্নান করতে যেতে হয়। কিন্তু ঐ রাস্তায় যেতে আসতে স্নানের ঘাটে যেখানেই হেদার বউ-এর সঙ্গে দেখা হয় সেখানেই ঝগড়া বেঁধে যায়। হেদা, নেদা থেকে শুরু করে গ্রামের লোক সবাই ওদের ঝগড়ায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। শেষে হেদা-নেদা বসে ঠিক করল, স্নানের ঘাটেই যখন যত অশান্তি তখন এক কাজ করা যাক। ঘাটই বরং দুটি করা হোক। ঘাটের তফাৎ অন্তত কুড়ি বিঘা হোক। যাতে একে অপরের কথাবার্তা শুনতে না পায়। আর কথা শুনেই যখন ঝগড়ার সৃষ্টি তখন ঘাট দূরে হলে ঝগড়াও লাগবে না।

এইমত নেদা ২০ বিঘা দূরে বউ-এর জন্য নদীতে স্নানের ঘাট করে দিল। কিন্তু ঘাট দূরে হলে কি হবে কথায় আছে স্বভাব যায় না মলে। হয়েছি কি - একদিন নেদার বউ স্নানের ঘাটে যাবার সময় হেদার বউকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, 'আমার সুখ নাই রে সুখ নাই, আমার মানষিটা সকাল হলেই খাবার নাগে, তাই আইন্দন ঘর সানটাইয়া চান করিয়া সকাল সকাল খিচুড়ি করিলাম। তাতে এক কেজি চাউল দিলাম, এক কেজি ডাইল দিলাম, এক কেজি মরুচ দিলাম, এক কেজি জিরা দিলাম, এক কেজি হলুদ দিলাম, এক কেজি নুন দিলাম।'

একথা শুনে হেদার বউ বলে - 'ধুর মাগি। ওই খিচুড়ি কি খাওয়া যায়। না কাউকে

খাওয়ানো যায়।'

যেই না বলা অমনি ফোঁস করে উঠে নেদার বউ বলে উঠ। 'এই মাগি আমার খিচুড়ি, আমার হাড়ি, আমার চাল, আমার ডাল, আমি যত খুশি তত দিব তাতে তোর ভাতারের কি রে?'

এই কথা বলে তর্কাতর্কি থেকে নিমেষে চুলোচুলি হাতাহাতি এবং শেষ পর্যন্ত মারামারি শুরু হল। তা দেখে হেদা ও নেদা ছুটে এসে অনেক কষ্টে মারামারি বন্ধ করল। শেষে পাড়ায় এক বয়স্ক ভদ্রলোক বলতে বাধ্য হয় -

'রবায় না পায় ডাঘিরি
রবার না পায় ঝগুড়ি
আর রবার না পায় গুদুরি।'

(সংগ্রহঃ ৬-৮ নং লোককথা শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী (৬৫), টাউরিকাটা, কুচবিহার)

উপকারীর অপকার

এক ব্রাহ্মণ যজমান বাড়ি থেকে ফিরবার পথে দেখতে পায় নদীর ধারে কাঁদার মধ্যে একটি বাঘ পড়ে আছে। বাঘটি অনেকক্ষণ ধরেই পড়েছিল। নির্জন পথ, মানুষ জন খুব একটা এ পথে যাতায়াত করে না। অনেকক্ষণ পরে ব্রাহ্মণকে এ পথে আসতে দেখে বাঘটি বলে ওঠে 'ঠাকুর মশাই, ঠাকুর মশাই, আমাকে একটু উপকার করো, আমাকে এই পাঁক থেকে উদ্ধার করো।' ব্রাহ্মণ বলল - 'হ্যাঁ, তোমাকে উদ্ধার করি আর তারপর আমাকে খাও আর কি!' আমি পারব না।' বলে ব্রাহ্মণ হন্ হন্ করে হেঁটে যাচ্ছে দেখে বাঘটি আবার কাতর অনুরোধ করে। বাঘের এহেন কাতর মিনতি শুনে ব্রাহ্মণ বাঘকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসে এবং একটি গরুর বাঁধার দড়ি দিয়ে বাঘটিকে পাঁক থেকে তুলে দেয়। এবং উদ্ধার শেষে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। তখন বাঘটি বলে ওঠে - 'ওহে ঠাকুর মশাই, কোথায় চললেন, জানো না দুইদিন থেকে কাঁদায় পড়ে থেকে আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। আর তোমার মতো হৃষ্টপুষ্ট মানুষ দেখে খিদেটা আরো বেশি করে চাগাড় দিলো।'

ব্রাহ্মণ বলল - 'মানে'?

বাঘ বলে - 'মানে তোমাকে এবার খাব ঠাকুর মশাই।'

ব্রাহ্মণ বলে - 'তোমার উপকার করলাম আর তুমি কিনা আমাকে খেতে চাও'?

বাঘ বলে - 'হ্যাঁ খেতে চাই।'

ব্রাহ্মণ বলল - 'ঠিক আছে উপকারীর অপকার করা যায় কিনা তা তিনজন সাক্ষীকে দিয়ে বিচার

করব। যদি তারা বলে যে উপকারীকে বধ করা যায় তবে তুমি খেতে পার।'

বাঘ বলে - 'ঠিক আছে তাই হবে' তুমি সাক্ষী জোগার কর।'

তখন ব্রাহ্মণ এক ভাল্লুককে দেখে বিষয়টি সমাধানের কথা বলতেই ভাল্লুক বলে ওঠে - 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাওয়া যায়। উপকারীর অপকার করা যায়।' এই বলে তাড়াতাড়ি বাঘের সামনে থেকে সরে পড়ে। পাছে যদি বাঘ তাকেই ধরে ফেলে।

এরপর দ্বিতীয় সাক্ষী একটি বট গাছ। বট গাছকে জিজ্ঞাসা করতে বট গাছটি বলে ওঠে হ্যাঁ, হ্যাঁ উপকারীর অপকার করা যায় অর্থাৎ খাওয়া যায়। দেখো না, আমি সুশীতল ছায়া দিই, কত পথিক ক্লান্ত হয়ে আমার নিচে আশ্রয় নিয়ে দুদণ্ড বিশ্রাম নেয়। অথচ যাবার সময় আমার ডাল ভাঙ্গে, পাতা ছিঁড়ে দিয়ে যায়। তাই বলে না - 'উপকারী গাছের নাই ছাল।'

একথা শুনে বাঘ বলে - 'কি ঠাকুর মশাই আর কি চল এবার খাওয়া যাক।'

ব্রাহ্মণ বলে - 'আরেকটি সাক্ষী আরেকটি সাক্ষী বাকী আছে। সেটা দেখে যা হয় করবে।' এই বলে কিছুদূর এগিয়ে যেতে কে শিয়ালের দেখা পেল। শিয়াল তো বাঘ দেখেই পালাতে চাইছিলো। কিন্তু ব্রাহ্মণের ডাকে সে কাছে এলো। ব্রাহ্মণ তাকে সমস্ত ঘটনাটি বুঝিয়ে বললে শিয়াল মাথা নাড়িয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল - 'না না কিছুই বুঝতে পারছি না।' তখন বাঘ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য বলছে - আমি এই খানে নদীর ধারে একটি বাঁধা গরুকে দেখে লাফিয়ে ছিলাম কিন্তু গরুটাকে নিয়ে ছিট্‌কে ওই ১৫ হাত দূরে কাঁদায় গিয়ে পড়েছিলাম।' এই পর্যন্ত বললে শিয়াল বাঘকে থামিয়ে দিয়ে বললে - 'কি, গরু, লাফ, ১৫ হাত অসম্ভব এতদূর লাফ দেওয়া যায়? এটা আমি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারছি না। অসম্ভব - এটা হতেই পারে না।'

তখন বাঘ উৎসাহিত হয়ে বলে - 'কি বিশ্বাস হচ্ছে না তবে দেখো', এই বলে বাঘটি সরেজমিনে দেখানোর জন্য আবার পূর্ববৎ লাফিয়ে আগের চেয়ে আরো পাঁচ হাত দূরে কাঁদায় গিয়ে আটকে গেল।

তখন শিয়ালটি ব্রাহ্মণকে বলে - 'ঠাকুর মশাই এখন মানে মানে কেটে পড়। বাঘের যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে। মানে মানে বিদায় হও।' এই বলে শিয়াল আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে যার গন্তব্যে চলে গেল।

(সংগ্রহ ঃ শ্রী হরকান্ত রায় (৬৫), পশ্চিম শালবাড়ি, জলপাইগুড়ি)

ষাইটোল ঃ

কাহিনি ঃ

এক ব্যক্তির সাত পুত্র। বিবাহ যোগ্য হলে তাদের বিয়ে দিলেন সেই ব্যক্তি। পুত্র বধূরা সুন্দরী আর ছেলেরা কর্মঠ। তাই তার সুখের ভরা সংসার। সময় মত ছয় বউ গর্ভবতী হল। তাদের ফুট্‌ফুটে ছয় সন্তান হল। কিন্তু মাস যায় বছর যায় ছোট বউ নীলার গর্ভসঞ্চার হয় না। মনে তার দুঃখ। তার সঙ্গে সইতে হচ্ছে গঞ্জনা। সে বন্ধ্যা প্রমাণিত হয়। সমাজে অস্পৃশ্য হয়ে যায় সে। মনে হয় যেন আত্মহত্যাই একমাত্র পথ। এই পথ বেছে নিতে পিছপা হয় না সে।

একদিন বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ে নীলা। নিজের মৃত্যু কামনায় আনমনে প্রবেশ করে জঙ্গলে। ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যের পথে এগিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে সে আসে এক ঘন প্রায় অন্ধকার বনে। সেখানে বাস করে এক বাঘ ও বাঘিনী। নীলা প্রার্থনা করে তাকে বাঘ ও বাঘিনী যেন খেয়ে ফেলে। নিজের দুঃখের কাহিনি বলে সে। বাঘ কিন্তু অন্য কিছু বোঝার চেষ্টা করে না। তার জিভ দিয়ে লাল ঝরে। নীলাকে খেতে উদ্যত হয়। বাদ সাধে বাঘিনী। সে বলে আরে এতো বন্ধ্যা। একে খেলে আমাদের সন্তান সন্ততি হবে না। একে খাওয়াই যাবে না।

এই কথাগুলি নীলার হৃদয়ের মর্মমূলে গিয়ে আঘাত করে। কথাগুলি যেন বনের গাছে গাছে আকাশে-বাতাসে অনুরণন তোলে। আরও ক্লিষ্ট হয় নীলার মন। ধিক্কার জন্মে নিজের ওপর। ভাবে আমি এত অচ্ছুত যে বাঘও ছোঁয়া এড়িয়ে চলে। হাঁটতে থাকে সে, আর কাঁদতে থাকে।

এ সময় জঙ্গলের উপর দিয়ে আকাশ পথে যাচ্ছিলেন শিব ও পার্বতী। পার্বতী শিবকে বললেন। চল তো দেখি কে কাঁদছে। এমন অসহায় কান্না তো শুনিনি কোনদিন। চলো দুঃখিনী মেয়েটি কেন কাঁদে শুনে আসি। শিব তখন নেশায় কাতর। কোন কিছুতেই মন নেই তাঁর। পার্বতী একাই নেমে এলেন নীলার সামনে এক বুড়ির রূপ ধরে। জিজ্ঞাসা করলেন কান্নার কারণ। নীলা বলল তার দুঃখের কাহিনি।

পার্বতী অভয় দিলেন। বললেন তুমি এগিয়ে চলো। কিছুদূর গেলে পাবে এক সরোবর। সেখানে প্রতিদিন দেবী ষাইটোল জলবিহারে আসেন। তাঁকে বলবে সব। তিনিই তোমার দুঃখ দূর করবেন। আশায় বুক বেঁধে নীলা চলল সরোবরের উদ্দেশ্যে।

সরোবরে পৌঁছে নীলা পেল দেবী ষাইটোলকে তাঁকে সব খুলে বলল। দেবী বললেন, কোন চিন্তা নেই। বাড়ি ফিরে যাও। গ্রামে আমার প্রতিষ্ঠা কর। তুমি মা হবে। নীলা ফিরল

বাড়িতে। প্রতিষ্ঠা করল যাইটল দেবীর। কিছুদিন পর গর্ভবতী হল। নির্দিষ্ট সময়ে সন্তানের জন্ম দিল। মা হল নীলা। খুশিতে আনন্দে ভরে উঠল তার জীবন।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীমতী সরোবালা বর্মণ (৭৭), টাকিমারি, দিনহাটা, কুচবিহার)

কাতিপূজার গান ঃ

কাতিরে কাতিরে তোর মুণ্ড বানাইছে কোন জনে
- মুণ্ডা বানাইছে বাসুদেবে।
কাতিঠাকুর কাতি ঠাকুর চুল বানাইছে কোন জনে
- আনু জনমেরে শন বিলাইছি
চুল বানাইছে বাসুদেবে।

(সংগ্রহ ঃ শ্রীমতী জয়ন্তী বর্মণ (৬২), সিতাই, কুচবিহার)

————————****————————

ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যাবলী

ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাঁদের অকৃত্রিম সাহায্য পেয়েছি এবং যাঁদের নিকট থেকে মৌখিক ভাষাগত উপাদান ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি তাঁদের নাম, বয়স, পেশা, ঠিকানা ও সাক্ষাতের তারিখ নিম্নে দেওয়া হলো —

	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা	সাক্ষাতের তারিখ
১.	শ্রী হরকান্ত রায় (ধোদা)	৬৫	কৃষক	গ্রাম ঃ পশ্চিম শালবাড়ি, পো ঃ শালবাড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২২.০৬.২০০৬
২.	শ্রী উপেন্দ্রনাথ রায়	৮০	কৃষক	গ্রাম ঃ খালপাড়া, পো ঃ জুড়াপানি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২২.০৬.২০০৬
৩.	শ্রী বিপিনচন্দ্র রায়	৭২	কৃষক	গ্রাম ঃ পূর্বশালবাড়ি, পোঃ জুড়াপানি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২২.০৬.২০০৬
৪.	শ্রী ভারতচন্দ্র রায়	৪৭	কৃষক	গ্রাম ঃ পূর্বশালবাড়ি, পো ঃ জুড়াপানি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৪.১০.২০০৮
৫.	শ্রী কালিদাস রায়	৪০	কাঠ মিস্ত্রি	গ্রাম ঃ পূর্বশালবাড়ি, পোঃ জুড়াপানি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৪.১০.২০০৮
৬.	শ্রী দয়ালচন্দ্র রায়	৫৫	সরকারী চাকুরে	গ্রাম ঃ পশ্চিম শালবাড়ি, পোঃ শালবাড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৩.০৬.২০০৬
৭.	শ্রী বিশেশ্বর রায়	৭০	কৃষক	গ্রাম ঃ কামাত, পো ঃ শালবাড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৩.০৬.২০০৬
৮.	শ্রী বিভূতিভূষণ রায়	৪৭	কৃষক	গ্রাম ঃ পশ্চিম শালবাড়ি, পোঃ শালবাড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৩.০৬.২০০৬

	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা	সাক্ষাতের তারিখ
৯.	বিজয়চন্দ্র রায়	৬৫	কৃষক	গ্রাম ঃ গাদং - ১ পোঃ শালবাড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৪.০৬.২০০৬ ২৭.০৬.২০০৬
১০.	শ্রী জগন্নাথ রায়	৫৭	শিক্ষক	গ্রাম ঃ গাদং - ১, পোঃ শালবাড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৭.০৬.২০০৬
১১.	শ্রী সুদীপ মল্লিক	৩৮	শিক্ষক	ভূটানির ঘাট উচ্চ বিদ্যালয়, গ্রাম ও পো ঃ ভূটানির ঘাট, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৭.০৬.২০০৬
১২.	শ্রী ধনেশ্বর রায়	৭৪	ভাওয়াইয়া শিল্পী (গীতি-কার ও সুরকার)	গ্রাম ও পো ঃ আলিনগর, জটেশ্বর, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	৩০.০৬.২০০৬
১৩.	শ্রী মুকুন্দ বর্মণ	৭৫	কৃষক	গ্রাম ও পোঃ ক্ষেতি, জেলা ঃ কুচবিহার	২০.০৬.২০০৭
১৪.	শ্রী গিরিন্দ্রনাথ বর্মণ	৮৫	লোকশিল্পী	গ্রাম ও পোঃ ফুলবাড়ি, জেলা ঃ কুচবিহার	২১.০৬.২০০৭
১৫.	শ্রী বসন্ত রায়	৮০	প্রা. পোষ্ট মাস্টার	গ্রাম ঃ কাচাখাওয়া, পোঃ ক্ষেতি, জেলা ঃ কুচবিহার	২০.০৬.২০০৭
১৬.	শ্রী সতীশ অধিকারী	৭২	কৃষক	গ্রাম ঃ ট্যাংরামারি, পোঃ ক্ষেতি, জেলা ঃ কুচবিহার	২২.০৬.২০০৭
১৭.	শ্রী বিদ্যানাথ রায়	৫৮	কৃষি	গ্রাম ঃ ট্যাংরামারি, পোঃ ক্ষেতি, জেলা ঃ কুচবিহার	২২.০৬.২০০৭
১৮.	শ্রী দীনেশচন্দ্র রায়	৬২	প্রা. শিক্ষক	সিনেমা হল পাড়া, পো ঃ ময়নাগুড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২২.০৬.২০০৭

	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা	সাক্ষাতের তারিখ
১৯.	শ্রী সতীশ রায়	৪৫	কৃষক	গ্রাম ঃ বাবুপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৫.১০.২০০৬
২০.	শ্রী জগদীশ রায়	৬৫	কৃষক	গ্রাম ঃ গীদালপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৫.১০.২০০৬
২১.	শ্রী হরিহর রায়	৫৫	কৃষক	গ্রাম ঃ গীদালপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৫.১০.২০০৬
২২.	শ্রী খগেন্দ্রদেব অধিকারী	৭০	কৃষক	গ্রাম ঃ প্রধানপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৬.১০.২০০৬
২৩.	শ্রী লালবাবু রায়	৭২	কৃষক	গ্রাম ঃ বাবুপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৬.১০.২০০৬
২৪.	শ্রী সুষেণ রায়	৬৫	কৃষক	গ্রাম ঃ বাবুপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৭.১০.২০০৭
২৫.	শ্রী সহরাই মুণ্ডা	৬২	কৃষক	গ্রাম ঃ বাবুপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৭.১০.২০০৭
২৬.	শ্রী নেরগেন্দু রায়	৫২	কৃষক	গ্রাম ঃ গীদালপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৭.১০.২০০৭
২৭.	শ্রী কান্তমোহন দেবনাথ	৫২	কৃষক	গ্রাম ঃ বাবুপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৮.১০.২০০৭
২৮.	শ্রী কালাতু রায়	৭০	কৃষক	গ্রাম ঃ বাবুপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৮.১০.২০০৭

	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা	সাক্ষাতের তারিখ
২৯.	শ্রী নলনীমোহন রায়	৮১	কৃষক	গ্রাম ঃ কলোনীপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৮.১০.২০০৭
৩০.	শ্রী বিমল রায়	৫২	কৃষক	গ্রাম ঃ বাবুপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	৩০.১০.২০০৭
৩১.	শ্রী সুভাষচন্দ্র রায়	৫২	কৃষক	গ্রাম ঃ বাবুপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	৩০.১০.২০০৭
৩২.	শ্রী উপেন্দ্রনাথ রায়	৭৫	কৃষক	গ্রাম ঃ বাবুপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	৩০.১০.২০০৭
৩৩.	শ্রী সুরেশচন্দ্র রায়	৬৫	কৃষক	গ্রাম ঃ দেউনিয়াপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	০৩.১১.২০০৭
৩৪.	শ্রী দেবেন দেবনাথ	৬০	কৃষক	গ্রাম ঃ উত্তর বৈরাতিগুড়ি, পোঃ বৈরাতিগুড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	০৩.১১.২০০৭
৩৫.	শ্রী সদানন্দ বর্মণ	৮০	কৃষক	গ্রাম ঃ টাউরিকাটা, পোঃ শিলডাঙ্গা, জেলা ঃ কুচবিহার	০৯.০৬.২০০৯
৩৬.	শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বর্মণ	৮০	কৃষক	গ্রাম ঃ টাউরিকাটা, পোঃ শিলডাঙ্গা, জেলা ঃ কুচবিহার	০৯.০৬.২০০৯
৩৭.	শ্রী মহেশ বর্মণ	৮২	কৃষক	গ্রাম ঃ টাউরিকাটা, পোঃ শিলডাঙ্গা, জেলা ঃ কুচবিহার	০৯.০৬.২০০৯
৩৮.	শ্রী পদনেশ্বর বর্মণ	৮০	কৃষক	গ্রাম ঃ টাউরিকাটা, পোঃ শিলডাঙ্গা, জেলা ঃ কুচবিহার	১০.০৬.২০০৯

	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা	সাক্ষাতের তারিখ
৩৯.	শ্রী নগেন সর্দার	৯০	কৃষক	গ্রাম ঃ টাউরিকাটা, পোঃ শিলডাঙ্গা, জেলা ঃ কুচবিহার	১০.০৬.২০০৯
৪০.	শ্রীমতী বিনাপাণি সূত্রধর	৮৫	গৃহস্থালি	গ্রাম ঃ খালিসা গোসানিমারি, পোঃ গোসানিমারি, জেলা ঃ কুচবিহার	১৫.০৬.২০০৯
৪১.	শ্রী রমণীকান্ত রায়	৭০	কৃষক	গ্রাম ঃ খালিসা গোসানিমারি, পোঃ গোসানিমারি, জেলা ঃ কুচবিহার	১৫.০৬.২০০৯
৪২.	শ্রী কশুল বর্মণ	৭২	কারিগরী শ্রমিক	গ্রাম ও পোঃ রাজপাট, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৫.০৬.২০০৯
৪৩.	শ্রী বিনদ রায়	৭৮	প্রা. চাকুরে	গ্রাম ঃ খালিসা গোসানিমারি, পোঃ গোসানিমারি, জেলা ঃ কুচবিহার	১৫.০৬.২০০৯
৪৪.	শ্রী ভুবেনেশ্বর বর্মণ	৬৮	কৃষক	গ্রাম ঃ সূর্যকান্ত, পোঃ গোসানিমারি, জেলা ঃ কুচবিহার	১৬.০৬.২০০৯
৪৫.	শ্রীমতী স্বরবালা বর্মণ	৬৭	গৃহস্থালি	গ্রাম ও পো ঃ টাকিমারী, দিনহাটা, জেলা ঃ কুচবিহার	১৭.০৬.২০০৯
৪৬.	শ্রী তরণীকান্ত বর্মণ	৬০	লোকশিল্পী	গ্রাম ও পো ঃ টাকিমারী, দিনহাটা, জেলা ঃ কুচবিহার	১৭.০৬.২০০৯
৪৭.	শ্রী মহেন্দ্র দাস	৬২	ব্যবসা	গ্রাম ঃ খালিসা গোসানিমারি, পোঃ গোসানিমারি, জেলা ঃ কুচবিহার	১৬.৬.২০০৯
৪৮.	শ্রীমতী জয়ন্তী বর্মণ	৬২	গৃহস্থালি	গ্রাম ঃ নেতাজী বাজার, পোঃ সিতাই, দিনহাটা, জেলা ঃ কুচবিহার	১৮.৬.২০০৯
৪৯.	শ্রী মহনীমোহন রাভা	৩৬	সরকারী চাকুরে	গ্রাম ঃ লালপুল, পোঃ ব্রজেরকুটি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৯.৯.২০০৯

	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা	সাক্ষাতের তারিখ
৫০.	শ্রী উত্তম দাস	৭১	ভাওয়াইয়া শিল্পী	গ্রাম ও পো ঃ মজিদখানা, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৯.৯.২০০৯
৫১.	শ্রী রজনী বর্মণ	৬০	লোকশিল্পী	গ্রাম ঃ টটপাড়া, পোঃ মজিদখানা জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৯.৯.২০০৯
৫২.	শ্রীমতী সুলেখা রায়	৩৭	ভাওয়াইয়া শিল্পী	গ্রাম ও পোঃ মজিদখানা, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	২৯.৯.২০০৯
৫৩.	শ্রী হরনাথ ব্রজবাসী	৫৫	কাঠ মিস্ত্রি	গ্রাম ঃ তেলিপাড়া, পোঃ বারোবিশা, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	৩০.৯.২০০৯
৫৪.	শ্রীমতী জ্যোৎস্না রায়	৩০	ভাওয়াইয়া শিল্পী	গ্রাম ঃ পূর্ব বীরপাড়া, পো ঃ বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি	১.১০.২০০৯
৫৫.	শ্রী ধীরেন রায়	৫৮	সরকারী চাকুরে	গ্রাম ঃ পূর্ব বীরপাড়া, পো ঃ বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি	১.১০.২০০৯
৫৬.	শ্রী কিরণচন্দ্র রায়	৪০	প্রাথমিক শিক্ষক	গ্রাম ঃ ঝাঞ্জুপাড়া, পোঃ ফাটাপুকুর, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১০.১০.২০০৯
৫৭.	শ্রীমতী সুরেশ্বরী রায়	৭০	লোকশিল্পী	গ্রাম ঃ ঝাঞ্জুপাড়া, পোঃ ফাটাপুকুর, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১০.১০.২০০৯
৫৮.	শ্রী রোহিনী মালাকার	৮০	কৃষক	গ্রাম ঃ দুর্বাগছ, পো ঃ রাজগঞ্জ, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১০.১০.২০০৯
৫৯.	শ্রী সুধীরকান্ত মালাকার	৪০	শোলা শিল্পী	গ্রাম ও পোঃ রাজগঞ্জ বাজার জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১০.১০.০৯
৬০.	শ্রী দীনবন্ধু বর্মণ	৪০	কৃষক	গ্রাম ঃ গাঠিয়াগছ, পো ঃ ফাটাপুকুর, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১১.১০.০৯

	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা	সাক্ষাতের তারিখ
৬১.	শ্রী সাবুরাম বর্মণ	৬৫	লোকশিল্পী	গ্রাম ঃ গাঠিয়াগছ, পো ঃ ফাটাপুকুর, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১১.১০.০৯
৬২.	শ্রী বিজয় কোঙার	৪০	শিক্ষক	গ্রাম ও পোঃ হেলাপাকড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৫.১০.০৯
৬৩.	শ্রী কৈলাশ রায়	৪৫	গ্রামীণ ডাক্তার	গ্রাম ও পোঃ আমগুড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৮.১০.০৯
৬৪.	শ্রী মাকরা রায়	৫০	লোকশিল্পী	গ্রাম ঃ বেতগাড়া, পো ঃ আমগুড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৮.১০.০৯
৬৫.	শ্রী সুনীল বর্মণ	৮২	প্রাক্তন বনকর্মী	গ্রাম ঃ উত্তর বড়াইবাড়ি, পোঃ মাটিয়ার কুঠি, জেলা ঃ কুচবিহার	২২.১০.০৮
৬৬.	শ্রী গজেন বর্মণ	৮০	কৃষক	গ্রাম ঃ উত্তর বড়াইবাড়ি, পোঃ মাটিয়ার কুঠি, জেলা ঃ কুচবিহার	২২.১০.০৮
৬৭.	শ্রী সুরেন বর্মণ	৮৪	কৃষক	গ্রাম ঃ দক্ষিণ বড়াইবাড়ি, পোঃ মাটিয়ার কুঠি, জেলা ঃ কুচবিহার	২২.১০.০৮
৬৮.	শ্রীমতী আইমতি বর্মণ	৯৫	গৃহস্থালি	গ্রাম ঃ দক্ষিণ বড়াইবাড়ি, পোঃ মাটিয়ার কুঠি, জেলা ঃ কুচবিহার	২৩.১০.০৮
৬৯.	শ্রীমতী সুখমনি বর্মণ	১০০	গৃহস্থালি	গ্রাম ঃ দক্ষিণ বড়াইবাড়ি, পোঃ মাটিয়ার কুঠি, জেলা ঃ কুচবিহার	২৩.১০.০৮
৭০.	শ্রী মাগেশ্বর বর্মণ	৯৫	কৃষক	গ্রাম ঃ টাউরিকাটা, পোঃ শিলডাঙ্গা, জেলা ঃ কুচবিহার	২৬.১০.০৮

	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা	সাক্ষাতের তারিখ
৭১.	শ্রী জগৎ বর্মণ	৯০	কৃষক	গ্রাম ও পোঃ মাটিয়ারকুঠি জেলা ঃ কুচবিহার	২৩.১০.০৮
৭২.	শ্রী বৈশাখ বর্মণ	৯০	কৃষক	গ্রাম ও পোঃ মাটিয়ারকুঠি জেলা ঃ কুচবিহার	২৩.১০.০৮
৭৩.	শ্রী তরণী রায়	৮৫	কৃষক	গ্রাম ঃ খলাইগ্রাম, পোঃ শিলডাঙ্গা, জেলা ঃ কুচবিহার	২৬.১০.০৮
৭৪.	শ্রীমতী শুক্লা পাল	৩০	লোকশিল্পী	গ্রাম ঃ রাঙামাটি, পোঃ শিবপুর, জেলা ঃ কুচবিহার	২২.০৬.২০০৮
৭৫.	শ্রী মহিমচন্দ্র বর্মণ	৫১	লোকশিল্পী	গ্রাম ঃ রাঙামাটি, পোঃ শিবপুর, জেলা ঃ কুচবিহার	২২.০৬.২০০৮
৭৬.	শ্রী ভূপালচন্দ্র রায়	৫২	লোকশিল্পী	গ্রাম ঃ রাঙামাটি, পোঃ শিবপুর, জেলা ঃ কুচবিহার	২২.০৬.২০০৮
৭৭.	শ্রী কৈলাসচন্দ্র বর্মণ	৪৭	গোঁসাই	গ্রাম ও পোঃ খলিসামারি, জেলা ঃ কুচবিহার	২১.০৬.২০০৮
৭৮.	শ্রী কেনাপ্রসাদ রায়	১১০	কৃষক	গ্রাম ঃ দেউনিয়াপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৭.১০.২০০৮
৭৯.	শ্রী দয়ালচন্দ্র রায়	৫৭	কৃষক	গ্রাম ঃ দেউনিয়াপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৭.১০.০৮
৮০.	শ্রী কার্তিকচন্দ্র রায়	৪৫	কৃষক	গ্রাম ঃ দেউনিয়াপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৮.১০.০৮
৮১.	শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়	৫৮	কৃষক	কৃষক গ্রাম ঃ দেউনিয়াপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৮.১০.০৮

	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা	সাক্ষাতের তারিখ
৮২.	শ্রী সতীশচন্দ্র রায়	৫৫	কৃষক	গ্রাম ঃ দেউনিয়াপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৮.১০.০৮
৮৩.	শ্রীমতী বত্তেশ্বরী রায়	৬০	লোকশিল্পী	গ্রাম ঃ দক্ষিণ শালবাড়ি, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৯.১০.০৮
৮৪.	শ্রীমতী সাবলি রায়	২৫	পার্শ্ব শিক্ষিকা	গ্রাম ঃ দেউনিয়াপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৯.১০.০৮
৮৫.	শ্রী রতন রায়	৩০	পার্শ্ব শিক্ষক	গ্রাম ঃ বাবুপাড়া, পোঃ দুরামারি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১৯.১০.০৮
৮৬.	শ্রী কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী	৬৫	গোঁসাই	গ্রাম ঃ টাউরিকাটা, পোঃ শিলডাঙ্গা, জেলা ঃ কুচবিহার	২৫.১০.০৮
৮৭.	শ্রী উদাসু রায়	৮০	কৃষক	গ্রাম ও পোঃ ফুলবাড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি	১০.০৮.১০
৮৮.	শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায়	৫৭	শিক্ষক	গ্রাম ঃ নেংটিছারা, পো ঃ নিউ রঙ্গিয়া, জেলা ঃ দার্জিলিং	১৫.০৮.১০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি
(SELECTED BIBLIOGRAPHY)

(ক) বাংলা গ্রন্থ ঃ

১. ইসলাম, ড. মযহারুল - ফোকলোরচর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, লোকলৌকিক প্রকাশনী, কোলকাতা - ৪৭, ১৯৮২।

২. কামিল্যা, ড. মিহির চৌধুরী - রাঢ়ের গ্রামদেবতা, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

৩. কুণ্ডু, মণীন্দ্রলাল - বঙ্গীয় রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, ২০০৮।

৪. গুপ্ত, ক্ষেত্র - লোকসৃষ্টির নন্দনতত্ত্ব, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, ২০০২।

৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র - সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, ২০০২।

৬. ঘোষ, আশিষ - মৈমনসিংহ ও প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা -৯, ২০০৪।

৭. ঘোষ, ড. প্রদ্যোত - বাংলা লোকশিল্প, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ২৩, ২০০৪।

৮. ঘোষ, বিনয় - বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, অরুণা প্রকাশনী, কোলকাতা - ৬, ১৪০৬।

৯. ঘোষ, বিনয় - শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ, অরুণা প্রকাশনী, কোলকাতা -৬, ১৯৯৭।

১০. চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার - প্রসঙ্গ ঃ লোকপুরাণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কোলকাতা -৯, ১৯৯১।

১১. চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার - লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, ২০০৩।

১২. চক্রবর্তী, বরুণকুমার - বাঙলার লোকক্রীড়া, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, ২০০১।

১৩. চক্রবর্তী, বরুণকুমার - লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, ২০০৩।

১৪. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পাদিত) - বাঙলা লোকসংস্কৃতি, অপর্ণা ডিস্ট্রিবিউটার্স, কোলকাতা - ৯, ১৯৯৬।

১৫. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত) - বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক অপর্ণা ডিস্ট্রিবিউটার্স, কোলকাতা - ৯, ১৯৯৫।

১৬. চট্টোপাধ্যায়, ড. তুষার - লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা -৭৩, ২০০১।

১৭. চট্টোপাধ্যায়, তুষার - লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা - ৭৩, ২০০৪।

১৮. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ - লোকায়ত দর্শন, নিউ. এজ-পাবলিশার্স লিমিটেড, কোলকাতা -৭৩, ১৪১৩।

১৯. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদিত) - যৌনতা ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, ২০০২।

২০. চক্রবর্তী, দুলাল - লোকসংস্কৃতি পরিভাষা, রূপসী বাংলা, কোলকাতা -৭৫, ২০০২।

২১. জানা, ড. বিকাশ - মেদেনীপুর জেলার কৃষিজীবন ও লোকসাহিত্য, শিলালিপি, কোলকাতা -৯, ২০০৩।

২২. দত্তগুপ্ত, সমীরণ - তিস্তা তটরেখা, এন. ই. পাবলিশার্স, কোলকাতা -৩৫, ২০০০।

২৩. দাস, উপেন্দ্রকুমার - ভারতীয় শক্তি সাধনা (প্রথম খণ্ড), শান্তিনিকেতন, বীরভূম, ১৩৭৩।

২৪. দাস, ড. অসীম - বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, ১৯৯১।

২৫. দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার - প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কোলকাতা - ৯, ২০০০।

২৬. দাস, সুকুমার - উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, কুমার সাহিত্য প্রকাশন, কোলকাতা -৪০, ১৯৮২।

২৭. দে সরকার, দিগ্বিজয় (সম্পাদিত) - উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পত্রলেখা, কোলকাতা -৯, ২০০৩।

২৮. নাগ, অধ্যাপক হিতেন (সম্পাদিত) - কোচবিহারের ইতিহাস ঃ খানচৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, (প্রথম খণ্ড), এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ২০০৫।

২৯. নাথ, প্রমোদ - প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের জনজাতি, প্রভা প্রকাশনী, কোলকাতা -১২, ২০০৫।

৩০. পাল, অনিমেষকান্তি - লোকসংস্কৃতি, বামা পুস্তকালয়, কোলকাতা -৭৩, ১৯৯৬।

৩১. বসাক, ড. শীলা - বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র ও সামাজিক পরিচয়, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা -৯, ১৯৯৮।

৩২. বসাক, ড. শীলা - বাংলার নকশীকাঁথা, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা- ৯, ২০০২।

৩৩. বসাক, ড. শীলা - বাংলার ব্রতপার্বণ, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা ৯, ১৯৯৮।

৩৪. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ - বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা -৭৩, ২০০৮।

৩৫. বসু, ড. নির্মলকুমার - হিন্দু সমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী, ১৯৪৯।

৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর - বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২।

৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর দাশগুপ্ত, অভিজিৎ (সম্পাদিত) - জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কোলকাতা - ৭০০০০৬, ১৯৯৮।

৩৮. বর্মণ, শ্রী উপেন্দ্রনাথ - রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন ও হেঁয়ালি, জলপাইগুড়ি, ১৩৮৫।

৩৯. বিশাই, ড. শঙ্কর - বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী লোকজীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, ২০০৪।

৪০. ভট্টাচার্য, আশুতোষ - বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা - ৭৩, ২০০৪।

৪১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ - বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা- ৭৩, ২০০০।

৪২. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ - প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা -১৩, ২০০১।

৪৩. ভৈরব (গিরি), শ্রীমৎস্বামী পরমাত্মানন্দনাথ - তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত, সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা - ৬, ২০০৫।

৪৪. ভৌমিক, নির্মলেন্দু - প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭।

৪৫. ভৌমিক, নির্মলেন্দু - বাংলা ছড়ার ভূমিকা, সাহিত্য শ্রী, কোলকাতা - ৯, ১৯৭৮।

৪৬. ভৌমিক, নির্মলেন্দু - ভাওয়াইয়া গানের কথা, শিলালিপি, কলকাতা -৯, ২০১০।

৪৭. মজুমদার, তুলিকা (সম্পাদিত) - বাংলার বনদেবতা, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা -৯, ১৯৮৭।

৪৮. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি - আগুনের লোককথা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা -৭৩, ২০০১।

৪৯. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি - বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, কলকাতা - ৬৮, ২০০৫।

৫০. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি - লোকসমাজ ও পশুকথা, লোকলৌকিক প্রকাশনী, কোলকাতা- ৪৭।

৫১. মজুমদার, মানস - লোকঐতিহ্যের দর্পণে, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা - ৭৩, ১৯৯৩।

৫২. মজুমদার, মানস - লোকসাহিত্য পাঠ, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা -৭৩, ১৯৯৯।

৫৩. মজুমদার, শঙ্কর - শিল্পকলার পশ্চিম দিগন্ত, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা-২০, ২০০৭।

৫৪. মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (সম্পাদিত) - উর্বরতার দেবী সরস্বতী, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, ২০০৬।

৫৫. মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (সম্পাদিত) - লোকসংস্কৃতিচর্চার মেথডলজি, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা -৯, ২০০৭।

৫৬. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজাপার্বণ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, আসাম, ১৯৯৯।

৫৭. রায়, ধনঞ্জয় - উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ, বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষদ, মালদা, ১৯৮৭।

৫৮. রায়, ধনঞ্জয় - লোকসংস্কৃতি ঃ লৌকিক দেবতা, দধীচি, বালুরঘাট - ৭৩৩০১০, ১৪১১।

৫৯. রায়, নলিনীরঞ্জন (সংকলিত) - বাংলা প্রবাদমালা, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা- ৯, ২০০৩।

৬০. রায়, নীহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা - ৭৩, ২০০১।

৬১. রায়, পুষ্পজিৎ - মালদা জেলার লোকসংস্কৃতি, সুবনসিরি, মালদা - ৭৩২১০১, ২০০৮।

৬২. রায়, স্বপনকুমার - প্রাচীন কোচবিহার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, বইওয়ালা, কোলকাতা -৪৮, ১৪১৩।

৬৩. সরকার, ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত) - ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, আসাম, ২০০২।

৬৪. সরকার, দীনেন্দ্রকুমার (সম্পাদিত) - বিবাহের লোকাচার, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, ১৯৮২।

৬৫. সরকার, পবিত্র - লোকভাষা ও লোকসংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা - ৭৩, ২০০৩।

৬৬. সরকার, পবিত্র - লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, কোলকাতা - ২০, ২০০১।

৬৭. সরকার, সঞ্জীব ও রায়, অরুণকুমার (সম্পাদনা) - লোকায়ত সংস্কৃতি পরিপ্রেক্ষিত ও রূপরেখা, উইলিয়াম কেরী স্টাডি এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, কোলকাতা -১৩, ১৯৭৮।

৬৮. সরস্বতী, স্বামী অমলানন্দ - শ্রীশ্রী চণ্ডী, হালিশহর, ২৪ পরগণা, ১৩৯৩।

৬৯. সান্যাল, কমলকুমার - মানুষের ক্রমবিকাশ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি, (২য় খণ্ড), বর্ণালী, কোলকাতা - ৯, ১৯৮৩।

৭০. সুর, ড. অতুল - বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি, জ্যোৎস্নালোক, কোলকাতা - ৩।

৭১. সুর, ড. অতুল - বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা - ৬, ১৯৭৯।

৭২. সেন, দীনেশচন্দ্র - বৃহৎবঙ্গ (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ১৯৯৩।

৭৩. সেনগুপ্ত, পল্লব - পূজাপার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা -৯, ২০০১।

৭৪. সেনগুপ্ত, পল্লব - লোককথার অন্তর্লোক, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা -৯, ২০০০।

৭৫. সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পাদিত) - লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, ১৯৯৫।

৭৬. সেনগুপ্ত, পল্লব - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা -৯, ২০০২।

৭৭. হাফিজ, আবদুল - লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা -১১০০।

পত্র-পত্রিকা ঃ

১. কর, অরবিন্দ (সম্পাদক) - কিরাত ভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, , প্রথম খণ্ড, ২০০৪।

২. কর, অরবিন্দ (সম্পাদক) - কিরাত ভূমি (বিভিন্ন ত্রৈমাসিক সংখ্যা)।

৩. গুহ রায়, গৌতম (প্রধান সম্পাদক) - দ্যোতনা, জানুয়ারি ২০০৪, মোহন্তপাড়া, জলপাইগুড়ি।

৪. ঘোষ, ড. প্রভাত (সম্পাদক) - নকশিকাঁথা, আষাঢ়, ১৪১৭, কোলকাতা - ২৮।

৫. ঘোষ, তারাপদ (প্রধান সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৪০৮, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৬. চাকী, লীনা (সম্পাদক) - হৃদয়, বিষয় - ধান, জানুয়ারি, ২০১১, কলকাতা - ৯।

৭. দাস, সুখেন্দু (প্রধান সম্পাদক) - পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ২০০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৮. বর্মা, শ্রী যতীন (সম্পাদক) - স্মরণিকা, মাশান ও অন্য, বারো কোদালি, কুচবিহার, ২০১০।

৯. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদক) - মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪।

১০. ভট্টাচার্য, ড. দেবাশিস (সম্পাদক) - তরস্বী, এপ্রিল ২০০৭, কোকরাঝাড়, অসম।

১১. মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদক) - লোকসংস্কৃতি গবেষণা, আলপনা ও লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়,

১৪১২, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিসদ, পশ্চিমবঙ্গ, কোলকাতা - ৩৪।

১২. ঐ - লৌকিক স্থলযান ও লোকসংস্কৃতি, বিশেষ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৪১২, ঐ।

১৩. ঐ - সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি, বিশেষ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৩, ঐ।

১৪. ঐ - বাঙালির অলঙ্কার ও লোকসংস্কৃতি, বিশেষ সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৪১৬, ঐ।

১৫. রায়, ড. নিখিলেশ (সম্পাদক) - ডেগর, ২০০৬, নর্থ বেঙ্গল একাডেমি অফ কালচার, শিবমন্দির, দার্জিলিং - ১৪।

১৬. রায়, হরিশ (সম্পাদক) - তিস্তাপাড়ের কৃষি, প্রকাশক, সাটসা, জলপাইগুড়ি জেলা ইউনিট, জলপাইগুড়ি।

১৭. সরকার, প্রণব (সম্পাদক) - স্বদেশচর্চা লোক, বাংলার মেলা ও উৎসব, বইমেলা সংখ্যা, ২০০৮, সোনারপুর, কোলকাতা - ১৫০।

১৮. সিংহ, শ্রী সন্তোষ ও সেনগুপ্ত, ড. সুভাষ (সম্পাদক) - স্মরণিকা, ১৮-তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা ও উত্তরবঙ্গ মেলা - ২০০৭, ভুটানীর ঘাট, জলপাইগুড়ি।

১৯. রায়, ড. অমলকান্তি ও রায়, ড. নিখিলেশ (সম্পাদক) - স্মরণিকা, ২০-তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা ও উত্তরবঙ্গ মেলা - ২০০৯, শিবমন্দির, দার্জিলিং।

২০. রায়, ড. দীপককুমার (সম্পাদক) - স্মরণিকা, ২০-তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা ও উত্তরবঙ্গ মেলা - ২০১০, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

(খ) ইংরাজি ঃ

1. Basu, Dr. Swajaj - Dynamics of a caste movement- The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947, New Delhi -64, 2003.
2. Chatterji, Suniti Kumar - Kirat-Jana-Kriti, Asiatic Society, 1970.
3. Chatterji, Suniti Kumar - The Origin and Development of Bengali Language, george Allen & Urwin Limited, London, 1970.
4. Deva, Indra - Folk culture & Peasant Society in India, 1989, Rewat Publication, Jaipur-302004.
5. De, Barun (Editor) - West Bengal District Gazetteer's, Calcutta - 1, Jalpaiguri, July, 1981,
6. Frazer, Sir James george - The Golden Bough, Part -I, Vol- II, Part - V, Vol - I, New York, St. Martin Press,1955.
7. Grierson, George Abraham - Bihar Peasant life, University of Pittsburgh, Pittsburgh, U.S.A., 1885.
8. Grunning, John, F. - Eastern Bengal & Assam District Gazetteers, Jalpaiguri, N.L. Publishers, Shibmandir, Siliguri, 2008.
9. Hunter, W.W. - A Statistical Account of Bengal, Vol-X, 1877, concept publishing company, New Delhi- 110015, Reprint - 1984.

10. Morgan L.H. - Ancient Society, Part- I & II, Bharati library, Calcutta -12, 1958.

11. Mukhopadhyaya, Rajatsubhra - The Rajbansis of North Bengal, A Comparative Demographic Profile, Department of Sociology and Social Anthropology, University of North Bengal, 1990.

12. Risley, H.H. - The Tribes and caste of Bengal, Vol - II.

13. Sanyal, Charu Chandra - Rajbanshis of North Bengal, The Asiatic Society, 1965.

14. Sen, Prabhas - Craft of Bengal, Ahmedabad, 1994.

****

আলোক চিত্রমালা

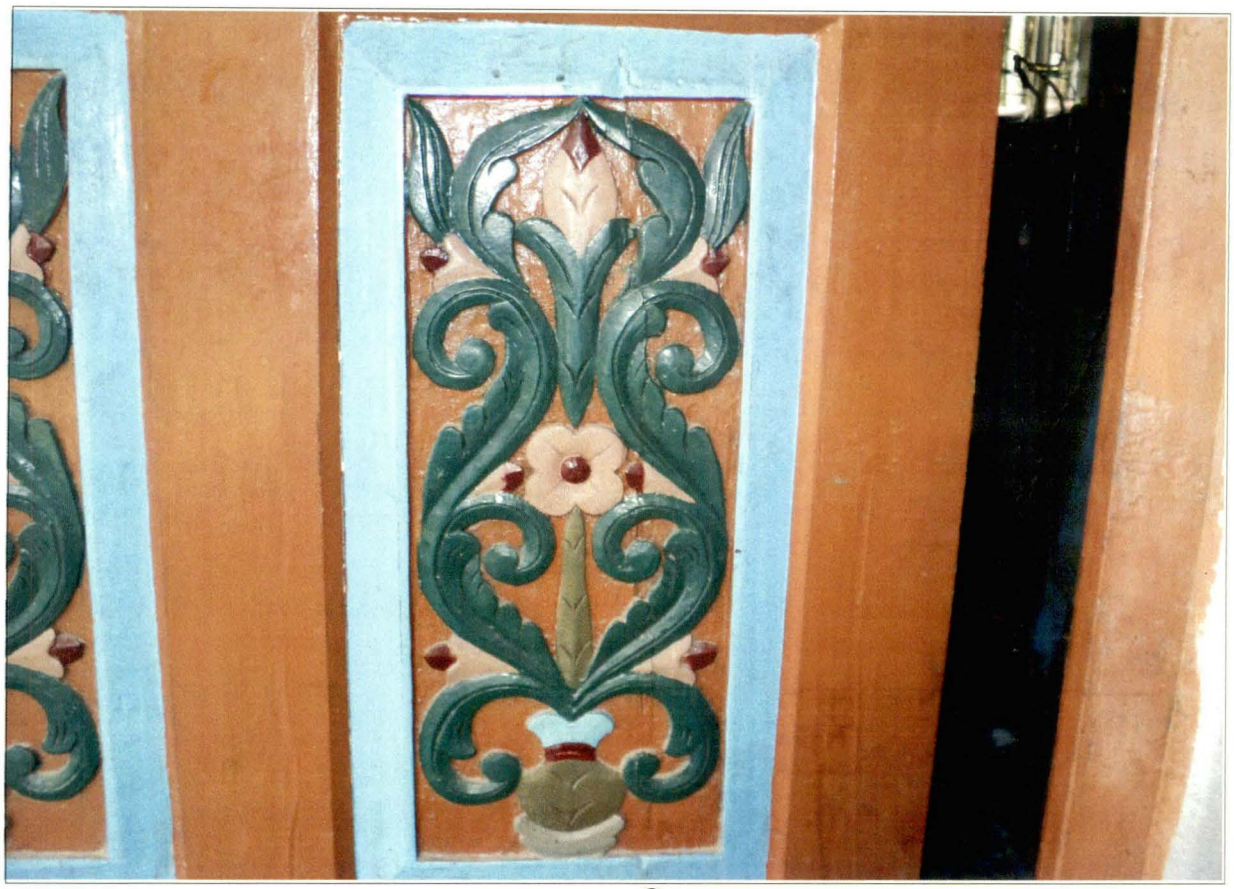

লতা আলপনা - চিত্র নং - ১

পিঁড়ি আলপনা - চিত্র নং - ২

গোরখনাথ ঠাকুর, শালবাড়ি, জলপাইগুড়ি - চিত্র নং - ৩

মাশান, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার - চিত্র নং - ৪

ঢ্যালখাওয়া ঠাকুর - দমদমা, ধূপগুড়ি - চিত্র নং - ৫

বট-পাখিড়ির বিয়াও - শালবাড়ি, ধূপগুড়ি - চিত্র নং - ৬

থানশ্রী - পূর্বশালবাড়ি, জলপাইগুড়ি - চিত্র নং - ৭

ঠাকুর থান, ধূপগুড়ি - চিত্র নং - ৮

ভাণ্ডারঘর, পূর্বশালবাড়ি, শালবাড়ি, - চিত্র নং - ৯

ঘোড়ার গাড়ি, হিন্দুস্তান মোড়, কুচবিহার - চিত্র নং - ১০

শিকিয়া - চিত্র নং - ১১

খরা জাল - সোনাখালি, ধূপগুড়ি - চিত্র নং - ১২

হাঁস রাখার স্থান, চিত্র নং - ১৩

মুরগি রাখার স্থান, চিত্র নং - ১৪

আমাতি পূজা - দোলংমোর, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার - চিত্র নং - ১৫

আমাতিদেবী, দোলংমোর, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার - চিত্র নং - ১৬

বেতঝাড় - নিশিগঞ্জ, কুচবিহার - চিত্র নং - ১৭

বাঁশ ও করুল, শালবাড়ি, জলপাইগুড়ি - চিত্র নং - ১৮

টং - সোনাখালি, ধূপগুড়ি - চিত্র নং - ১৯

LIBRARY
NBU, DARJEELING